শংকর

রান্নাঘর, কিচেন কিংবা

রসবতী

বঙ্গীয় রসনার রসালো কাহিনী

রান্নাঘর, কিচেন কিংবা

রসবতী

[বঙ্গীয় রসনার রসালো কাহিনী]

শংকর

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

RASABATI
by SANKAR
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street
Kolkata 700 073
Telephone : (033) 2241-2330
Fax: (033) 2219-2041
e-mail :
deyspublishing@hotmail.com
Rs.80/-

ISBN 81-7612-637-3

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা :
দিলীপ দে
লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক :
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
দেবাশীষ দেব

দাম : ৮০ টাকা

প্রথম প্রকাশ :
—জানুয়ারি ২০০০
—মাঘ ১৪০৬
দ্বিতীয় সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারি ২০০০
—মাঘ ১৪০৬
তৃতীয় সংস্করণ :
—মার্চ ২০০০
—ফাল্গুন ১৪০৬
চতুর্থ সংস্করণ :
—জুলাই ২০০০
—শ্রাবণ ১৪০৭
পঞ্চম সংস্করণ :
—জানুয়ারি ২০০১
—মাঘ ১৪০৭
ষষ্ঠ সংস্করণ :
—সেপ্টেম্বর ২০০১
—আশ্বিন ১৪০৮
সপ্তম সংস্করণ :
—জুলাই ২০০২
—আষাঢ় ১৪০৯
অষ্টম সংস্করণ :
—মার্চ ২০০৪
—ফাল্গুন ১৪১০
নবম সংস্করণ :
—জানুয়ারি ২০০৭
—মাঘ ১৪১৩

উৎসর্গ

শ্রীঅভীক দত্ত
ও তার সুযোগ্যা সহধর্মিণী
শ্রীমতী সীমা দত্তকে

শংকর

শংকর-এর বই

বিষয়
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

আমি বিবেকানন্দ বলছি ১৩০্
অচেনা অজানা
বিবেকানন্দ ১০০্
স্বামী বিবেকানন্দের
বাবা বিশ্বনাথ দত্ত
যে উপন্যাস লিখেছিলেন
'সুলোচনা' ১২০্
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত ১০০্
কথামৃতের অমৃতকথা ১৫০্
অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ ১২৫্

বিশেষ রচনা

কত অজানারে ১২৫্
অনেকদিন আগে ১৫০্
এই তো সেদিন ৫০্
বাঙালির খাওয়াদাওয়া ১০০্
রান্নাঘর, কিচেন কিংবা
রসবতী ৮০্
বাঙালির বিত্তসাধনা :
সাহারার ইতিকথা ৬০্
লক্ষ্মীর সন্ধানে ৬০্
বঙ্গ বসুন্ধরা ১০০্
চরণ ছুঁয়ে যাই (১ম) ১৪০্
চরণ ছুঁয়ে যাই (২য়) ১৪০্
চরণ ছুঁয়ে যাই (৩য়) ১৬০্
যোগবিয়োগ গুণ ভাগ ৩৫্
আমাদের চিনচর্চা ২০০্

ভ্রমণ সাহিত্য

এপার বাংলা
ওপার বাংলা ৭০্
যেখানে যেমন ১০০্
জানা দেশ অজানা কথা ৭০্
মানবসাগর তীরে ১৬০্

সংকলন

শংকর ভ্রমণ সমগ্র ১৫০্
চলচ্চিত্রায়িত কাহিনীসংগ্রহ ২০০্
কিশোর রচনা সমগ্র ১২৫্
শংকর অমনিবাস ১০০্
সাত দশে ১০০্
শংকর সারাদিন ১০০্

ত্রয়ী উপন্যাস

স্বর্গ মর্ত পাতাল ১৫০্
(জন-অরণ্য, সীমাবদ্ধ ও
আশা-আকাঙ্ক্ষা)
জন্মভূমি ১২৫্
(স্থানীয় সংবাদ, সুবর্ণসুযোগ
ও বোধোদয়)
কথা-মন্থন ১৩০্
(লক্ষ্যভ্রষ্ট, মনজঙ্গল ও
খবর এখন)

যুগল উপন্যাস

তনয়া ১০০্
(সীমন্তসংবাদ ও নগরনন্দিনী)
তীরন্দাজ ১২০্
(তীরন্দাজ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট)
মনজঙ্গল ১২০্
(মনোভূমি ও মনজঙ্গল)

কথাসাহিত্য

পুরোহিত দর্পণ ৬০্
পাত্রপাত্রী ৪০্
যাবার বেলায় ৫০্
চেনা মুখ জানা মুখ ৪০্
সপ্তরথী ৪০্
এখানে ওখানে ৫০্
মানচিত্র ৪০্
সার্থক জনম ৫০্
এক দুই তিন ৪০্
যা বলো তাই বলো ৪০্
এক যে ছিল ৩২্

উপন্যাস

চৌরঙ্গী ১৫০্
ঘরের মধ্যে ঘর ২০০্
তিন ভুবনের কথা ১০০্
খবর এখন ৭৫্
অবসরিকা ৬০্
সহসা ৪০্
কামনা বাসনা ৬০্
এবিসিডি লিমিটেড ৮০্
পটভূমি ৬০্
বাংলার মেয়ে ৬০্
সুখসাগর ৬০্
দিবস ও যামিনী ৩০্
যেতে যেতে যেতে ৬০্
অনেকদূর ৫০্
কাজ ৮০্
মুক্তির স্বাদ ৫০্
মাথার ওপর ছাদ ৫০্
একদিন হঠাৎ ৪০্
নবীনা ৪০্
মানসম্মান ৬০্
রূপতাপস ৩০্
সোনার সংসার ৮০্
সীমাবদ্ধ ৬০্
জন-অরণ্য ১২০্
মরুভূমি ৬০্
আশা-আকাঙ্ক্ষা ৬০্
সুবর্ণ সুযোগ ৫০্
সম্রাট ও সুন্দরী ১০০্
বিত্তবাসনা ৩০্
বোধোদয় ৫০্
নগর নন্দিনী ৬০্
সীমন্ত সংবাদ ৫০্
স্থানীয় সংবাদ ৪০্
নিবেদিতা রিসার্চ
ল্যাবরেটরি ৫০্
পদ্মপাতায় জল ৫০্

Penguine English
Translations
Chowringhee 325/-
The Middleman 200/-

ছোটদের বই

এক ব্যাগ শংকর ৬০্
চিরকালের উপকথা ৪০্
গল্প হলেও সত্যি ২০্
মনে পড়ে ২০্

শংকর-এর সব বই দে'জ-এ পাওয়া যায়
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
Telephone : 2241 2330/2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com

ব্যান্ডোদার প্রারম্ভিক মন্তব্য

ভাবা যায় না! হাওড়া কাশুন্দের শ্রীমান শংকর টক ঝাল মিষ্টি ইত্যাদি ষড়রস নিয়ে বাংলায় বই প্রকাশ করছে, আর আমি নতুন সহস্রাব্দের প্রথম রাত্রে সুদূর আমেরিকায় বিভারলি হিলস-এর বাড়িতে বসে সেই বইয়ের ভূমিকা রচনা করছি।

এই বই যাঁরা পড়বেন তাঁরা জানতে পারবেন অনেকদিন আগে এন-আর-আই অর্থাৎ 'ভারতসে-ভাগা' ভারতীয় হয়ে আমি জন্মস্থান বাংলা থেকে বহু দূরে এবং হলিউডের খুব কাছে এই পল্লীতে বসবাস করছি। বহুদিন আগে স্রেফ আট ডলার পকেটে নিয়ে ভাগ্যসন্ধানে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলাম। প্রবাসে যখন কষ্ট করছি তখন একটাই ভরসা ছিল, আমার পকেটে তিন সিংহর ছাপওয়ালা একটা ভারতীয় পাশপোর্ট আছে। এখন ওই আট ডলার বাড়তে বাড়তে মিলিয়ন অতিক্রম করে গিয়েছে, কিন্তু যা হারাতে হয়েছে তা হল জন্মসূত্রে পাওয়া পাশপোর্টটা। অর্থাৎ আমি এখন বিদেশের নাগরিক। কলকাতা এবং হাওড়া থেকে বহুদূরে এই নির্জন নগরীতে বসে সে কথা ভাবতে কেন জানি না ভীষণ কষ্ট হয়।

ভাগ্যের পরিহাসে, জীবিকার প্রয়োজনে ভাসতে ভাসতে যে দেশে উপস্থিত হয়েছি সে দেশ যেমন অনেক কিছু দিয়েছে উদারভাবে তেমন কেড়ে নিয়েছে বেশ কিছু নিষ্ঠুরভাবেই। তাই হাওড়া কলকাতার বেগুনি ফুলুরি সিঙাড়া নিমকি সন্দেশ রসগোল্লা আমার স্বপ্নে আজও ধরা দেয় কিন্তু কাছে আসতে চায় না। মনকে বোঝাই, আমি বিদেশের নাগরিক হলেও বিদেশী নাগরিক নই—এই কলকাতা, এই হাওড়া, এই বাংলা এবং এই ভারত একদিন আমার একান্ত নিজস্ব ছিল, এখন পরিস্থিতির বিপাকে এই পবিত্র উত্তরাধিকার আমাকে ত্যাগ করতে হয়েছে।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, বিবাহিতা স্ত্রীকে ডাইভোর্স করা যায়, কিন্তু গর্ভধারিণী মাকে কিছুতেই ডাইভোর্স করা সম্ভব নয়। এখন মনে হয়, যে মাতৃভূমিতে ভূমিষ্ঠ হওয়া যায় সেখানেও একই পরিস্থিতি। তাই ভারতবর্ষ বারে বারে নানা রূপে আমার চোখের সামনে উপস্থিত হয়। বিজ্ঞানের এই যুগ অনেক কিছু দিয়েছে, যাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বেগ উপহার দিয়ে মানুষের আবেগ কেড়ে নেবে তাঁরা ভুল প্রমাণিত হয়েছেন। হৃদয় থেকে মানুষ যা চায় তা দূরে সরিয়ে দিতে বিজ্ঞান এখনও তৎপর হয়নি। তাই আমি মাঝে মাঝে দমদম এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করি কখনও নোটিশ দিয়ে, কখনও বিনা নোটিশে। কলাবেচার প্রফেশনে আছি, তাই রথের ভিড়ে কেউ আমার পাশপোর্ট নিয়ে মন্তব্য করার সময় পায় না। কেউ জিজ্ঞেস করে না, কেন এখানে এসেছ?

শ্রীমান শংকরের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের। বনগাঁয়ে শিয়ালরাজা হবার স্বপ্ন নিয়ে বাংলার লেখকরা বড্ড ব্যস্ত হয়ে থাকে। লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে—তা বাঙালি লেখকের ভাগ্যে সম্ভব হয় না। কিন্তু আমি দেখেছি, শংকরের সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে আমার মতের ঐক্য আছে। উৎসাহ ভরে সেই আমাকে প্রথম বলেছিল ষড়রসের কথা—এবং আমি এদেশ থেকে খবর দিয়েছিলাম, সায়েবরা চেষ্টা করেও চারটের বেশি রসের ঠিকানা পায়নি। আমরা দু'জনে টক ঝাল নোনতা এবং

মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে ভাবের আদান-প্রদান করতে গিয়ে বুঝেছি, রসনারও একটা নিজস্ব ইতিহাস এবং নিজস্ব ভূগোল আছে। সারা বিশ্বের নানা বৈষম্য ও বৈচিত্র্য তাই মানুষের রান্নাঘরে একাকার হয়ে গিয়েছে, বহুর মধ্যে ঐক্যকে অনুভব করার প্রথম সৌভাগ্য ও কৃতিত্ব বোধহয় রাঁধুনিদের।

রসের সন্ধানে গত কয়েক বছরে আমরা একসঙ্গে বেশ কিছু খোঁজখবর চালিয়েছি। বিদেশে বসবাস করে আমি বুঝেছি, এই বিষয়ে যথার্থ স্বীকৃতি অর্জন করতে হলে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে নানা তথ্য আমাদের উদ্ধার করতে হবে এবং সেগুলি ঝেড়েপুঁছে নবসাজে বিশ্বসভায় উপস্থিত করতে হবে। এই কাজে আমাদের আরেকজন উৎসাহী সহযোগী প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ সর্বদমন রায়। নাম দেখে ভয় পাবেন না, মানুষটির মধ্যে অদম্য উৎসাহ ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করিনি। নানা রসের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে প্রবাসে আমি মানসিক আনন্দ পেয়েছি প্রচুর, এখনও অনেকদিন সে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু গল্পলেখকের বদস্বভাব অনেক, সুযোগ পেয়েই আমার মতন একজন সাধারণ মানুষকে শ্রীমান শংকর ছোটখাট হিরো বানিয়ে দিয়েছে।

শ্রীমান শংকর স্বভাবে কিছুটা অধৈর্য—আমার সঙ্গে বিভিন্ন অলিগলি ঘোরাঘুরি পর্বটা এমনভাবে সাজিয়ে নিয়েছে যে টক ঝাল মিষ্টির সঙ্গে শুধু ইতিহাস ভূগোল নয় বেশ কিছু গল্পগাথাও মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। ওর ধারণা, রাঁধুনি ও লেখক দু'জনেরই লক্ষ্য এক—মানুষকে তৃপ্তি দেওয়া। সেই তৃপ্তির সঙ্গে যদি পুষ্টিরও দেখা মেলে তা হলে তো কথাই নেই।

মোদ্দা কথাটা হল, আমি, সর্বদমন ও তার নিজের গল্পটা শংকর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখে রাখতে চায়, যাতে পৃথিবীর বাঙালিরা অন্তত রসনা বিষয়ে কখনও আত্মবিস্মৃত না হয়।

এই বইয়ের নাম 'রসবতী' দেখে আমি কিছুটা আশ্চর্য হয়েছিলাম। কারণ কোথাও তো কোনো সুরসিকা নারীচরিত্রের তেমন উল্লেখ নেই। কিন্তু ফোন করতে সর্বদমন রায় আমাকে জানালেন, প্রাচীনকালে দূরদর্শী নরপতিরা রাজকীয় রান্নাঘরকে রসবতী বলতেন। ভারি সুন্দর নাম, ইউরোপ আমেরিকার কোনো সম্রাট অথবা সম্রাজ্ঞী রান্না ঘরের ব্যাপারে কখনও এতোটা দূরদর্শী হতে পারেননি।

শুধু রসালো ফল নয়, মাঝে মাঝে শিল-নোড়াতেও রস লুকিয়ে থাকতে পারে, তা প্রমাণ করবার জন্যে এই বইয়ের লেখক বিশেষ উৎসাহী হয়েছেন। কিন্তু পাথর থেকে রস বার করতে হলে যে শিক্ষা, স্থৈর্য ও নিপুণতা প্রয়োজন তা একজন অর্ডিনারি বাঙালি গল্প লেখকের কাছে প্রত্যাশা করা অনুচিত। গলিঘুঁজির শহর কলকাতা থেকে কচুরি সিঙাড়া জিলিপির মধ্য দিয়ে শ্রীমান শংকর ভারতীয় সভ্যতার মূল্যায়ন করতে চেয়েছে। অনুসন্ধান শুরু করেছে কিন্তু শেষ করতে পারেনি। আমি শংকরকে এই সাবজেক্টে আরও চাঞ্চল্যকর সংবাদ সংগ্রহ করে আরও বিস্তারিতভাবে লেখার জন্যে চাপ দেবো। এখনকার মতন ওকে কেবল উৎসাহ জানাই।

ইতি

১লা জানুয়ারি ২০০০

পেটপুরে জিলিপি খেলে পুনর্জন্ম হয় না।

ভাল আর্টিস্ট এবং ভাল কুকের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

কচুরি, সিঙ্গাড়া, রাধাবল্লভী এখনও বাঙালির প্রিয় জলখাবার।

সন্তান উপবাসী থাকলে মা কিছুতেই স্বস্তি পেতে পারেন না।

লেডিকেনির উৎপত্তি অবশ্যই লর্ড-ক্যানিং-এর ভারতবাসের সময়।

লঙ্কা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এমন ঘটনার উল্লেখ লাস্ট দুশো বছরে নেই।

লুচির সঙ্গে ছোলার ডাল, না ছোলার ডালের সঙ্গে লুচি বিক্রি হয় তা বলা কঠিন।

ড্রিংকের সঙ্গে পিঁয়াজির স্বাদ সাহেবরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে।

ইংলন্ডে পাঠক মশলার বিক্রি তিনশো কোটি টাকার ওপরে।

চিয়ারস্—আপনার বাংলা লেখাটা পাঠযোগ্য হোক।

কারির বিশ্বকেন্দ্র হয়ে উঠেছে লন্ডন—থ্যাঙ্কস টু বেঙ্গলিজ।

জাহাঙ্গিরের মদিরাপ্রীতির কথা তো ইস্কুলের ছেলেদেরও জানা।

ভোজনের ব্যাপারে রোমানরা যেরকম মন দিয়েছিলেন পৃথিবীর কেউ পাল্লা দিতে পারেনি।

পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।

'মোদো' মাতালের চেয়ে 'চেয়ো' মাতাল অনেক বেশি নিরাপদ।

যে একবার উজ্জ্বলায় এসেছে সে মজেছে চিরকালের জন্য।

মেঠাই রহস্য

বড় অভাগা জাত এই বাঙালি। চান্স পেলেই এই জাতের নিন্দে করবার জন্যে সারা দুনিয়া যেন সারাক্ষণ উঁচিয়ে আছে।

এই দেখুন না, বাঙালি একটু মিষ্টি ভালবাসে বলে, সায়েবরা ইংরিজিতে বই লিখে নিন্দে করলো বাঙালিদের। কেইন বলে এক চ্যাড়া ইংরেজতনয় উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিতভাবে নিবেদন করলো : মিষ্টান্নপ্রীতি বাঙালিদের জাতীয় দুর্বলতা—মণ্ডামিঠাই সন্দেশ পেলে ভেতো বাঙালি আর কিছুই চায় না। এই পরশ্রীকাতর ইংরেজনন্দনের বংশধরদের সবিনয়ে জানানো প্রয়োজন—মিষ্টি ভালবাসে না এমন জাত পৃথিবীতে নেই। লুকিয়ে-লুকিয়ে সাদা সায়েবরা টন টন আইসক্রিম এবং 'ডেজার্ট' প্রতিঘণ্টায় উড়িয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু মিষ্টিদাঁতের বদনাম করার বেলায় কেবল বাঙালির উল্লেখ!

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় সুপণ্ডিত এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম,

বাঙালিরা কবে থেকে এমন মিষ্টিপাগল হলো?

অধ্যাপক সর্বদমন রায় এক পৌরাণিক গল্প ফেঁদে আমাকে দমিয়ে দিলেন। একবার এক হ্যাংলা আর্যপুত্র নাকি স্বশরীরে স্বর্গে গিয়ে ওখানে বহু কৃত্রিম পাহাড় (ওঘ) দেখতে পেলেন। কোথাও মিহিদানার পাহাড়, কোথাও সীতাভোগের ওঘ, কোথাও বোঁদের মরুভূমি, কোথাও বা রাবড়ি সরোবর কিংবা দইয়ের বিশাল দিঘি। এই সব দেখে হ্যাংলা এমন মাতামাতি শুরু করে দিলেন যে, যমরাজ সামলাতে না পেরে বাধ্য হয়ে তাকে স্বর্গচ্যুত করলেন এবং আর্যপুত্র এসে ধপাস করে পড়লেন বঙ্গভূমিতে। এই হ্যাংলাকে খুশি করতে গিয়েই বাংলার ময়রারা একসময় হিমসিম খেয়েছেন এবং তার ফলেই এই বঙ্গভূমি মিষ্টান্নের পবিত্রভূমি হয়ে উঠলো।

মিষ্টান্নের পিছনে যেসব মৃত্যুঞ্জয়ী স্রষ্টা রয়েছেন তাঁদের স্মরণীয় ভূমিকার ব্যাখ্যাও হাতে-হাতে পাওয়া গেলো। মোদকের পিছনে যে সম্মানিত শিল্পীটি রয়েছেন সংস্কৃতে তাঁকে বলা হতো মোদকরক। যে বিনয়ী মানুষটি আমাদের মোয়া সরবরাহ করেন সরল বাংলায় তিনিই হলেন ময়রা। বাঙালি হিসেবে আমাদের মনে রাখতে হবে, রসনার পরিতৃপ্তির জন্যে সৃষ্টিকর্তা তিক্ত-কটু-কষায়-লবণ-অম্ল-মধুর ছয় রসের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাঙালিরা এককালে নির্দ্বিধায় সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে মধুররসকে।

"তার মানে নোনতায় বাঙালির মন নেই?" আছে, আছে—তবে এটা অবক্ষয়ের লক্ষণ। নোনতার নির্ধারিত স্থান মধ্যমে—মনে রাখতে হবে, এক সময় মিষ্টির পরেই বাঙালির প্রিয় রস ছিল অম্ল। এমনকি বিশ্বকবির পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অমন মোহমুক্ত পুরুষ হয়েও বারো মাস কাঁচা আমের অম্বল খেতে চাইতেন।

"দাঁড়া একটু লিখে নিই," বললেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যান্ডোদা।

পুরো ব্যাপারটা এখনও খুলে বলা হয়নি—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ ব্যান্ডোদা মার্কিন মুলুকে হলিউডের বেভারলি হিল্‌স প্রাসাদ থেকে ক'দিনের জন্য কলকাতা ভ্রমণে এসেছেন এবং আমরা তিনজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি বিশেষ এক অনুসন্ধানে।

ব্যান্ডোদা আগে ছিলেন জগদ্বিখ্যাত ম্যাকইনসে কোম্পানিতে সিনিয়র পরামর্শদাতা, কয়েক মিলিয়ন ডলার উপার্জন করার পর তিনি দেখলেন প্রাচীন ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট জ্ঞান ডাক্তার দীপক চোপরা স্টাইলে বিদেশে বিপণন করলে সাফল্য ও উপার্জন অনেক বেশি। সেই পথেই বিপুল প্রতিষ্ঠা ও অর্থ উপার্জন করে ব্যান্ডোদা চিত্রতারকাদের বিফল মনোরথ করে হলিউডে গোটা একখানা পাহাড় কিনে নিয়েছেন।

সারাক্ষণ ব্যান্ডোদা নতুন চোখে ভারতবর্ষকে এবং বাঙালিদের ছেঁকে নেবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। ব্যান্ডোদার ধারণা শুধু প্রাচ্যের 'ইয়োগা' প্র্যাকটিস করেই পাশ্চাত্য দেশ স্তব্ধ থাকবে না, পরের পর অনেক নতুন কিছু ঘটবে।

সম্প্রতি ব্যান্ডোদা তাঁর ত্রিনয়নে যা দেখতে পাচ্ছেন, তা হলো এবারের বিপ্লব আসবে ভোজনজগতে। পাশ্চাত্য এবার প্রাচ্যের প্রাচীন রসনাকে অন্ধ অনুকরণ করতে অনুপ্রাণিত হবে।

আমি আশঙ্কা করেছি, বিশ্ববিপ্লবটা ঘটবে নোনতার ক্ষেত্রে। "ডেজার্টের ব্যাপারে সমস্ত পৃথিবীর রসনা যে ভীষণ রক্ষণশীল একথা আপনিই সেবার আমাকে বলেছিলেন।"

ব্যান্ডোদা উত্তর দিলেন, "এই হচ্ছে ইন্ডিয়ার অসুবিধে! যা একবার বলেছি, তা চিরকালের সত্য হয়ে থাকবে কেন? ধ্রুব সত্য বলে কোনও সত্যই পৃথিবীতে নেই। তুই জেনে রাখ, আমাদের নিজস্ব মিষ্টির দিকেও রসিক সায়েবদের নজর পড়লো বলে! তখন এই বাঙালিদেরই হবে জয়জয়কার, কারণ বাঙালি মিষ্টিকে যতোটুকু বুঝেছে এবং মিষ্টি বাঙালিকে যতোটুকু বুঝেছে পৃথিবীতে তার কোনও নজির এখনও পর্যন্ত নেই।"

বেজায় ছটফটে লোক এই ব্যান্ডোদা। অত দূর থেকে এদেশে এসেছেন হাতপা ছাড়িয়ে দু'দিন এদেশে বিশ্রাম নিন কলকাতায়। দেখা করুন পিসিমা, মাসিমা, বউদিদের সঙ্গে। তা নয়, সারাক্ষণ উদ্ভট অথচ অরিজিন্যাল সব চিন্তা নিয়ে গুলজার হয়ে আছেন। চুপি চুপি আমাকে বললেন, "এবার যে চান্স আসছে তা যদি বাঙালিরা নিতে পারে তা হলে অর্থনৈতিক সব দুঃখ ঘুচে গিয়ে এই বাংলা আবার সোনার বাংলা হবে।"

"আরও একটু ব্যাখ্যা করুন ব্যান্ডোদা, টাকাকড়ির বিষয়টা এই মুহূর্তে

বাঙালিদের পক্ষে খুবই সিরিয়াস।”

আমার অনুরোধে ব্যান্ডোদা খোলাখুলি ব্যাখ্যা করলেন। “ইন্ডিয়ান রান্না এখন চাইনিজ রান্নাকে হারিয়ে দিচ্ছে গোটা ইউরোপে এবং আমেরিকায়। চীনেরা তো মিষ্টি কাকে বলে তাই জানে না, যদিও চিনি কথাটা নাকি ও দেশ থেকেই এসেছে। নোনতা রান্নার দিকে যখন একবার দুনিয়ার নজর পড়েছে তখন মিষ্টির সুবর্ণযুগ এলো বলে। এবং কে না জানে, এই একটা সাবজেক্টে বাঙালি আজও দুনিয়ার একম্ এবং অদ্বিতীয়ম!”

ব্যাপারটা কীভাবে ঘটবে তাও ব্যান্ডোদা আন্দাজ করেছেন। “সন্দেশ রসগোল্লা লেডিকেনি তৈরির লোক দুনিয়ায় বেশি নেই—নকুড়, নবীন ময়রা, ভীম নাগ, সেন মহাশয়, গাঙ্গুরাম, দ্বারিক এবং মিঠাই যদি তাঁদের গোপন রেসিপিগুলো পেটেন্ট করিয়ে নেন, তা হলে ভীষণ কাণ্ড ঘটবে এই কলকাতায়। মনে রাখতে হবে, বাংলার বাইরে এই দুনিয়াতে প্রায় ছ'শো কোটি লোক আছেন—এঁরা যদি মাসে দু'খানা করে কড়াপাক খাবার সিদ্ধান্ত নেন তা হলে আমাদের মাসিক বৈদেশিক আয় দাঁড়াচ্ছে ছ' হাজার কোটি টাকা! সন্দেশের সঙ্গে রসগোল্লাতেও যদি দুনিয়ার রসনা কিছুটা আকর্ষণ করতে পারা যায়, তা হলে চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন, কে সি দাশ ইত্যাদি সূত্র থেকে আরও ছ' হাজার কোটি টাকা আসতে পারে এভরি মান্থ। বুঝছিস ব্যাপারটা!”

আমার মাথায় এতো বড় বড় হিসেব ঢোকে না। ব্যান্ডোদা ভর্ৎসনা করলেন, “রেখে দে তোদের কোকাকোলা-পেপসি, দুনিয়া যখন আমার মতন, নকুড় বা সূর্য মোদক বলতে অজ্ঞান হবে তখন কী কাণ্ডটা ঘটবে তা আন্দাজ কর।”

“বাংলার ময়রারা তখন লাখ লাখ ডলার টেকনিক্যাল ফি ও রয়ালটি উপার্জন করে নিউইয়র্ক, স্যানফ্রানসিসকো, লন্ডন, এবং জেনিভায় ছড়ি ঘোরাবে এবং বিলাস ভবন কিনবে জেনিভায়, মন্টিকার্লোতে। আর এ দেশের সন্দেশরসিকরা তখন হা-হুতাশ করবেন, যেমন কিছু বুড়ো এখন চিংড়ির বিদেশ গমন নিয়ে সারাক্ষণ চোখের জল ফেলে রপ্তানি বন্ধ করার জনমত সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছেন।”

ব্যান্ডোদা আশ্বাস দিলেন, "হাতগুটিয়ে বসে থাকিস না, সময় থাকতে গতর খাটিয়ে সন্দেশ রসগোল্লার রোমাঞ্চকর ইতিহাস আমাদের সংগ্রহ করতে হবে—এ বিষয়ে গুছিয়ে একখানা প্রমাণ সাইজের ইংরিজি বই নিউইয়র্ক থেকে ছাড়তে পারলে তোর নিজেরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে।"

এ-বিষয়ে আমার উৎসাহ খুব বেড়ে গিয়েছে। সব শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে বাঙালির বিশিষ্টতা এখন যে কেবলমাত্র বাংলার মিষ্টির মধ্যেই লুকিয়ে আছে তা কে না জানে?

ব্যান্ডোদা সাহস দিয়ে বললেন, "তুই বলতে চাইছিস, সন্দেশ রসগোল্লা পান্তুয়ার মতন রসস্নিগ্ধ মিষ্টান্ন বাঙালি ছাড়া আর কারও পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব হতো না? এর সঙ্গে একটু স্পেশাল টাচ্ দিতে হবে। এই সন্দেশ রসগোল্লা পান্তুয়া দুনিয়ার আর কোনও জাতের পক্ষে তৈরি করাও সম্ভব নয়—এটা বোঝানো শক্ত হবে না, কারণ স্কটল্যান্ডের বাইরে স্কচ হুইস্কির নকল করতে গিয়ে জার্মান থেকে জাপানি পর্যন্ত সবাই প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে, হাজার চেষ্টা করেও কোনও সাফল্য আসেনি। জেনে রাখিস, দুনিয়ার বাজারে যতো নকল স্কচ বেরিয়েছে আসল স্কচের চাহিদা ততো বেড়েছে। কমপিটিশনের বাজারে এইটাই নিয়ম।"

ব্যান্ডোদা জিজ্ঞেস করলেন, "তুই মিষ্টি দইয়ের নাম মুখে আনছিস না কেন?"

নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে উত্তর দিলাম, "ভেরি স্যরি ব্যান্ডোদা, কলকাতায় মিষ্টি দইয়ের বারোটা বেজে গিয়েছে—গত সপ্তাহে কলকাতায় এক দইপ্রেমী ডাক্তারবাবু দশটা বিয়ে এবং বউভাতের নেমন্তন্ন পেয়েছিলেন, একটাতেও দই পরিবেশন করা হয়নি। নামী কোম্পানির দামি আইসক্রিম বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে বাংলার মিষ্টি দইয়ের।"

ব্যান্ডোদা সাহস দিলেন, "দুঃখ করিস না, বাঙালিরা আবার একদিন দই খাবে, যখন ফরাসি বা ইতালিয়ান কোম্পানিগুলো বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপন দিয়ে ইয়োগার্ট ছাড়বে এখানকার বাজারে। তবে সেই ব্রানডেড দইয়ের জন্যে চার গুণ দাম দিতে হবে—সস্তায় কিছু বিক্রি করা সায়েবদের স্বভাবে একেবারেই নেই। এই দোষেই তো নিজের দেশেও সায়েবরা এখন দাঁড়িয়ে

মার খাচ্ছে, তাদের বাজার বোঝাই হয়ে যাচ্ছে এশিয়ার কমদামি জিনিসে।"

লস এঞ্জেলেসের বেভারলি হিল্স থেকে হুগলি জেলার ব্যান্ডেল অনেক দূর। কিন্তু এই মুহূর্তে হাওয়া গাড়ি চড়ে, আমরা কলকাতা থেকে হুগলির দিকে চলেছি।

মিষ্টির বিষয়টা ব্যান্ডোদার মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। দীপক চোপরা স্টাইলে তিনি এ দেশের সৃষ্টিশক্তির মূলে পৌঁছতে চান, অনুসন্ধান করতে চান এই বাংলা কেন এবং কেমন করে ভারতের সুইটমিট ক্যাপিটাল অথবা মিষ্টান্ন রাজধানী হয়ে উঠলো।

আমাদের সহযাত্রী অধ্যাপক সর্বদমন রায় সংস্কৃতেও পণ্ডিত। তিনি জানালেন, "ভারতের প্রাচীনতম মিষ্টি হলো মতিচুর। হাজার হাজার বছর ধরে চলছে, আদি নাম মুদগমোদক। কেউ কেউ মুখামোদকও বলে। বিষ্ণুপুরের এক ময়রা এর সংশোধিত সংস্করণ বার করে মল্লভূমের রাজার কাছ থেকে 'মণ্ডল' উপাধি লাভ করেছিলেন।"

জিলিপির বয়স জানতে চাইলেন ব্যান্ডোদা। "বলা শক্ত—তবে সংস্কৃত সাহিত্যে একসময় এর নাম ছিল কুণ্ডলিনী, যেমন বোঁদের আদি নাম বিন্দুক।" অধ্যাপক রায় বললেন, "পুরনো জিনিসকে নতুন মহিমা দিতে বাঙালিরা তুলনাহীন। কলকাতার ময়রাদের হাতে পড়ে জিলিপির নিঃশব্দ প্রমোশন হলো অমৃতিতে।"

জিলিপির জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠলেন সংস্কৃতজ্ঞ রায় মহাশয়। "ময়রারা বলে থাকেন, ইলাহাবাদে অথবা ত্রিবেণীতে বসে পেট ভরে জিলিপি খেলে পুনর্জন্ম হয় না। তবে এই কুণ্ডলিনী হওয়া চাই গুড়রসসিক্ত এবং সর্ষপতৈলভর্জিত। স্বয়ং প্রভাতরঞ্জন সরকারমশাই তাঁর সুবিখ্যাত শব্দচয়নিকায় এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।"

মিষ্টান্ন শব্দের উৎস জানতেও ব্যান্ডোদা বিশেষ আগ্রহী। অবশ্যই এর অর্থ পায়েস। কিন্তু শাক্তরা প্রায়ই পায়েসে কারণবারি মিশিয়ে খেতেন, এই জন্য নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবরা পায়েস বলা ছেড়ে দিয়ে নতুন নাম দিলেন মিষ্টান্ন।

গজাও অতিপ্রাচীন মিষ্টি। আদি নাম মণ্ড। সংস্কৃতে কখনও কখনও গো-

জিহ্বাও বলা হচ্ছে।

অধ্যাপক রায় সবিনয়ে জানালেন, "শাস্ত্র অনুযায়ী গজা বলকারক, গুরুপিত্তনাশক, বায়ুনাশক ও রুচিকর। এই গজারই রাজসংস্করণ লবঙ্গ লতিকা যার আদিনাম কর্পূরনালিকা। বাঙালি ময়রার হাতে পড়ে গজা শতরূপে শতদেশে প্রচারিত হলো—রাজা গজা, পান গজা, জুবিলি গজা, এমপ্রেস গজা, এমনকি বাবরশা।"

ব্যান্ডোদা ভরসা পাচ্ছেন। "মহাশক্তিমান মোগলবাদশারাও তা হলে বাংলার মিষ্টির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।"

অধ্যাপক রায় বললেন, "মেদিনীপুরের বাবরশার সঙ্গে হুমায়ুনের পিতৃদেব বাবরের কিন্তু কোনও সম্পর্ক ছিল না। বাঙালিরা চিরকালই সায়েবঘেঁষা—চান্স পেলেই বড় বড় ইংরেজ সায়েবদের স্মৃতি নিজেদের মিষ্টান্নে অক্ষয় করতে চেয়েছে। যেমন কুইন ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিতে এমপ্রেস গজা। মেদিনীপুর ঘাটালে এডওয়ার্ড বাবর নামে এক রেশম কুঠিয়াল ছিলেন। মিষ্টান্নপ্রেমী এই সায়েবকে সম্মানিত ও সন্তুষ্ট করার জন্যে পরাণ আটা নামে এক সৃষ্টিশীল ময়রা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে বাবরশা আবিষ্কার করেন।"

সায়েব-মেমদের স্মৃতিবিজড়িত মিষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নামকরা কোনটা? জানতে চাইছেন ব্যান্ডোদা।

এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই, অবশ্যই লেডিকেনি। কিন্তু কে এই লেডিকেনির আবিষ্কারক?

অধ্যাপক রায় জানালেন, "কিছু দিন আগে শ্যামল সান্যালমশাই লিখলেন, লেডিকেনির আবিষ্কারক ভীম নাগ। লর্ড ক্যানিং-এর জন্মোৎসবে নাগমশাই নাকি এটি আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই দাবির প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পান্তুয়া বস্তুটি এ দেশে অনেক দিন আছে, এর খুড়তুতো ভাই গোলাবজামুন। পানি তাওয়া অর্থাৎ পাতলা রসে ডুবোনো হতো বলে পান্তুয়া। লেডিকেনিকে যদি পান্তুয়ার রাজসংস্করণ বলা যায় তা হলে এর উৎপত্তি অবশ্যই লর্ড ক্যানিং-এর ভারতবাসের সময়ে।

"তাঁর অসামান্য সুন্দরী স্ত্রী এই কলকাতাতেই দেহ রাখেন, তাঁর সমাধি দেখার ইচ্ছে হলে যে কোনও দিন ব্যারাকপুর ঘুরে আসুন। লেডিকেনির আবিষ্কার নিয়ে ত্রিমুখী দ্বন্দ্বে রয়েছেন ভীম নাগ, বহরমপুর ও হাওড়া।

"হাওড়ার আমতা থানায় থাকতেন দুর্লভচন্দ্র ঘোষ, হাওড়ার মিষ্টান্ন কারিগররা এখনও বলে থাকেন, এই দুর্লভই লেডিকেনির স্রষ্টা। যে-কোনও মিষ্টান্ন সম্পর্কে হাওড়ার দাবিকে হাল্‌কাভাবে নেবেন না, কারণ কলকাতার সমস্ত নামকরা মিষ্টির দোকানের প্রায় সব কুশলী কারিগরের নিবাস হাওড়া। সামান্য কিছু কর্মী অন্য জেলার লোক।

"শোনা যায়, দুর্লভবাবুর দোকান ছিল হাওড়া কদমতলায়। হাওড়াবিরোধী লবির দাবি, লেডিকেনির জন্ম বহরমপুরে খাগড়া বাজারে। সিপাহি বিদ্রোহের পরে লর্ড ক্যানিং সস্ত্রীক সেখানে গিয়েছিলেন এবং তাঁরই সম্মানে একটি জাম্বোসাইজের (দশ সের) পান্তুয়া তৈরি করে নাম দেওয়া হয়েছিল লেডিকেনি। এই মুর্শিদাবাদ জেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দুর্ভিক্ষত্রাণ শুরু করেন পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দ। একবার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে একটি আধমণি লেডিকেনি বেলুড় মঠে নিয়ে এসেছিলেন।"

প্রফেসর রায় গম্ভীরভাবে বললেন, "লেডিকেনির ত্রিমুখী দ্বন্দ্বটা আপনারা ঐতিহাসিক মাপকাঠিতে মিটিয়ে নিন। প্রাচীন শাস্ত্রে দুগ্ধকৃপিকা নামে এক মিষ্টান্নের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এর প্রস্তুতপ্রণালী দেখে সন্দেহ হয়, এই দুগ্ধকৃপিকাই একটুআধটু রূপ পাল্টে লেডিকেনি হয়েছে।"

একই রকম উত্তেজনা রয়েছে ল্যাংচাকে কেন্দ্র করে, যাকে সহজেই পান্তুয়ার মাসতুতো বোন বলা যেতে পারে।

যাঁরা বলেন, ল্যাংচার আবিষ্কার খোদ কলকাতায়, তাঁদের দাবি শিবলিঙ্গের আকার থেকে ল্যাংচা নামের উৎপত্তি। এবার চলে আসুন বর্ধমানের পথে শক্তিগড়ে। ওখানে ছিল হারাধন দত্তের দোকান। তাঁর দুই ভাগ্নে—রমণ দত্ত ও ক্ষুদিরাম দত্ত। ওঁদের দোকানে কালনা থেকে আসা এক প্রতিবন্ধী (ল্যাংড়া) কারিগর এই মিষ্টি প্রথম তৈরি করেন। পাশের এক গোলাদারি দোকানের মালিক নতুন মিষ্টির প্রেমে পড়ে মাঝে মাঝে হাঁক

দিতেন—'ল্যাংচা দে।' নামকরণের কৃতিত্ব যে ভদ্রলোকের তাঁব নাম ভুবন গুহ।

মিহিদানা ও সীতাভোগের নামকরণের কৃতিত্ব দেওয়া হয় বর্ধমানের তৎকালীন মহারাজাকে। আবিষ্কারকের তালিকায় রয়েছেন ভৈরব নাগ। বাংলার ছোটলাট ও দু'জন হাইকোর্ট জজ একবার বর্ধমানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এঁদের সম্মানে এবং রাজনির্দেশে নতুন মিষ্টির সৃষ্টি হলো, যার উৎসস্থলে রয়েছে বোঁদে। সরু সরু দানা দেখে চমৎকৃত মহারাজাধিরাজ বললেন, এ তো মিহিদানা। ব্যাপারটা যদি কিংবদন্তি না হয় তা হলে এর ঘটনাকাল উনিশ শতকের শেষ দশক। তবে দরবেশের উৎপত্তি যে কলকাতার ময়রাদের কারখানায় এ-বিষয়ে সর্বদমন রায়মশাইয়ের মনে কোনও সন্দেহ নেই।

তিনি আরও বললেন, "মিহিদানার জন্ম বর্ধমানে হলেও, ওয়ার্ল্ডের সেরা মিহিদানা যে কলকাতায় হ্যারিসন রোডের দোকানে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে সন্দিহান হবেন না।"

মিষ্টান্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে আমাদের হাওয়াগাড়ি কল্যাণী হাইওয়ে ধরে উত্তর দিকে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে।

বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সেতু ধরে ব্যান্ডোদা বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেছেন, কিন্তু বাঁশবেড়িয়ার কাছে চতুর্থ গঙ্গা সেতুটি তাঁর দেখা হয়নি। মিষ্টির সন্ধানে কেন তিনি এতো জায়গা থাকতে হুগলি জেলায় সরেজমিনে তদন্তে চলেছেন তাও পরিষ্কার করে বলেননি।

আমি অনেকবার ব্যান্ডোদাকে বুঝিয়েছি যে, কলকাতায় যে হাজার পাঁচেক মিষ্টির দোকান আছে তার খবরাখবর ঠিকমতো নিতে গেলে একটা জীবনকাল ব্যয় করতে হবে।

মুচকি হেসেছেন ব্যান্ডোদা, ইঙ্গিত দিয়েছেন, বিদেশে বসবাস ও গবেষণা করে তাঁর মানসনেত্র খুলে গিয়েছে। সব সময় নতুন কিছুর এবং অরিজিন্যাল কিছুর খোঁজখবর না করলে কালের বালুকাবেলায় ঐতিহাসিক হিসেবে স্থায়ী পদচিহ্ন এঁকে রাখা সম্ভব হবে না।

অধ্যাপক রায় এক একটি প্রাচীন প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন এবং ব্যান্ডোদা তা তাঁর টেপরেকর্ডারে সযত্নে সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। রাস্তার যা অবস্থা এবং গাড়ির যা ঝাঁকুনি তাতে কাগজে কিছু লিখে নেওয়া প্রায় অসম্ভব।

অধ্যাপক রায় জানালেন, খাজা মিষ্টিটি আদিকালেও ছিল, তখনকার নাম ফেণিকা। আর একটি মিষ্টির নাম ছিল শিখরিণী, যা তৈরি হতো ঘি, দই, গুড় ও আদা দিয়ে। এই শিখরিণী বঙ্গদেশ ত্যাগ করে মহারাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছে শ্রীখণ্ড নামে।

সে কালের অতি জনপ্রিয় দুগ্ধবেষ্ট হয়েছে একালের ক্ষীরের বড়া।

দই ছিল নানা রকমের, পাতলা দইকে বলা হতো দ্রগড়। এ সবের মূলে রয়েছে গুড় অথবা চিনি। গুড় যে অতি প্রাচীন শব্দ এবং তার বয়স যে অন্তত পনেরো হাজার বছর তা আমার জানা ছিল না—গুড়ের ওপর শ্রদ্ধা বেজায় বেড়ে গেলো।

অধ্যাপক রায় দুঃখ করলেন, "এ কালের সাহিত্যিকদের কোনও ভাষাগত ভিত নেই—এঁরা জানেন না বড়দানার চিনির আদি নাম বিগুড় এবং গুড়ের পাটালিকে সে কালের রসিকজন গুড়পট্ট বলতেন।"

ব্যান্ডোদা এখনও নিজেকে সন্দেহের আলো-আঁধারিতে রেখে দিচ্ছেন। নিজের লক্ষ্য কী তা আমাদের পরিষ্কার বুঝতে দিচ্ছেন না। তাঁর মন্তব্য, "যেসব খাবারের, তা নোনতাই হোক আর মিষ্টিই হোক, সংস্কৃত নাম আছে সেগুলি ধ্রুপদী, আর যার নিতান্তই স্থানীয় নাম সেগুলি সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে।"

অধ্যাপক রায় উৎসাহিত হয়ে বললেন, "ঠিক ধরেছেন। অমন যে মুড়ি তারও সংস্কৃত নাম রয়েছে হুড়ম্ব। সিঙাড়ার ভাল নাম শৃঙ্গাটক, কচুরির পুরিকা, ডালপুরি বেষ্টনিকা, কিন্তু নিমকির সংস্কৃত নামের সন্ধান অনেক চেষ্টা করে এখনও পাওয়া যায়নি। তার মানে নিমকি সাম্প্রতিক।"

"লুচি কি প্রাচীন?" সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন ব্যান্ডোদা।

"লুচির ভাল নাম শস্কুলী। আবার কখনও সোমা। তবে মনে রাখতে হবে এই ময়দা শব্দটি ফার্সি। এদেশে ময়দার জনপ্রিয়তা পর্তুগিজদের কল্যাণে। লুচির তিন রূপ—ময়ান দিয়ে ভাজলে খাস্তা, ময়ান না দিলে

সাপ্তা, আর আটার লুচি হল পুরি।"

অধ্যাপক রায়ের আদি দেশ ওপার বাংলায়। দিনাজপুরের পুরনো স্মৃতি উথলে উঠলো, তিনি বললেন, "ওখানে লুচির সাইজ বগি থালার মতন।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "একবার মালদহে গিয়েছিলাম, ওখানকার বারো ইঞ্চি ব্যাসের লুচি অতি উত্তম।" এই লুচিই যে মেদিনীপুর পৌঁছে তামার ডবল পয়সার আকার ধারণ করেছে তা সখেদে স্বীকার করলেন অধ্যাপক রায়। সে কালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কর্তারাও মেদিনীপুরি পাচকদের পাল্লায় পড়ে এই ডবল পয়সা সাইজের লুচিভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ব্যান্ডোদা এবার মন্তব্য করলেন, "তা হলে ভারতের অঙ্গনে উনিশ শতকের রেনেশাঁসের উপহার বলতে কেবল রসগোল্লা, যাকে সায়েবরা একসময় স্নোবল বলে ডাকতেন, কিন্তু প্রাচীন ভারতে কেউ এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। জয় হোক নবীন ময়রার, রসগোল্লা আবিষ্কার করে বাঙালিকে বিশ্বের মিষ্টান্ন সভায় সুপ্রিতিষ্ঠিত করলেন।"

মৃদু প্রতিবাদ জানাতে হলো। "ব্যান্ডোদা, কিংবদন্তি তেমন কথা কখনও কখনও বলছে। কিন্তু নবীন ময়রা বোধহয় বিশেষ ধরনের রসগোল্লার আবিষ্কর্তা যার নাম স্পঞ্জ রসগোল্লা।"

অধ্যাপক রায় বললেন, "বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি, তার মিষ্টান্নের ইতিহাসও বেশ অস্পষ্ট এবং পরস্পরবিরোধী তথ্যে ভরা। বাগবাজারের নবীন ময়রার অনেক আগে রানাঘাটে ১৮৪৬-৪৭ সালে জনৈক হারাধন ময়রার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে যিনি উপাদেয় রসগোল্লার সৃষ্টি করেছিলেন স্থানীয় জমিদার পালচৌধুরীদের জন্যে। রসগোল্লা নামটা নাকি জমিদারবাবুই দেন।"

"বাংলার মিষ্টি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে প্রণব রায় বলেছেন, স্পঞ্জ রসগোল্লা বহরমপুরের ১৬ মাইল পূর্বে ইসলামপুরের কাছে কালাভাঙা-ঘাটে ফটিক সরকার নামে এক ময়রা আবিষ্কার করেন। এখন ফটিক সরকারের দোকান নেই, কিন্তু কালাভাঙাঘাটে আদি স্পঞ্জের রসগোল্লা এখনও বিক্রি হয়। কলকাতা হাইকোর্টের কাছে আর এক বিশ্ববন্দিত ময়রা ছিলেন, তাঁর নাম ব্রজ ময়রা। ইনিও ১৮৬৬ সালে রসগোল্লা তৈরি

করেছিলেন শোনা যায়। সুতরাং নবীন ময়রাকে স্পঞ্জ রসগোল্লার উদ্ভাবক বললেই প্রকৃত সম্মান করা হবে। উনিশ শতকে রসগোল্লা উদ্ভাবকদের মধ্যে বেনেটোলার দীনু মোদকের নামও ওঠে। আসলে সব শিল্পীই একই মিষ্টান্নে নতুন কিছু সংযোজন করেন। যেমন এখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় রসগোল্লা প্রতিষ্ঠানের নাম চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভান্ডার। এঁদের বিশেষত্ব রসগোল্লাতে নামমাত্র চিনি ব্যবহার করেও তার রসমাহাত্ম্য সুনিপুণভাবে রক্ষা করা।"

"এই হচ্ছে বাঙালি জাতের দোষ। কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হতে পারে না। অমন যে অমন রসগোল্লা তার উদ্ভাবককে সমস্ত জাত যে একসঙ্গে নতমস্তকে স্মরণ করবে, সম্মানিত করবে তার পথ খোলা নেই," ব্যান্ডোদা দুঃখ করলেন। "একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, বড় একজন ঐতিহাসিক, বিরাট এক বাহিনী নিয়ে উনিশ শতকের বাংলায় মিষ্টান্ন রহস্যের ওপর আলোকপাত করলে বাঙালি জাতের মুখ রক্ষা হবে।"

"শুধু রসগোল্লা নয়, নোনতা নিয়েও নানা মুনির নানান মত রয়েছে, যা আর একজন ঐতিহাসিককে সমস্ত জীবন ব্যস্ত রাখতে সক্ষম হবে। এই ধরুন রাধাবল্লভী। লোকমুখে শোনা যায় খড়দার শ্যামসুন্দরকে আপ্যায়ন করার জন্য স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই খাবারের উদ্ভাবন করেন এবং রাধাবল্লভ বা কৃষ্ণের নামে নাম রাখেন রাধাবল্লভী। খোঁজ নিলে দেখবেন খড়দার রাধাবল্লভীর এখনও যথেষ্ট নামডাক রয়েছে। কিন্তু কলকাতাপ্রেমীরা দাবি করছেন এই মুখরোচক খাবারটির সৃষ্টি শোভাবাজার রাজবাটিতে— গৃহদেবতা রাধাবল্লভকে নিত্য ভোগ দেওয়া হতো। আবার যাঁরা কলকাতার বিখ্যাত পুঁটিরামের ভক্ত, তাঁরা বলেন পুঁটিরামের পিসেমশাই জিতেন মোদক বৃন্দাবনে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে রাধাবল্লভীর সৃষ্টিরহস্য আয়ত্ত করে কলকাতায় ফিরে এসে পুঁটিরামকে গৌরবান্বিত করেন।"

বিভিন্ন মিষ্টির উদ্ভাবক সম্পর্কে ব্যান্ডোদা ক্রমশই হাল ছেড়ে দিতে চাইছেন। এই সব বড় বড় স্রষ্টা কেন বিভিন্ন আবিষ্কারের পেটেন্ট নেননি? পেটেন্টের জোরে দুনিয়ার ফ্রানচাইজিদের লাইসেন্স দিয়ে কোটি কোটি

ডলার তাঁরা সবজেই রোজগার করতে পারতেন।

অধ্যাপক রায় ঢুলু ঢুলু নয়নে বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে বললেন, "বড় বড় বাঙালিরা চিরকাল নিখিল বিশ্বের অবিমিশ্র মঙ্গল চেয়েছেন, নিজের উপার্জন চাননি। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু থেকে আরম্ভ করে নকুড় নন্দী পর্যন্ত সকলের একই চিন্তাধারা, নিজের স্বার্থের জন্যে কোনও গুণ বা আবিষ্কার লুকিয়ে রেখো না।"

ব্যান্ডোদা এবার জানতে চাইলেন, "মিষ্টান্ন শিল্পের অক্সফোর্ড কেমব্রিজ বলতে আমরা কোন জায়গাটা বুঝবো?"

"এ বিষয়ে কোনও মতবিরোধ নেই, ব্যান্ডোদা। জায়গাটার নাম অবশ্যই জনাই। এখানকার মনোহরা শুধু বিশ্বজনের মনোহরণ করেনি, এখানকার প্রখ্যাত শিল্পীরাই জনাই থেকে বেরিয়ে কলকাতায় এসে নিজের প্রতিভায় বিশ্ববিজয় করেছেন।"

"উদাহরণ দিন, শুধু মুখের কথায় চিঁড়ে ভিজবে না।"

অধ্যাপক রায় ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, "নোনতা দিয়েই শুরু করি। এখন যে সিঙাড়া কলকাতার শীতের সময় জনগণকে মাতিয়ে রাখে, মজিয়ে রাখে তার উদ্ভাবক জনাই-এর পতিরাম ময়রা। উনিশ শতক থেকে যে নামটি সন্দেশের দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল সেই ভীম নাগের আদি ঠিকানা এই হুগলি জেলার জনাই। আর সন্দেশের শেষ কথা বলতে যাঁদের বোঝায় সেই গিরিশচন্দ্র দে এবং নকুড়চন্দ্র নন্দীর আদি নিবাসও হুগলি জেলা।

দে এবং নন্দীমশাই জগদ্বিখ্যাত মিস্টার রোলস ও মিস্টার রয়েসের মতন কীভাবে হাত মেলালেন তা যাঁরা জানেন না, তাঁরা শুনুন, দেড়শো বছর আগে গিরিশচন্দ্র দে মশাই সিমলেতে সন্দেশের দোকান খুলে দেশ থেকে নকুড় নন্দীকে নিয়ে আসেন। সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যে যথাসময়ে নকুড়কে তিনি নিজের জামাই করেন। এর পর নকুড়চন্দ্র হন পার্টনার ও বিজনেস সহযোগী। দূরদর্শী গিরিশবাবু যে জামাতা নির্বাচনে ভুল করেননি তা এই প্রতিষ্ঠানের অবিশ্বাস্য সন্দেশসাফল্য থেকেই বোঝা যায়। নানা প্রলোভন সত্ত্বেও নকুড় আজও স্বধর্মচ্যুত হননি, এখনও সন্দেশ

ছাড়া আর কিছুই তাঁরা তৈরি করেন না। বিলেতে আমেরিকার সায়েবরাও ম্যানেজমেন্টের জগতে ইদানীং এই দর্শনের প্রচার করছেন—যে কাজটা ভালভাবে জানো তার ওপরে সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো। ম্যাকইনসে কোম্পানির বিশেষজ্ঞরা একেই বলেন 'কোর কমপেটেন্স'। একালের বোর্ড রুমে এখন পুরনো যুগের স্লোগান : স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়। দক্ষতাই হচ্ছে এ যুগের মানবধর্ম।

এতো জায়গা থাকতে এই হুগলি জেলা কেন বঙ্গীয় মিষ্টান্নের পীঠস্থান হয়ে উঠলো তা বুঝতে অনেক পথ পেরিয়ে আমাদের চন্দননগরের সূর্য মোদকের দোকানে উপস্থিত হতে হলো।

বর্তমানে সূর্য মোদকদের একাধিক দোকান। একটি আদি হলেও, আরেকটি অকৃত্রিম। কর্ণধারের বয়স আশির ওপর—বালক বয়স থেকে দোকানে কাজ করছেন। আমাদের সঙ্গে যখন দেখা হলো তখনও বিপুল উৎসাহ ও প্রাণশক্তি। তিনি বললেন, "হুগলিতে খুব ভাল আখ এবং চিনি তৈরি হতো। স্বভাবত মিষ্টান্ন শিল্পের যতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখানেই শুরু হয়েছে। সূর্য মোদকরাও আগে মিষ্টান্ন ব্যবসা শুরু করেননি, প্রথমে তাঁরা দোলো চিনি তৈরি করতেন। তার থেকে মিষ্টির লাইনে। রসিক মোদকমশাই আরও বললেন, "আমি অনেক দেখেছি। তখন রসগোল্লা ছিল চার আনা সের, এখন সত্তর টাকা। সন্দেশ আট আনা, এখন ১২০্।"

কিংবদন্তি অনুযায়ী চন্দননগরের সূর্যকুমার মোদকই জলভরা তালশাঁস সন্দেশের আবিষ্কারক। সুরসিকরা জানেন, কলকাতার জলভরা শুয়ে থাকে, আর সূর্য মোদকের জলভরা দাঁড়িয়ে থাকে। কলকাতায় তালশাঁসের ভিতর থাকে নলেন গুড়, আর চন্দননগরে গোলাপজল। ভীম নাগ পরিবারের সঙ্গে এই পরিবারের বিবাহসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। প্রবীণ মোদমশাই মিষ্টান্নে ধ্রুপদী ধারার পক্ষপাতী। আমাদের বললেন, "মিষ্টি কম হলেই সন্দেশ ভাল হয় এটা ভাববেন না। আর ভাল মিষ্টি সেখানেই সৃষ্টি হয় যেখানে ভাল শিল্পীর কাজের তারিফ করবার মতন কিছু ধনবান রসিকজন থাকেন।" মোদমশাই আর একটা গোপন খবর দিলেন, পৌষ মাস সন্দেশ খাবার শ্রেষ্ঠ

সময়, কারণ পৌষ মাসে সন্দেশের দাম সব থেকে কম থাকে।

মোদকমশাইয়ের দুঃখ, আজকাল বাংলার মা লক্ষ্মীরা হাতের গোড়ায় যা পান সব ঝপাং করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেন। ফ্রিজে ঢোকালে সন্দেশের স্বাদ বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। রসিকরা কিন্তু জানেন কোন সন্দেশের কতো পরমায়ু। মোদকমশাইয়ের আরও দুঃখ, বাঙালি মধ্যবিত্তরা বড্ড অনুকরণ করেন, হয় বড়লোকের, না হয় সায়েবের। আজকাল কেউ কেউ বিপুল উৎসাহে কেক-পেসট্রির দিকে ঝুঁকছেন। ব্যান্ডোদার সংযোজন : "হা ঈশ্বর, কোথায় ময়দার ঢিবি আর কোথায় সন্দেশ!"

মোদকমশাইয়ের দোকানে রসিয়ে রসিয়ে সন্দেশ আস্বাদন করে বহু দিনের অতৃপ্তি দূর হলো। পরবর্তী কোনও সময়ে সূর্য মোদকের পারিবারিক ও ব্যসায়িক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার বাসনা ছিল। প্রবীণ মোদকমশাই সানন্দে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ডাকযোগে একদিন তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেলাম। ভাল একটা বিষয়ে ভাল করে জানবার সুযোগ চিরদিনের জন্যে এই লেখকের হাতছাড়া হয়ে গেলো।

সন্দেশটা যে বাঙালির শ্রীহস্তস্পর্শে সূক্ষ্ম আর্টের চরম পর্যায়ে উঠে গিয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ব্যান্ডোদাও মনোযোগ সহকারে হুগলি জেলার জলভরার বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। আমিও এই অঞ্চল থেকে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মিষ্টান্ন সভ্যতার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তার জয়গানে মুখরিত হলাম। আমি বললাম, "আমার অবাঙালি বন্ধুরা বলেন, একমাত্র বাঙালির পক্ষেই এই সন্দেশ সৃষ্টি করা সম্ভব,—রবীন্দ্রনাথ, রসগোল্লা ও সন্দেশ এই তিনটিই হলো একালে বিশ্বের দরবারে বাঙালির বিনম্র উপহার।"

অধ্যাপক সর্বদমন রায়ের টান রসগোল্লার দিকে। সুযোগ বুঝে তিনি জানালেন, রসগোল্লার প্রতি দুর্বলতা না থাকলে ঠাকুর রামকৃষ্ণর সঙ্গে নরেন দত্তর দেখাই হতো না এবং সে ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের সৃষ্টিও সম্ভব হতো না।

নরেনের মেজোভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বয়ং নিবেদন করেছেন, নরেন্দ্রনাথের আত্মীয় রামচন্দ্র দত্ত ওরফে রামদাদা একদিন বললেন, "বিলে, তুই তো

এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াস, দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছেন, দেখতে যাবি?" নরেন্দ্রনাথ বললেন, "সেটা তো আকাট মুখখু...কী জেনেছে যে আমাকে শেখাতে পারে?" তারপর রসগোল্লার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি জানালেন, "যদি সে রসগোল্লা খাওয়াতে পারে তো ভাল, নইলে কান মলে দেবো।"

এরপর অধ্যাপক রায় রবীন্দ্রনাথের দিকে হাত বাড়ালেন। লিখিতভাবে তিনি স্বীকার করেছেন, বাংলায় রসস্রষ্টা বলতে দু'জন, দ্বারিক ময়রা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রসগোল্লার প্রতি অগাধ অনুরাগ না থাকলে একথা কবিগুরু কিছুতেই লিখতেন না।

রসগোল্লা যদি ছোটলাট হন, তা হলে সন্দেশ হচ্ছে বড়লাট। আমি যথাসময়ে সবিনয়ে নিবেদন করলাম, "ব্যাভোদা, রবীন্দ্রনাথ সন্দেশ সম্বন্ধেও চরম কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন, 'সন্দেশ বাংলাদেশে বাজিমাৎ করেছে ; যা ছিল শুধু খবর, বাংলাদেশ তাকেই সাকার করে বানিয়ে দিলো খাবার। সেখানকার সন্দেশও খবর-খাবারের অর্থাৎ সাকার-নিরাকারের শিব-শক্তি মিলন।'

খুব খুশি হচ্ছেন কলকাতায় সদ্য আগত ব্যাভোদা। বললেন, "এসব বুদ্ধি বাঙালির উর্বর মস্তিষ্কে আসে। একটি সন্দেশকেই দুটি বিশেষ অর্থে—সংবাদ এবং মিষ্টান্ন হিসাবে ব্যবহার করার পথ সমস্ত ইন্ডিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছে এই বাঙালিরা। আপনজনদের খবর নিতে হবে, অতএব সন্দেশ পাঠাও অথবা সন্দেশ হাতে করে যাও, কেল্লা ফতে হবে।"

অধ্যাপক রায় হঠাৎ বিগড়ে গেলেন। সন্দেশকে আক্রমণ করে তিনি বললেন, "একটা দুঃসংবাদ দিই, বহু যুগ ধরে সংস্কৃতে নতুন খেজুর গুড়কেও বলা হচ্ছে নববার্তা। সুতরাং খবর বা সংবাদের সঙ্গে সন্দেশের যোগাযোগটা একচেটিয়া নয়, অভিনবও নয়।"

ব্যাভোদা এবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার উইকেট বিপন্ন, খেজুর গুড়ের এই বিশেষ অর্থ আমার জানা ছিল না।

এবার ব্যাভোদার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ি চলেছে ব্যান্ডেলের পর্তুগিজ চার্চের দিকে। সন্দেশের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে কেন প্রভু যিশুর চার্চে যাওয়া

প্রয়োজন তা এখনও বুঝতে পারছি না। চার্চে কখনও প্রসাদ হিসাবে সন্দেশ বিতরণ হয়েছে বলে তো শুনিনি। মাছকে যেমন সাঁতার শেখাতে হয় না তেমন বঙ্গসন্তানকে কখনও সন্দেশ খাওয়া শিখতে হয় না। সায়েবের পোকে তিন সপ্তাহের ট্রেনিং ক্লাসে বসাতে হবে স্রেফ সন্দেশ যাতে ব্রহ্মতালুতে পৌঁছে না যায় তা নিশ্চিত করতে, সায়েবরা সন্দেশের মর্ম কী বুঝবে? শুনেছি, সায়েবদের গলায় সন্দেশ আটকে যায়, সাবধান না হলে সন্দেশপ্রেমী সায়েবের প্রাণসংশয় হতে পারে। বললাম, তার চেয়ে চলুন এখানকার কোনও মন্দিরে, কাছাকাছি সন্দেশ বিক্রি হয় না, এমন মন্দির এদেশে নেই।

অধ্যাপক রায় অভিযোগ করলেন, "এটা একটা পয়েন্ট। বড় বড় মন্দিরের কাছে পুজোর জন্যে সন্দেশ বলে যা বিক্রি হয় তা চিনির ডেলা, কেউ কেউ ভদ্রতা করে বলে চিনির সন্দেশ।"

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য চেষ্টায় আমি আশঙ্কা করলাম, "ভেজালের উপদ্রব বোধহয়। উপবাস করে যাঁরা পুজো দিতে আসেন তাঁরা তো আর সন্দেশে কতটা ছানা আছে তা চেখে দেখতে পারবেন না।"

ব্যান্ডোদা জিজ্ঞেস করলেন, "কলকাতায় কে যেন বললো, উনিশ শতকেও বাংলার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণরা নেমন্তন্ন বাড়িতে ছানার সন্দেশ মুখে দিতেন না, তাঁদের জন্যে স্পেশালি বানানো হতো এই ছানাহীন চিনির সন্দেশ!"

অধ্যাপক রায় লাফিয়ে উঠলেন, "ঠিকই শুনেছেন, শত শত বছর ধরে, এই চিনির ডেলাকেই বাঙালি সন্দেশ বলে সহ্য করেছে। আরও বড় ব্যাপার আছে, চলুন ব্যান্ডেল চার্চে, রহস্যটা হয়তো আজই ফাঁস হয়ে যাবে।"

ব্যান্ডেল চার্চের মাথায় লেখা আছে ১৫৯৯—বাংলার সবচেয়ে পুরনো গির্জা। এই চার্চের প্রবীণ প্রায়র ফাদার লুই গবেটি ১৯৩৪ সাল থেকে ভারতবর্ষে বসবাস করছেন। চার্চ দেখতে এসেছি শুনে আনন্দিত হয়ে ফাদার বললেন, পর্তুগিজরা সপ্তগ্রামে এসেছেন ১৫৩৭ সালে। ফাদার নিজে অবশ্য ইতালির লোক।

ব্যান্ডোদা এবার জিজ্ঞেস করলেন, "ফাদার, আপনাদের রাঁধুনিরা কি

একসময় ইউরোপ থেকে আসতো?” ফাদার হাসলেন, “এমন বড়লোক তো আমরা কোনও দিন ছিলাম না। আমাদের এখানে রান্নাবান্না করেন স্থানীয় রাঁধুনিরা—আমাদের জীবনযাত্রা অতি সাধারণ মানের, আপনি এখানে থেকে নিজের চোখে দেখে যেতে পারেন।”

ব্যান্ডোদা অস্থির হয়ে উঠছেন, তিনি যা খুঁজছেন তা যেন পাচ্ছেন না। এবার তিনি সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আর কোনও গির্জা এখানে ছিল? ফাদার আবার হাসলেন। “এই হুগলিতে ইউরোপের কোন জাত না এসেছেন, মিস্টার ব্যান্ডো? খুব কাছেই ছিলেন ওলন্দাজরা। ওঁদের আর্থিক অবস্থা যে খুবই ভাল ছিল তা চুঁচুড়াতে গেলেই বুঝতে পারবেন। ওঁখানে ওদের গির্জাও ছিল।”

এই খবর পাওয়ামাত্রই ব্যান্ডোদা তাঁর দল নিয়ে ছুটলেন চুঁচুড়ার দিকে। গির্জা একটা খুঁজে পাওয়া গেলো, কিন্তু ব্যান্ডোদা জানতে চাইছেন, এই সব গির্জায় ওলন্দাজ কুকরা আগে কাজ করতেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তর এতো দিন পরে কে দেবে? আমরা কয়েকজন প্রবীণ নাগরিকের সঙ্গে কথা বললাম। তাঁদের ভাসা ভাসা ধারণা বিশ্বসভায় যা নিয়ে বাঙালির এত গর্ব সেই সন্দেশ এই অঞ্চলেই একদিন আবিষ্কৃত হয়েছিল।

ব্যান্ডোদার মুখে হাসি ফুটে উঠছে। হাতব্যাগ থেকে একটা বই বার করলেন। “এ কী! এটা তো স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী। এর সঙ্গে সন্দেশ রসগোল্লার কী সম্পর্ক?”

ব্যান্ডোদা বললেন, “তোদের শুনলে মনোকষ্ট হবে, কিন্তু এখানে কথাবার্তা বলে আমার সন্দেহ থাকছে না, এই সন্দেশ হয়তো বাঙালির নিজস্ব আবিষ্কার নয়, বড়জোর বলতে পারা যায় ওলন্দাজ ও বাঙালির যৌথ প্রচেষ্টার ফল।”

“অসম্ভব, ব্যান্ডোদা! বাঙালির বুক থেকে সন্দেশ আবিষ্কারের গৌরব কেড়ে নেওয়ার এমন নিষ্ঠুর চেষ্টা করবেন না। এর ফল কিছুতেই ভাল হতে পারে না।”

এবার একগাল হাসলেন ব্যান্ডোদা। পশ্চিমের সংস্পর্শে না এলে যেমন আমাদের রেনেশাঁস সম্ভব হতো না, তেমন এই ছানার তৈরি সন্দেশও সম্ভব

হতো না, আমাদেরও চিনির ডেলার সন্দেশ খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হতো।

অধ্যাপক রায় এই আকস্মিক বিস্ফোরণের জন্যে তৈরি ছিলেন না। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, "দুধকে ছিন্ন করা হয় বলে ছিন্ন, তার থেকে ছেনা। ওড়িশায় এখনও ছেনা বলে। তার থেকেই বাংলার ছানা। সেই ছানা থেকে সন্দেশ। তবে হিন্দুভারত কোনও দিন এই ভগবতীর দুধ ছিন্ন করাকে ভাল চোখে দেখেনি, তাই উত্তর ভারতে সন্দেশের স্বীকৃতি পেতে অনেক দেরি হয়েছে, সমস্ত উত্তর ভারত ক্ষীরেই মজে থেকেছে।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "স্বামীজির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর ভূপেন দত্তমশাই দেশবিদেশ ঘুরেছিলেন। তিনি ঠিকই বলেছেন, তোমরা যাকে ছেনা বলছ তা অন্য নামে ইউরোপে অনেক দিন থেকে পরিচিত। ভূপেনবাবু বলছেন, ছানা আর জার্মান পট-চিজ একই জিনিস। ব্যান্ডেলে ডাচ কারিগরেরা বাঙালি কারিগরদের জার্মান ছানা প্রস্তুত করতে শিখিয়েছিল।"

আমরা এবার গম্ভীর হয়ে উঠছি। ব্যান্ডোদা বললেন, "তা হলে বুঝছিস সন্দেশের আবিষ্কারের পিছনে কারা রয়েছে এবং কেন এই হুগলি জেলা প্রায় সমস্ত স্মরণীয় মিষ্টান্নশিল্পীর আদি দেশ?"

ব্যান্ডোদা বই থেকে আরও পড়লেন, "শোন, ছানা অখাদ্য ছিল, মনুর বিধান অনুসারে ফাটা দুধের সামগ্রী গ্রহণীয় নয়। ভূপেন দত্ত লিখছেন, ব্রাহ্মণকে মিষ্টি দেওয়া মানেই কতকগুলি চিনির ডেলার সন্দেশ। পরমহংসদেবের পরমপ্রিয় রাখালরাজ ঘোষের (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বিবাহকালে কোন্নগরে ব্রাহ্মণরা চণ্ডীমণ্ডপে বসে চিনির ডেলার সন্দেশ খেয়েছিলেন ; আর কলকাতার বাবুরা হাল ফ্যাশনের মিষ্টান্ন খেয়েছিলেন।"

এবার কলকাতায় ফেরার পালা। প্রশান্ত নন্দী মহাশয়ের সহৃদয়তায় নকুড়ের দোকানে সর্বোত্তম সন্দেশের গোপন রহস্যভেদ করতে আগ্রহী আমরা তিনজনেই। কিন্তু আমার মন ভেঙে গিয়েছে, অন্য অনেক কিছুর মতন সন্দেশ আবিষ্কারের গৌরব বাঙালির হাতছাড়া হবে নাকি?

ব্যান্ডোদা বললেন, "ঝিমিয়ে পড়িস না। আসলে সন্দেশের পিছনে জার্মান এবং ওলন্দাজদের কতটা অবদান রয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখার জন্যে বিশেষ গবেষণার এবং বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। ফরাসিরা

হলে এতক্ষণে জাতীয় কমিশন বসিয়ে দিতো। কেউ একবার ফরাসি রুটির উৎস সম্বন্ধে আঁকাবাঁকা কিছু বলে দেখুক না।”

আমি বললাম, “কলকাতায় এখনও কয়েকজন মিষ্টান্নরসিক আছেন, তাঁরা সন্দেশের হাড়হদ্দ জানেন। কল্যাণ ভদ্র মশায়ের পরামর্শ জরুরি হয়ে উঠছে। ভীম নাগের দোকানে সন্দেশ খেয়ে এক রসিক তো বলে দিয়েছিলেন, সন্দেশের পাক হয়েছিল তেঁতুল কাঠের জ্বালে এবং কারিগর এটি তৈরি করার সময় কারখানায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। আর একজন রসিক বিশেষ এক ধরনের সন্দেশ খেয়ে বলে দিতেন, শিয়ালদহ্ সেকশনে হাবড়া স্টেশনে ইস্টার্ন রেলের ছানা স্পেশাল কত ঘণ্টা লেট করেছে? কিন্তু ইতিহাসের অজানা সাগরে ডুবসাঁতার দেওয়ার কোনও প্রবণতা তখনও দেখা যায়নি।”

ব্যান্ডোদা আমাকে শান্ত করলেন, “চিন্তা করিস না। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিকে কোনও অনাবাসী মিলিয়ন ডলার দান করুক এবং ওই টাকায় ঐতিহাসিকরা খোঁজখবর নিয়ে ঠিক করে দিন কবে কখন কীভাবে কোন্ মিষ্টি কোথায় কে আবিষ্কার করেছিলেন।”

অধ্যাপক রায় ঐতিহাসিকদের অতো পছন্দ করেন না। জিজ্ঞেস করলেন, “যদি না করি এই সব গবেষণা?”

“খুব খারাপ ফল হতে পারে,” সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন ব্যান্ডোদা, “কোন দিন দেখবে জার্মানরা কিংবা ডাচরা বেলজিয়াম থেকে ঘোষণা করলো, সন্দেশটা পশ্চিমী সভ্যতার অবদান। এবং ইউরোপীয়দের আবিষ্কার। ও সব জাত ভীষণ পয়সা চেনে, আচমকা পেটেন্ট করিয়ে প্রত্যেক সন্দেশের জন্যে নর্থ ক্যালকাটার দোকান থেকে যখন এক টাকা রয়ালটি দাবি করে বসবে তখন বাঙালিরা বুঝবে মজাটা।”

আমরা মিটমিট করে হাসছি। ব্যান্ডোদা বললেন, “হেসো না, বিশ্বায়নের যুগে এখন কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।”

নোনতার উৎস সন্ধানে

বিশ্বের দরবারে ছানার সন্দেশ যে বাঙালির একান্ত নিজস্ব অবদান নয় এ নিয়ে বাংলার বিদ্বৎসমাজে ইদানীং গভীর সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন আমাদের প্রিয় ব্যান্ডোদা।

হলিউড বেভারলি হিল্‌সনিবাসী অনাবাসী ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ ব্যান্ডোদা গতবার আমাকে সঙ্গে নিয়েই হানা দিয়েছিলেন মিষ্টান্নের মহাতীর্থ হুগলি জেলায়। জোর অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন একদা ওলন্দাজ ও ডাচ অধ্যুষিত ব্যান্ডেল ও হুগলিতে। ব্যান্ডোদার সেই ত্রিমুখী অনুসন্ধান থেকে যা পাওয়া গিয়েছিল তার উপর নির্ভর করে আমি আগেকার নিবন্ধ রচনা করেছিলাম। মেঠাই রহস্য নামক এই প্রবন্ধের শেষ ইঙ্গিত বাঙালির ছানা আসলে ডাচদের এবং জার্মানদের পট-চিজ এবং শর্করামিশ্রিত ছানাকে সন্দেশের মহত্ত্ব দেওয়ার নীরব সাধনা শুরু হয়েছিল ব্যান্ডেলে স্থানীয় চার্চের শেফদের হাতে। এই নতুন আবিষ্কারকে বাঙালিরা গ্রহণ করেছিল বিপুল উৎসাহে।

স্বয়ং ব্যান্ডোদা কিন্তু আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন, রক্ষণশীল বাঙালি চিরকালই পরিবর্তন এবং নূতনত্বকে প্রবল সন্দেহর চোখে দেখেছে। এই বাঙালিই কলের জলকে ট্যাপের জল নাম দিয়ে কয়েক যুগ ধরে ভিস্তিকে বাড়িতে ডেকেছে জাতরক্ষার জন্য। এই বাঙালিই সাদা চিনি স্পর্শ করেনি জাত যাবার ভয়ে এবং এই বাঙালিই হুগলি জেলার নবাবিষ্কৃত ছানার সন্দেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়েবাড়ির পাত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এই অপবাদ দিয়ে যে দুধকে ছিন্ন করে ছানায় রূপান্তরিত করলে মা ভগবতীর প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। ফলে নিষ্ঠাবান বাঙালি, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও বিধবা, মন্দিরে মন্দিরে তথাকথিত কাশীর চিনির ডেলাকে সাবেকী সন্দেশ বলে আদর করে পূজায় নৈবেদ্য দিয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি ব্রাহ্মণ অধঃপতিত হবার আশঙ্কায় এই চিনির ডেলা নানা আনন্দানুষ্ঠানে গলাধঃকরণ করেছে স্বর্গীয় সন্দেশকে অপমান করে।

সেবারের সুইটমিট মিশনে বেরিয়ে ব্যান্ডোদা বুঝেছিলেন, বাংলার খাবারদাবার নিয়ে তেমন কোনও সিরিয়াস বৈজ্ঞানিক অথবা ঐতিহাসিক অনুসন্ধান হয়নি—ফলে আমরা ঠিক জানি না কে কবে রসগোল্লা আবিষ্কার করেছিলেন, আদিতে তার নাম কি ছিল—শুদ্ধ রসগোল্লা না গোপালগোল্লা? লেডিকেনির জন্মস্থান হাওড়ায়? না কলকাতায়? না মুর্শিদাবাদে? ল্যাংচার উৎপত্তি শক্তিগড় না অন্য কোথাও?

আসলে বাঙালিরা ইতিহাসবিস্মৃত জাতি, কে কী উদ্ভাবন করছে তা নিয়ে কারও ব্যক্তিগত অথবা দলগত মাথাব্যথা নেই, তারপর কেউ যদি কোনওভাবে কোনও ব্যাপারে অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করলেন তখন সেই কৃতিত্বে ভাগ বসাবার জন্য এখানে-ওখানে ডজন ডজন দাবিদার গজিয়ে ওঠেন।

মিষ্টান্নের আলোআঁধারি সরিয়ে প্রকৃত ঐতিহাসিক গবেষণা সোজা কাজ নয়। স্বয়ং ব্যান্ডোদা বিদেশের বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝেন। সেবার ব্যান্ডেল থেকে ফেরার পথে চন্দননগরে সূর্য মোদকের দোকানে কড়াপাক তালশাঁস সন্দেশ চিবোতে-চিবোতে ব্যান্ডোদা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এই গবেষণার জন্য ফোর্ড, রকফেলার অথবা গুগেনহাইম

ফাউন্ডেশনের কয়েক মিলিয়ন ডলার অনুদান সংগ্রহ করা এমন কিছু অসম্ভব কাজ নয়।

ব্যান্ডোদা যে সেই চেষ্টা চালিয়ে যাবেন সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। ব্যান্ডোদা বলেছিলেন, "তোকে এবং অধ্যাপক রায়কে এই কাজে সহযোগিতা করতে হবে। অ্যাজ এ আষাঢ়ে গপ্পোলেখক তুই সমস্ত গল্পগুজব বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করবি এবং অধ্যাপক রায় পুরনো সংস্কৃত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে নেবেন।" সংস্কৃতে যে এতো খাদ্যরস অথবা রসনারস এখনও উপস্থিত রয়েছে তা সর্বদমন রায়ের সঙ্গে কথা বলার আগে অনুসন্ধানী ব্যান্ডোদা জানতেন না।

স্থানীয় মিষ্টান্ন গবেষণা জমিয়ে শুরু হলে স্বয়ং ব্যান্ডোদাও এতে আন্তর্জাতিক মদত দেবেন। কারণ ব্যান্ডোদা নিশ্চিত, এখন থেকে প্রচণ্ড সাবধানী না হলে মিষ্টান্ন সংক্রান্ত সমস্ত ভারতীয় এবং বঙ্গীয় মগজসম্পদ হঠাৎ বিদেশিদের মুঠোর মধ্যে চলে যাবে এবং একদিন হয়তো সন্দেশ, রসগোল্লা লেডিকেনি তৈরির জন্যেও সায়েবরা তাঁদের পেটেন্ট দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকেই রয়ালটি দাবি করে বসবেন। উল্টো দিকে, হাজার রকম রফতানির ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে সারা জাতটাকে ব্যতিব্যস্ত না করে কোনওক্রমে আমাদের কলকাতাকে পৃথিবীর মিষ্টান্ন রাজধানীতে রূপান্তরিত করতে পারলে ভীম নাগ, নকুড় নন্দী, সেন মহাশয়, বলরাম মল্লিক, গাঙ্গুরাম চৌরাশিয়ার উত্তরপুরুষরা মাইক্রোসফ্‌ট্ কোম্পানির মালিক শ্রীমান বিল গেটসের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতন ধনাঢ্য হয়ে উঠবেন।

অধ্যাপক রায় সেবার ফোড়ন কেটেছিলেন, "পাঁচ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার অধীশ্বর না হলে সেকালে শ্রেষ্ঠী নামকরণ হতো না। আর আঢ্য হতে হলে চাই অন্তত দশ লাখ স্বর্ণমুদ্রা। ধনাঢ্য থেকে আঢ্য, এটা সবসময় মনে রাখবেন।"

ব্যান্ডোদা সেবার আমাকে চন্দননগরের একটি রসকদম্বের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে বলেছিলেন, যতো লোক আছে পৃথিবীতে, তারা মিষ্টান্নপ্রেমী হয়ে উঠলে প্রতিমাসে কয়েক মিলিয়ন ডলার কলকাতার ময়রাদের ট্যাঁকে উঠবে। তখন চীন জাপান ইউ এস এ সবাই টুপি খুলে মাথা নত করবে এই

মোদকসমাজের কাছে যাদের আমরা ময়রা বলে এতো দিন অবহেলা করে এসেছি।”

অধ্যাপক রায় মৃদু আপত্তি জানালেন। “প্রাচীন ভারতে এবং আধুনিক বাংলায় ময়রা সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি ছিল প্রবল। এঁরা স্পর্শদোষমুক্ত। দু’ শ্রেণীর ময়রা দেখতে পাবেন—মোদক ময়রা এবং গয়লা ময়রা। তাঁরা সাধারণত ঘোষ হন। দুধ চাই দই চাই বলে এঁরা চিৎকার করতেন বলে ঘোষক এবং তার থেকেই ঘোষ শব্দের উৎপত্তি।”

যাই হোক মিষ্টান্নরহস্য উন্মোচনে আমাকে এঁদের সঙ্গে অনেক যোগাযোগ রাখতে হবে। জানতে হবে অনেক খবরাখবর।

মেঠাই রহস্যের কিছুটা প্রকাশিত হওয়ার পরে ব্যান্ডোদা কিছুদিনের জন্যে উধাও। অনাবাসীদের এই স্বভাব, সারাক্ষণ ছটফট করছেন, কখন যে কোথায় থাকছেন অথবা চলমান হচ্ছেন তার হিসেব রাখা আমাদের পক্ষে বেশ কঠিন ব্যাপার।

ব্যান্ডোদা নিজেই বলে থাকেন, তাঁর ঠিকানা কেয়ার অব ফরেন এয়ারলাইনস। পিংপং বলের মেজাজে দুনিয়ার হাটে ছোটাছুটি না করলে মা লক্ষ্মীর মানভঞ্জন হবে কী করে?

একবার উধাও হলে ব্যান্ডোদাকে খুঁজে পাওয়া আমার সাধ্যে নেই। এটি পারেন একমাত্র তাঁর বর্ধমান নিবাসিনী বিধবা মা। কোনও এক বিদেশি যোগাযোগ এজেন্সি নাকি প্রত্যহ লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ফোন করে মায়ের খবরাখবর নিয়ে ব্যান্ডোদাকে জানান, যাতে প্রয়োজনে টুক করে ব্যান্ডোদা টেলিযোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন, অতএব কলকাতায় হাজির হতে পারেন।

এহেন ব্যান্ডোদা দু’দিন আগে রাতদুপুরে অকস্মাৎ এই অধমকে ফোন করলেন।

“হ্যালো ব্যান্ডোদা, লং টাইম নো সি, নো হিয়ার! কোথা থেকে কথা বলছেন?”

ব্যান্ডোদা ঝেড়ে কাশলেন না, শুধু আমাকে রেডি থাকতে নির্দেশ

দিলেন।

"ওই প্রফেসরকে খবর দিয়ে রাখিস।" এই বলে আবার পৃথিবীর বৃহৎ জনারণ্যে হারিয়ে গেল আমাদের ব্যান্ডোদার কণ্ঠস্বর।

নিরুপায় আমি ঝালিয়ে নিতে লাগলাম আমার মিষ্টান্ন সম্পর্কিত জ্ঞান। অনেক কষ্টে খবর পেয়েছি, এই যে গৌড় দেশ তার আদিতেও রয়েছে গুড়—ভাল গুড় হতো বলেই গৌড়, সাধে কি আর মিষ্টান্নশিল্পের এমন সমৃদ্ধি হয়েছে এই সোনার বাংলায়।

"শুধু গৌড় নয়," অধ্যাপক রায় আশ্বাস দিলেন, "নির্ভাবনায় এই গুড়ের ইতিহাসে আরও পনেরো হাজার বছর যোগ করে দিন। সাধ্য থাকে তো সায়েবরা চ্যালেঞ্জ করুক। স্রেফ মনে রাখবেন, প্রাচীন ভারতে গুড়ের আরেক নাম ছিল খণ্ড। কোন সাহসে এ দেশে সুইস সায়েবগুলো পাটালি সাইজের টফি বিক্রি করতে আসে?"

ব্যান্ডোদা স্বদেশে ফিরলেন, কিন্তু একী হাল তাঁর? রস ও রসনা সম্পর্কে ব্যান্ডোদা একেবারে ইউটার্ন নিয়ে নিয়েছেন।

"ব্যান্ডোদা! এসব কী কথা শোনাচ্ছেন আপনি? কলকাতা শহরে যে কোনও ট্রাফিক সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করবেন, ইউটার্ন নেওয়া বারণ। আপনি মিষ্টান্ন সম্পর্কে এবার কোনও রকম উৎসাহ দেখাচ্ছেন না।"

কোনও রহস্যময় কারণে ব্যান্ডোদা যেন তাঁর আজন্মলালিত মিষ্টান্নপ্রীতি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছেন। যে লোক ভারতীয় মিষ্টান্নের গভীরে প্রবেশ করবার জন্যে স্বোপার্জিত সঞ্চয় থেকে হাজার-হাজার ডলার খরচ করবার পরিকল্পনা করছিলেন, তিনিই আবার বিড়বিড় করছেন, নোনতা অথবা মিঠাই? মিঠাই অথবা নোনতা?

অধ্যাপক রায়ের চাপা মিষ্টান্নপ্রীতির সংবাদ আমাদের অজানা নয়। তিনিও সোচ্চার হলেন : "মিষ্টার ব্যান্ডো, রসের ইতিহাসে মধুর রসই শ্রেষ্ঠ রস, একথা কোনও ঋষি আজ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করেননি।"

ব্যান্ডোদার উত্তর : "বলছেন বটে, কিন্তু কোথাও যেন পুরো ব্যাপারটা উল্টেপাল্টে গিয়েছে। ওই যে কী আমাদের মন্ত্র—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। চিরকাল সরল মনে এসব মন্ত্র আওড়ে গিয়েছি, কিন্তু

মোদকসমাজের কাছে যাদের আমরা ময়রা বলে এতো দিন অবহেলা করে এসেছি।”

অধ্যাপক রায় মৃদু আপত্তি জানালেন। “প্রাচীন ভারতে এবং আধুনিক বাংলায় ময়রা সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি ছিল প্রবল। এঁরা স্পর্শদোষমুক্ত। দু’ শ্রেণীর ময়রা দেখতে পাবেন—মোদক ময়রা এবং গয়লা ময়রা। তাঁরা সাধারণত ঘোষ হন। দুধ চাই দই চাই বলে এঁরা চিৎকার করতেন বলে ঘোষক এবং তার থেকেই ঘোষ শব্দের উৎপত্তি।”

যাই হোক মিষ্টান্নরহস্য উন্মোচনে আমাকে এঁদের সঙ্গে অনেক যোগাযোগ রাখতে হবে। জানতে হবে অনেক খবরাখবর।

মেঠাই রহস্যের কিছুটা প্রকাশিত হওয়ার পরে ব্যান্ডোদা কিছুদিনের জন্যে উধাও। অনাবাসীদের এই স্বভাব, সারাক্ষণ ছটফট করছেন, কখন যে কোথায় থাকছেন অথবা চলমান হচ্ছেন তার হিসেব রাখা আমাদের পক্ষে বেশ কঠিন ব্যাপার।

ব্যান্ডোদা নিজেই বলে থাকেন, তাঁর ঠিকানা কেয়ার অব ফরেন এয়ারলাইনস। পিংপং বলের মেজাজে দুনিয়ার হাটে ছোটাছুটি না করলে মা লক্ষ্মীর মানভঞ্জন হবে কী করে?

একবার উধাও হলে ব্যান্ডোদাকে খুঁজে পাওয়া আমার সাধ্যে নেই। এটি পারেন একমাত্র তাঁর বর্ধমান নিবাসিনী বিধবা মা। কোনও এক বিদেশি যোগাযোগ এজেন্সি নাকি প্রত্যহ লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ফোন করে মায়ের খবরাখবর নিয়ে ব্যান্ডোদাকে জানান, যাতে প্রয়োজনে টুক করে ব্যান্ডোদা টেলিযোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন, অতএব কলকাতায় হাজির হতে পারেন।

এহেন ব্যান্ডোদা দু’দিন আগে রাতদুপুরে অকস্মাৎ এই অধমকে ফোন করলেন।

“হ্যালো ব্যান্ডোদা, লং টাইম নো সি, নো হিয়ার! কোথা থেকে কথা বলছেন?”

ব্যান্ডোদা ঝেড়ে কাশলেন না, শুধু আমাকে রেডি থাকতে নির্দেশ

দিলেন।

"ওই প্রফেসরকে খবর দিয়ে রাখিস।" এই বলে আবার পৃথিবীর বৃহৎ জনারণ্যে হারিয়ে গেল আমাদের ব্যান্ডোদার কণ্ঠস্বর।

নিরুপায় আমি ঝালিয়ে নিতে লাগলাম আমার মিষ্টান্ন সম্পর্কিত জ্ঞান। অনেক কষ্টে খবর পেয়েছি, এই যে গৌড় দেশ তার আদিতেও রয়েছে গুড়—ভাল গুড় হতো বলেই গৌড়, সাধে কি আর মিষ্টান্নশিল্পের এমন সমৃদ্ধি হয়েছে এই সোনার বাংলায়।

"শুধু গৌড় নয়," অধ্যাপক রায় আশ্বাস দিলেন, "নির্ভাবনায় এই গুড়ের ইতিহাসে আরও পনেরো হাজার বছর যোগ করে দিন। সাধ্য থাকে তো সায়েবরা চ্যালেঞ্জ করুক। স্রেফ মনে রাখবেন, প্রাচীন ভারতে গুড়ের আরেক নাম ছিল খণ্ড। কোন সাহসে এ দেশে সুইস সায়েবগুলো পাটালি সাইজের টফি বিক্রি করতে আসে?"

ব্যান্ডোদা স্বদেশে ফিরলেন, কিন্তু একী হাল তাঁর? রস ও রসনা সম্পর্কে ব্যান্ডোদা একেবারে ইউটার্ন নিয়ে নিয়েছেন।

"ব্যান্ডোদা! এসব কী কথা শোনাচ্ছেন আপনি? কলকাতা শহরে যে কোনও ট্রাফিক সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করবেন, ইউটার্ন নেওয়া বারণ। আপনি মিষ্টান্ন সম্পর্কে এবার কোনও রকম উৎসাহ দেখাচ্ছেন না।"

কোনও রহস্যময় কারণে ব্যান্ডোদা যেন তাঁর আজন্মলালিত মিষ্টান্নপ্রীতি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছেন। যে লোক ভারতীয় মিষ্টান্নের গভীরে প্রবেশ করবার জন্যে স্বোপার্জিত সঞ্চয় থেকে হাজার-হাজার ডলার খরচ করবার পরিকল্পনা করছিলেন, তিনিই আবার বিড়বিড় করছেন, নোনতা অথবা মিঠাই? মিঠাই অথবা নোনতা?

অধ্যাপক রায়ের চাপা মিষ্টান্নপ্রীতির সংবাদ আমাদের অজানা নয়। তিনিও সোচ্চার হলেন: "মিষ্টার ব্যান্ডো, রসের ইতিহাসে মধুর রসই শ্রেষ্ঠ রস, একথা কোনও ঋষি আজ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করেননি।"

ব্যান্ডোদার উত্তর: "বলছেন বটে, কিন্তু কোথাও যেন পুরো ব্যাপারটা উল্টেপাল্টে গিয়েছে। ওই যে কী আমাদের মন্ত্র—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। চিরকাল সরল মনে এসব মন্ত্র আওড়ে গিয়েছি, কিন্তু

এবার বেভারলি হিল্‌সে এক ডঃ চোপরা রসিকতা করলেন, সমুদ্র কবে মধু বিতরণ করেছে? সমুদ্র থেকে মানুষ চিরকাল যা পেয়েছে তার নাম নুন—নিমকক্ষরন্তি সিন্ধবঃ কথাটা কেউ ভাল বুঝে মধু করে দিয়েছে।"

এর উত্তর সঙ্গে সঙ্গে কী দেওয়া যেতে পারে? উদ্বিগ্ন সর্বদমন রায় বললেন, "এশিয়াটিক সোসাইটিতে যেসব প্রাচীন পুঁথিপত্র রয়েছে তা ভালভাবে ঘেঁটে দেখতে হবে। প্রয়োজনে যেতে হবে নবদ্বীপ এবং নৈহাটিতে।"

সবিনয়ে ব্যান্ডোদা মুখ খুললেন : "আর একটি প্রশ্ন : নোনতা আগে না মিঠাই আগে? মানুষ কোন রসের স্বাদ আগে পেয়েছিল?"

সর্বদমন উত্তর দিলেন, "শিকারি হবার আগে আদিম মানুষ গাছের মিষ্টি ফল এবং বনের মধুর স্বাদ পেয়েছে এইটাই সহজে আন্দাজ করা যায়।"

ব্যান্ডোদা জানালেন, "প্রফেসর রায়, সায়েবদের বিশ্বাস সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী মানুষ প্রথমে লোনাজলের স্বাদ পেয়েছে। তা ছাড়া রয়েছে পাথুরে নুন—যাকে আমরা সৈন্ধব লবণ বলি। একসময় এদেশের বিধবারা এই নুন ছাড়া অন্য নুন মুখে দিতেন না, এই পাথর চেটে নুনের স্বাদ পেয়েছে মানুষ—বিশেষ একটা স্বাদ মানুষের মধ্যে জেঁকে বসেছে। যে জন্যে আজকাল সায়েবডাক্তাররা অনেক সময় পরামর্শ দিচ্ছেন, শিশুদের জিভে নুনের অভ্যেস করিয়ে দিও না, তা হলে ভবিষ্যতে ওদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, এই আলুনি ব্যাপারটা নিয়ে মানুষ হইচই করবে না।"

"দোহাই ব্যান্ডোদা, লবণ নিয়ে এতো মাতামাতি করবেন না—শ্রীম লিখিত পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রথম সঙ্ঘগুরু, বিবেকানন্দর গুরুভাই রাখাল মহারাজ মন্তব্য করলেন : নুন ছাড়া ডিম—অ্যান এগ্‌ উইদাউট সল্ট। এটা নিন্দা, না প্রশংসা বোঝা দায়! কোথাকার এক রাজকুমারী তার বাবাকে নুনের মতন ভালবাসে বলে, নির্বাসিতা হয়েছিলেন।"

ব্যান্ডোদা সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর ধারণা হয়েছে, লবণের বিরুদ্ধে এক প্রভাবশালী লবি প্রাচীনকাল থেকেই সক্রিয় রয়েছে এবং এঁরাই দুড়ুম করে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ইত্যাদি লিখতে লজ্জা পাননি।

ব্যান্ডোদা জানালেন, "ফার্সিতে নেমকহারাম কথাটা আজকের নয় হে! পৃথিবীতে আর যাই হোক কোনওদিন বোধ হয় নুনের অভাব হবে না। এক সায়েব সম্প্রতি বহু অঙ্ক কষে প্রমাণ করেছে, সমুদ্রের সব জল শুকিয়ে ফেললে পৃথিবীতে যত নুন পাওয়া যাবে তা ছড়িয়ে রাখতে হলে গোটা কুড়ি ইউরোপ লেগে যাবে—৪৫ লক্ষ কিউবিক মাইল, বুঝেছিস মুখুজ্যে।"

"এতো নুন নিয়ে মানুষ কী করবে, ব্যান্ডোদা? টাটা সল্ট কোম্পানি তো বিপদে পড়ে যাবে!" আমার চিন্তা বাড়ছে।

"ভগবান দিয়েছেন, নিশ্চয় কোনও কাজে লেগে যাবে, তোর আমার চিন্তা কি?"

"আপনি বলতে চান, একদিন এই পৃথিবী মধুহীন হলেও, কখনও আলুনো হবে না?"

ব্যান্ডোদা হাসলেন, "সব বুঝেশুনেই রোমানরা তাদের সৈন্যবাহিনীতে লবণ ভাতা অর্থাৎ সল্ট অ্যালাউন্স চালু করেন। কই চিনি অ্যালাউন্স তো তাঁরা দেননি? মনে রাখতে হবে, রোমান 'স্যালারিয়াম' শব্দটাই ইংরিজিতে স্যালারি হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

চিন্তিত হয়ে উঠলেন অধ্যাপক রায়। "তার মানে মাসিক বেতন হিসেবে যা আমরা পেয়ে থাকি তা নুনের খরচ। দেখি এদেশের সংস্কৃত অভিধানটা, স্যালারিয়াম শব্দটা প্রাচীন ভারতেও চালু ছিল কি না।"

শ্রদ্ধেয় ব্যান্ডোদার অপারেশন নোনতা এইভাবেই শুরু হয়ে গেলো। তিনি সোৎসাহে বললেন, "এদেশের গ্রামেগঞ্জে আমাদের অনেক ঘুরে বেড়াতে হবে নোনতা খাবারের উৎস সন্ধানে।"

সেরা নোনতা এখনও এই হাওড়া কলকাতায় পাওয়া যায়, যদিও প্রচারের অভাবে সন্দেশ রসগোল্লাই কলকাতার খ্যাতিকে ঘিরে রেখেছে।

"আমাদের এই সুচিন্তিত গবেষণা যখন সবিস্তারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে তখন নোনতার অনেক বদনাম ঘুচে যাবে, ব্যান্ডোদা।"

"তোর কি রিপোর্ট?" আমাকে প্রশ্ন করলেন চিন্তিত ব্যান্ডোদা।

“মধুর রসের সন্ধানে জীবনের শেষ কটা দিন নানাধরনের মিষ্টি চেখেই চালিয়ে দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু ব্যান্ডোদা, এখন দেখছি, মিষ্টি যদি তিল হয়, নোনতা তা হলে তাল ; মিষ্টি যদি জলাশয় হয় তা হলে নোনতা মহাসমুদ্র। কলকাতার লোকরাও একশোটা নোনতা খেলে একখানা মিষ্টি মুখে দেয়।”

“সেটা বোধহয় মিষ্টির বেআক্কেলে দামের জন্যে।” প্রতিবাদ জানাতে গেলেন অধ্যাপক সর্বদমন রায়।

“আমাদের নানকু সাউ মোটেই একমত নন। আমাদের অঞ্চলে নোনতা সম্রাট এই নানকুজি। তিনি বলেন, পয়সার হিসেব করে কলকাতার দিলদরিয়া লোকরা জলখাবার কিনতে আসে না। নোনতা ভাল লাগে তাই অন্য সব রস ফেলে দিয়ে এই নোনতাভক্ষণ। নোনতা হচ্ছে মানুষের নিজস্ব রুচি, আর মেঠাইটা হচ্ছে সামাজিকতা—যার ফলে বড়বড় জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মেঠাইওয়ালা কোথাও ফেঁপে-ফুলে উঠতে পারেনি। আসলে, সন্দেশ রসগোল্লা যদি হয় ধনতন্ত্র, তা হলে নোনতা হচ্ছে গণতন্ত্র—সবার সমান অধিকার ভোট দেবার।”

“এদেশের সর্বহারা এখনও মনের সাধ মিটিয়ে নোনতা খেতে পায় না,” মৃদু বকুনি লাগিয়ে মনে করিয়ে দিলেন ব্যান্ডোদা।

এবার আমার বিনম্র প্রতিবাদ : “একদিন ভোরবেলায় দয়া করে, আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সামনে ফুটপাথের ওপরে রিকশাওয়ালা ও শ্রমজীবীদের ব্রেকফাস্ট দেখবেন। এখন ছাতু তেমন জনপ্রিয় নেই, বর্তমানে প্রচণ্ড প্রতাপ কচুরি এবং তরকারির। রাস্তার দোকানদার কচুরি ভেজে ওঠবার সময় পাচ্ছে না, এতোই চাহিদা এবং খরিদ্দারের হাতে সময় এতোই কম।”

“বলিস কি!” আমার পয়েন্টটা নোট করে নিলেন ব্যান্ডোদা, সুবিধে মতন আই বি এম ল্যাপটপ কম্পিউটারে ঢুকিয়ে নেবেন। এবার তাঁর প্রশ্ন : “তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী!”

আমার ব্যাখ্যা : “নোনতার দোকানে টেকনিক্যাল অবস্থা হলো ‘ফ্রম খোলা টু নোলা’—কড়া থেকে ছেঁকে তুলে গরম তেল ঝরাবার সময়টুকুও পাওয়া যাচ্ছে না।”

অধ্যাপক রায় নানকুর দোকান চেনেন, ওখানকার খাবারের জনপ্রিয়তা তাঁর অজানা নয়। তিনি বললেন, "তেল অথবা ঘৃতসান্নিধ্য ছাড়া নোনতা মাহাত্ম্য কখনও বিকশিত হয় না।"

ঘৃতই বোধহয় আদিম, সেই কোনকালে বেদের ঋষিরা আগুনের সামনে বসে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন। কিন্তু অধ্যাপক রায় শুনিয়ে দিলেন, "মানবসমাজে ঘি জিনিসটা এসেছে অনেক পরে, মনে রাখতে হবে গোরুকে যে গৃহপালিত করা যায় তা বুঝতে আদ্যিকালের মানুষের বেশ সময় লেগেছিল। কিন্তু তেলের ব্যবহার তার আগেই শুরু হয়েছে।"

"কোন তেল? সরষের তেল না বাদাম তেল?"

এই প্রশ্ন শুনে অধ্যাপক রায় অধৈর্য হয়ে উঠলেন। "অনেক দুঃখে প্রভাতরঞ্জন সরকারমশাই বলেছিলেন, 'ব্যাকরণ না জানলে, সাহিত্য অচল!' আরে মশাই, তৈল শব্দটা ভেঙে ফেলুন, পেয়ে যাবেন তিলকে—তিল থেকে সঞ্জাত, তাই তৈল। 'সরষের তেল' শব্দটাকে আনন্দমূর্তি প্রভাতরঞ্জন সরকারমশাই অনেক দুঃখে সোনার পাথরবাটি নাম দিয়েছেন। এর সংস্কৃত নাম হওয়া উচিত সর্ষপা!"

"মানে বেগুনি ফুলুরিকে আর তেলেভাজা বলা চলবে না, বলতে হবে সর্ষপারোচিকা।"

এরপর আমরা একের পর এক নোনতা পরিক্রমা শুরু করেছি। নানকুর জনপ্রিয় দোকানে দুই কাউন্টারে দুটি আইটেমের প্রবল চাহিদা।

বিশাল এক চাটুতে বিশেষ কায়দায় পরোটা তৈরি হচ্ছে, ভাজবার এই পদ্ধতি গত কয়েক হাজার বছরে একটুও পরিবর্তিত হয়নি। প্রতিষ্ঠাতা নানকুজির অধস্তন চতুর্থ পুরুষ পিঁড়িতে বসে প্রবল বিক্রমে পরোটা ভাজার সময় একটা আঙুল তেলে চুবিয়ে আরেকটা আঙুলের ধাক্কা দিয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে তেল দিচ্ছেন।

অধ্যাপক রায় উৎসাহিত হয়ে বললেন, "ছিটিয়ে ছিটিয়ে ভাজা যায় বলেই প্রাচীনকালে ঘিয়ের নাম ছিল 'উপসেচনম্'! প্রভাতবাবুর বইতে এর উল্লেখ আছে, কিন্তু পদ্ধতিটা কখনও চোখে দেখিনি।"

পরোটা শব্দটির ভিতরেও প্রবেশ করা গেলো নানকুর গরম পরোটা ভক্ষণ করতে করতে। জানা গেলো, রুটির ভাল নাম রোটিকা, যেমন চাপাটির সংস্কৃত নাম চর্পটিকা। রুটিতে তেলের ছিটে পড়লে তা আদরণীয় হয়ে ওঠে তাই 'প্রিয়রোটিকা' অথবা পরোটা।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "দিল্লিতে একটা রাস্তার নাম ছিল রোটক রোড।"

"ঠিক ধরেছেন, ব্যান্ডোদা। মনে রাখতে হবে সব রুটিই রোটিকা নয়—বড় আকারের রুটি যাতে ঘি মাখানো হয়নি তারা শুদ্ধ নাম রোটিকা।"

"তা হলে চাপাটি বস্তুটি কি?" আমার জানতে ইচ্ছে হয়।

"সব খবর কি একদিনে জানা যায়! খুঁজে খুঁজে আদি ব্যাপারটার অনুসন্ধান করতে করতেই যুগ-যুগ কেটে যায়। পণ্ডিতরা জানেন রুটি ও চাপাটির পার্থক্যের মূলে রয়েছে 'নেচি'। এই নেচি হাতে করে চাপড়ালে হয় চর্পটিরোটিকা অথবা চাপাটি।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "পরোটা খাই অথচ পরোটার ফোঁড় জানি না, কথাটা মিথ্যে নয় দেখছি। নেচিতেই তো শেষ নয়। তারও পিছনে রয়েছে আটা।"

নানকুর বংশধর আমাদের কথাবার্তা শুনছে আর হাসছে। সে বললো, "গরম গরম খেয়ে যান, অতিথি অথবা খরিদ্দারকে পরোটা ঠাণ্ডা পরিবেশন করলে পাপ হয়, নানকুজি বলতেন। আমাদের বাড়ির সবাই এখনও তাই বিশ্বাস করে।"

অধ্যাপক রায় বুঝিয়ে দিলেন, "অ্যাকর্ডিং টু প্রভাতরঞ্জন সরকারমশাই গমকে মিহি করে পিষলে যা পাওয়া যায় তার নাম 'অন্তিকা' এবং তারই বিবর্তিত রূপ আটা।"

"অন্তিকা মানে তো মিহি আটা," সুযোগ পেয়ে নিজের বিদ্যেবুদ্ধি দেখানোর জন্যে ফোড়ন দিলাম।

"প্রফেসর রায়, আপনি বলতে চাইছেন মোটা আটারও সংস্কৃত নাম আছে!"

"অবশ্যই আছে, মিস্টার ব্যান্ডো। সাধে কি আর পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান শব্দসম্ভারের আধার এই সংস্কৃত ভাষা। পাঁচ-ছ' লাখ শব্দের সংগ্রহ এখানে ডালভাত। জেনে রাখুন, মোটা আটার আদিনাম চিকর্ষা। বাংলা

ভাষার এই মস্ত সুবিধে, নিজের ভাণ্ডারে না থাকলে সংস্কৃতের যে-কোনও শব্দ জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নিজের করে নাও।”

“আটা জিনিসটা বাঙালির ধাতে নেই—জেনুইন বাঙালিকে আটা ধরাতে গিয়ে ফেল হয়েছে মোগল পাঠান ওলন্দাজ ও পর্তুগিজ। ইংরেজও পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত জার্মানির হিটলার ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের কল্যাণে বাঙালি সারেন্ডার করলো এই অন্তিকার কাছে। পাঠান যুগের কিছু আগে সেন আমলে বাঙালি ময়রারা পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়ে রান্নাঘরে কিছু আটা আমদানি করেছিল। তারপর পর্তুগিজরা এদেশে ময়দা আনলো, তখনই বাঙালির রসসিঞ্চিত উদ্ভাবনী শক্তি আবিষ্কার করলো লুচি অথবা নুচিকে।”

অধ্যাপক রায় জানালেন, সরকারমশায়ের গোটা পঞ্চাশেক বই অতি যত্নে পাঠ করে এই সব খবর তিনি তিলে তিলে সংগ্রহ করে চলেছেন। “নীহাররঞ্জন রায় মশায় তো বাঙালির ইতিহাস প্রথম খণ্ড রচনা করে কাজটা অসমাপ্ত রেখে চলে গেলেন, এই মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড লেখবার মতন কব্জি এবং কলজের জোর এপার বাংলায় ইদানীং কারও নেই, কারও সে মুরোদ থাকলে তাঁর ঠিকানা ঢাকায়। কুড়ি কোটি বাঙালি মাথাপিছু দশটা করে পয়সা দিলে এই মহাদায়িত্ব সহজে সম্পূর্ণ করা যায়।”

মাঝারি সাইজের মৃৎকোষে (যার বাংলা খুরিকা) অধ্যাপক রায় আমাদের গরম গরম চা খাওয়ালেন।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ব্যান্ডোদা নিজের মনেই বললেন, “নানকুর দু'নম্বর কাউন্টারে ভিড় দেখে মনে হচ্ছে জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে নোনতা এই মহাদেশের সর্বমানুষের মনোহরণ করেছে।”

আমি বললাম, “ব্যান্ডোদা, বুদ্ধিমান লোকেরা খাবারের দোকানে এসে একমনে রসনার পরিতৃপ্তি করেন, আমাদের মতন বোকারা খাওয়ার আনন্দ ভুলে নোনতার হিস্ট্রি জিওগ্রাফি নিয়ে মাতামাতি করে।”

“ধীরে বৎস, ধীরে! নোনতার তালিকায় এখন এক নম্বরে কে আছে তা তো আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় খুঁজে বার করতে হবে।”

ব্যান্ডোদার কথাগুলো দোকানের এক সুরসিক বৃদ্ধের কানে চলে গেলো!

ফতুয়া গায়ে তিনি নানকুর দু'নম্বর কাউন্টারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ফরেন থেকে এসেছেন বুঝি? এখানকার সব খবর এখনও জানেন না! শুনে নিন ছড়াটা :

তিন অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে খায়
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে মুখ চুলকায়,
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে বৃহৎ জন্তু হয়,
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে জেলখানাতে যায়।"

এক মুহূর্তের জন্যে ব্যান্ডোদা চোখ বুজলেন, তারপর বলে উঠলেন, "পৃথিবীর দশটি অবিস্মরণীয় ধাঁধার একটি হবার যোগ্য! ইস্কুলে পড়ার সময় ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল। এর উত্তর তৈরি করবার জন্যে বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই—কচুরি।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যান্ডোদা বললেন, "ওয়ার্ল্ডের বেস্ট কচুরি যেখানে খেয়েছিলাম বহু বছর আগে আজ সেখানে যাওয়া যাক।"

নানা পথ পেরিয়ে মার্সেডিজ গাড়িতে আমরা ধর্মতলায় এসে হাজির হলাম—জওহরলাল নেহরু রোড লেনিন সরণির মোড়ে লাহাদের রঙের দোকানের পাশে নাকি ছিল কলকাতার বেস্টসেলার কচুরি। সে দোকান কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেলো না।

"জিনিস সেরা হলেও যে দোকান উঠে যেতে পারে তা আমার জানা ছিল না," দুঃখ করলেন ব্যান্ডোদা।

কিন্তু হতাশ হবার পাত্র নন অধ্যাপক রায়, মার্সেডিজ গাড়ি ঘুরিয়ে নানা আঁকাবাঁকা পথ ধরে তিনি সুরেন ব্যানার্জি রোডের পূর্ব দিক দিয়ে ঢুকে পড়ে নিষিদ্ধ স্থানে গাড়ি পার্ক করালেন। বললেন, "কচুরির পবিত্র পীঠস্থান! ভাল কচুরির দোকানে সাইনবোর্ড থাকে না, দোকানের নাম থাকে না, কিন্তু সুরসিকরা ঠিক ছুটে আসেন। ভাল ময়রা ও সার্থক সাধকের মধ্যে কোনও তফাত নেই, ঝকঝকে সাইনবোর্ডের জোরে খদ্দের টানায় আমাদের ভারতবর্ষ কখনও বিশ্বাস করেনি।"

আমি বললাম, "ভাল কচুরি কাচের প্লেটে খাওয়া যায় না। এর জন্য

প্রয়োজনে শালপাতার ঠোঙা। এই ঠোঙার কয়েকটা নমুনা যত্ন করে সেফ ডিপোজিট ভল্টে তুলে রাখতে হবে, কোনদিন মিউজিয়ম পিস হয়ে যাবে। শালপাতার ঠোঙার ডিজাইনিং, তার ওপর ডবল ডেকার খাবার সাজানো এবং ওপরে আবার পাতা দিয়ে সিলিং করা সোজা ব্যাপার নয়, দুনিয়ার সব দোকানদার আমাদের ময়রা আর্টিস্টদের কাছে গোহারান হেরে যাবে।"

"দাঁড়াও আমার উপনেত্রমটা বার করি," বলে ব্যান্ডোদা চশমা পরলেন, কথাটা সকালেই তিনি অধ্যাপক রায়ের কাছ থেকে শিখেছেন। উপনেত্রমের মধ্য দিয়ে তিনি কচুরির ডিজাইনিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়া পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন। বললেন, "ধন্য এই জাত। প্রত্যেকটা কচুরির সাইজ সমান, যেন মেশিনে কাটা হয়েছে! প্রতিটি পিস যেন অনন্য এক শিল্পকর্ম।"

একসঙ্গে বেশ কয়েকখানা গরম কচুরির রসগ্রহণ করলেন ব্যান্ডোদা। "চালিয়ে যা," আমাদেরও উৎসাহ দিলেন। "ভ্যালু ফর মানি এমন কোথাও পাবি না। এদেশের ময়রার পায়ের কাছে ম্যাকাডোনাল্ড কোম্পানির বড় সায়েবদের শুয়ে থাকা উচিত। দ্যাখ, দু'মিনিটে অর্ডার সাপ্লাই, আর তিন মিনিটে মাল উধাও—ইন্ডিয়ান ফাস্টফুড সেন্টার থেকে হাতমুখ মুছে যে যার কাজে চলে যাচ্ছে, এ-দৃশ্য ওয়ার্ল্ডে পাবি না। কচুরি কালচারটা সারা বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে পারলে বিশ্বের মঙ্গল হবে।"

অধ্যাপক রায় কচুরি খেতে খেতে বললেন, "পুরো একটা বিশ্বকোষ হয়ে যায় এই কচুরিকে নিয়ে। যুগে-যুগে দেশে-দেশে গ্রামে-গ্রামে এর কতো রূপ এবং কতো সমাদর তা জানতে গেলে সেনসাস অফিস বসাতে হবে নতুন করে।"

শুরু হলো একেবারে শুরু থেকে, অর্থাৎ আটা যখন লেচি অথবা 'কৌলালকী' রূপ গ্রহণ করেছে।

এক বৃদ্ধ দোকানের কোণে বসে গরম কচুরি উপভোগ করছিলেন। রসিয়ে-রসিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে কী করে কচুরির স্বাদগ্রহণ করতে হয় তা ব্যান্ডোদা মন দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন। শুনলেন, ভদ্রলোক তিনপুরুষ

ধরে প্রতি সকালে কচুরি জলখাবার খাচ্ছেন একই দোকান থেকে।

দার্শনিকের মতন মুখের ভাব করে ভদ্রলোক বললেন, "সব একরকম আছে। শুধু দামটা ছাড়া। আমার ছোটবেলায় এক-আধলায় চারটে কচুরি পাওয়া যেতো, সেই সঙ্গে ডাল। এখনকার ছোকরারা ডাল পছন্দ করে না, তারা শীতকালে চায় ফুলকপি। এরা জানে না, এই সেদিনও কলকাতার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণরা ফুলকপিকে ম্লেচ্ছসংসর্গদুষ্ট মনে করে ভোজনপাত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন।"

অধ্যাপক রায় ফিসফিস করে ব্যান্ডোদাকে জানালেন, "প্রাচীন বাংলায় বিউলি ছাড়া অন্য কোনও ডালের উল্লেখ নেই। আমরা অন্য ডাল খেতে শিখেছি মাত্র এক হাজার বছর, এরই মধ্যে অনেকের ডালে অরুচি ধরছে, লক্ষণটা ভাল নয়, মিস্টার ব্যান্ডো।"

কচুরি জিনিসটা কোথাকার এই প্রশ্ন করায় দোকানের কারিগর একটু অবাক হয়ে গেলেন। "ভগবান সবার জন্যে কচুরির ব্যবস্থা করেছেন, যেখানেই তিনি আছেন সেখানেই কচুরি আছে।"

ম্যানেজারমশাই সবিনয়ে জানালেন, "লোকমুখে শুনেছি, কচুরি কলকাতায় এসেছে কাশীধাম থেকে। সিঙাড়াও একধরনের কচুরি, আদিতে লোকে তেকোণা কচুরি বলতো।"

প্রফেসর রায় লোভ সামলাতে পারলেন না। জানালেন, "বাঙালির রসনাসংক্রান্ত সব সৃষ্টির পিছনে রয়েছে জনাইয়ের অবদান। শোনা যায় ওখানকার এক প্রতিভাবান ময়রা (পতিরাম) বহু বছর আগে আধুনিক সিঙাড়া নিয়ে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। এই যে কালোজিরে দেওয়া তেকোণা নিমকি, তাও এই সৃষ্টিশীল পতিরাম ময়রার সৃষ্টি। দাবিটা বোধহয় মিথ্যে নয়। কারণ শোনা যায়, দেবতারা নানাবিধ নোনতা ও মিঠাইয়ের আকর্ষণে হরবকত হুগলি জেলায় আসতেন মানবদেহ ধারণ করে।"

"কেন? জনাইতে আপনার শ্বশুরবাড়ি বলে?"

আমার অভিযোগটা তথ্যভিত্তিক, তাই অধ্যাপক রায় একটু লজ্জা পেলেন। বললেন, "জনাইয়ের কুলীনদের একজন ১৬৫টা বিয়ে করে এই

সেদিনও রেকর্ড করেছিলেন। ভীম নাগ, নকুড় নন্দী এঁরা সবাই জনাই থেকে এসেছেন। কিন্তু নিমকির ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য, কারণ প্রাচীন সংস্কৃতে এর কোনও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। আর পুরো উত্তর ভারতে কালোজিরে দেওয়া এই তেকোণা নিমকির নাম বাংলা নিমকি কেন হলো?"

ব্যান্ডোদা মন্তব্য করলেন, "আপনাদের নিয়ে পারা গেলো না! আপনারা নাকি ইদানীং দাবি করছেন মহাকবি কালিদাস কাঁথির লোক?"

অধ্যাপক রায় একটু লজ্জা পেলেন, কারণ মেদিনীপুরের এই দাবিকে তিনি ন্যায়সঙ্গত মনে করেন।

সুরেন্দ্র ব্যানার্জির রোডে কচুরির দোকানে সব অনুসন্ধান শেষ হবার নয়। ব্যান্ডোদার মার্সেডিজ এবার শিয়ালদহ ফ্লাইওভার দিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে সাবেক কালের হ্যারিসন রোড গিয়ে পড়লো। এই পথই এখন মহাত্মা গান্ধীর চোখের জল মুছছেন। এরপর সূর্য সেন স্ট্রিট এবং কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে জগদ্বিখ্যাত পুঁটিরাম মোদকের দোকানে হাজির হওয়া গেলো।

ব্যান্ডোদা স্বীকার করলেন, রাধাবল্লভীর ক্ষেত্রে পুঁটিরামের খ্যাতি আন্তর্জাতিক। সারা বিশ্বে এমন দেশ নেই যেখানে পুঁটিরাম প্রেমিকরা ছড়িয়ে না আছেন, প্রয়োজনে এঁরা বোধহয় সঙ্ঘ গড়ে তুলতে পারেন। প্রতিষ্ঠাতা পুঁটিরামের পিসেমশাই জিতেন মোদক বহুকাল আগে কীভাবে বৃন্দাবনে গিয়ে গোপনে রাধাবল্লভী রহস্য আয়ত্ত করে কলকাতায় ফিরে এসে সেই গুপ্তবিদ্যা কাজে লাগিয়েছিলেন তা আজ কিংবদন্তির মতন।

"এবার বৃন্দাবন গেলে রাধাবল্লভীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নদিয়ানন্দন মহাপ্রভুর গল্প মন দিয়ে শুনবেন," বললেন অধ্যাপক রায়।

পুঁটিরামের দোকানে আর একপ্রস্থ অর্ডার দিয়ে আমরা বসে আছি। মনে হচ্ছে আজ সারাদিনটাই স্রেফ নোনতার ওপর নির্ভর করতে হবে। পড়েছি ব্যান্ডোদার হাতে খানা খেতে হবে সাথে! মাছের ঝোল ভাত, স্যুপ, ফিশফ্রাই এটসেটরাকে গুলি মেরে এযাত্রায় শুধু নামী দোকানের দামি নোনতা!

"এরা আর দোকান নেই, হয়ে উঠেছে মহানগরীর সাংস্কৃতিক স্তম্ভ, বুঝলি মুখুজ্যে," মন্তব্য করলেন ব্যান্ডোদা।

পুঁটিরামের রাধাবল্লভী মুখে পুরতে পুরতে অধ্যাপক রায় জানলেন, "কিংবদন্তি এই যে খড়দার শ্যামসুন্দরকে আপ্যায়ন করার জন্য নদিয়াবিহারী শ্রীচৈতন্য এই খাবারের উদ্ভাবন করেন এবং রাধাবল্লভ কৃষ্ণের নামে উৎসর্গ করেন। মহাপ্রভুর ছিল অসীম দূরদৃষ্টি, সহজেই বুঝেছিলেন বেস্টসেলার হবে, নেকস্ট হাজার বছর ময়রার দোকানে রাধার দাপট থাকুক না থাকুক রাধাবল্লভী প্রাণময়ী হয়ে থাকবে।"

"হয়তো জিতেন মোদক মশাই বৃন্দাবনে নিয়মিত দিনলিপি রচনা করতেন, সেই অপ্রকাশিত ডায়েরি একবার প্রকাশিত হলে হইহই পড়ে যাবে।"

"সেইটাই তো দুঃখ," বললাম আমি। "বাংলার অসামান্য মিষ্টান্নশিল্পীরা হিসবের ফর্দ লিখেছেন লম্বা লম্বা, কিন্তু ভরসা করে কিছু রেসিপি অথবা অপ্রকাশিত জীবনবৃত্তান্ত রেখে যাননি। এঁরা সব আত্মবিস্মৃত মানুষ, নিজেকে কখনও শিল্পী বলে মনে করেননি, সবসময় কারিগর বলে পরিচয় দিয়েছেন।"

পুঁটিরামের রাধাবল্লভী মুখে দিয়ে অধ্যাপক রায় পকেট থেকে নোটবুক বার করলেন, এটি থাকে তাঁর পাঞ্জাবির তলায় হাতকাটা ফতুয়ার পাশ পকেটে। বললেন, "পুঁটিরামে ভোজন করলেই বুঝতে পারবেন, কেন সংস্কৃত কবিরা এই রাধাবল্লভীর নাম দিয়েছিলেন 'গন্ধসোমা'। সোমা অর্থে চাঁদ।"

আবার আনন্দমূর্তি প্রভাতরঞ্জন সরকারমশাই থেকে চাঞ্চল্যকর সব উদ্ধৃতি। সোমালিকার অর্থ পুরি। এবার পুরির গভীরে প্রবেশ। ময়দায় তৈরি হয় লুচি, আটটায় তৈরি হয় পুরি। ডালপুরি বেলতে লাগে সাড়ে সাত প্যাঁচ, আর এক্সপার্টের হাতে লুচি রেডি হয়ে যায় মাত্র আড়াই প্যাঁচে।

আরও গোপন খবর শুনুন। লুচি ও পুরি দুয়েতেই ময়ামের সময় লবণ দিতে হয়। পুরনো কলকাতায় নিষ্ঠাবানদের জন্যে কিন্তু আলুনো পুরি তৈরি হতো, কারণ উঁচু জাতের লোকরা সবার ঘরে লবণ খেতেন না।

সাবেকী বিয়ে বাড়িতে এখনও তাই আলাদা করে লবণ দেবার রীতি অব্যাহত রয়েছে।

কড়াইতে না ফুললে লুচির বদনাম। পুরির ক্ষেত্রে কিন্তু এই ঝামেলা নেই, ফুললেও ভাল, না ফুললেও চলবে, তাই পুরি কোথাও ভাজা হয় কড়ায়

ছাঁকা তেলে, আবার কোথাও চাটুতে। মনে রাখবেন, লুচির অপর নাম ফুলকো লুচি—রইস বাঙালিরা ঢাকাতেই বলুন, কলকাতায় বলুন, আর জনাইতেই বলুন—ফুলকো লুচির পাতলা দিকটা খেতেন। চিন্তা করবেন না, অপচয় হতো না, বাকিটা খেতেন বড়লোকের চাকরবাকররা।

ব্যান্ডোদা ইতিমধ্যে পুঁটিরামের কারিগরের সঙ্গে কিছু কথা বলে নিয়েছেন। লুচির তুলনায় কচুরিতে কম ময়াম কেন দিতে হয় তা জানার জন্যে তিনি বেশ উৎসুক। কারিগরের কাছে ব্যাপারটা নিতান্তই সহজ। লুচির মতন বেশি ময়াম দিলে কচুরি ফেটে সমস্ত পুর বেরিয়ে পড়বে।

নিষ্ঠাবান বাঙালির লবণনীতি সম্বন্ধে ব্যান্ডোদা গবেষণা চালাতে চান। এসব না বুঝলে, অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের কলকাতা এবং সেখানকার জটিল সমাজ ব্যবস্থা একেবারেই বোঝা যাবে না। যতোক্ষণ না নুন পড়ছে ততোক্ষণ খাবারে স্পর্শদোষ হয় না। যার তার বাড়িতে নুন খাওয়া মানেই তো জাত নিয়ে টানাটানি। যাদের বাড়িতে নিশ্চিন্তে নুন খাওয়া যায় এই সেদিনও তাঁদের বলা হতো কৌদ্রাবিক!

কাজের বাড়িতে গৃহস্বামী কোনও জাতপাতের হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে চাইতেন না। তাই লুচি, তরকারি সব আলুনো রাখা হতো, মুখে দিলে কারও জাত যাবার ভয় নেই। অনুষ্ঠানের সময় পৃথক পৃথক জাতের জন্যে বিভিন্ন কাঠের পাত্রে আলাদা আলাদা নুন। এইসব আচার অনুষ্ঠান এ যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প মনে হলেও মোটেই অসত্য নয়।

অধ্যাপক রায় চুপিচুপি আমাকে জানালেন, "চন্দননগরের খাস্তার কচুরি এখনও তাঁর মুখে লেগে রয়েছে। শাস্ত্রে বলেছে, শ্রেষ্ঠ কচুরি শুধু মুখরোচক নয়, মধুর, রক্তপিত্তদূষক, বলকারক এবং অবশ্যই উষ্ণবায়ুনাশক।"

শাস্ত্রে যা লেখা আছে তার ওপরে তো আপিল নেই, মেনে নিতেই হবে কচুরির আয়ুর্বেদীয় উপকার, পেটরোগারা যতোই কচুরির দুর্নাম ছড়ান।

খুব সাবধানে সিগন্যাল দিলাম সর্বদমন রায়মহাশয়কে, অনুগ্রহ করে চন্দননগরের কথা উত্থাপন করবেন না, এখনই ব্যান্ডোদা ওখানে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন, আজ বরং কলকাতা হাওড়ার চৌহদ্দির মধ্যে

লবণরসমাহাত্ম্য অনুসন্ধান করা যাক।

আশ্চর্য জায়গা এই হাওড়া। যেখানেই সেরা মিষ্টির দোকান সেখানেই কারখানার ভিতরের দিকে গিয়ে খোঁজ করলে দেখতে পাবেন হাওড়ার কোনও শিল্পী বসে আছেন যাঁর জন্ম পাতিহালে অথবা বড়গাছিয়ায়। এই হাওড়া না-থাকলে ভারতের স্বর্ণালঙ্কার শিল্প এবং মিষ্টান্ন শিল্প দুইই অচল হয়ে যেতো। অমন যে অমন দ্বারিক ঘোষ, লুচি কচুরিতে যাঁর প্রচণ্ড নামডাক, খোঁজ করুন, বেরিয়ে পড়বে হাওড়ার আদি ঠিকানা।

ব্যাণ্ডোদা বললেন, "বুঝছি তোমার হাওড়াপ্রীতি উছলে উঠছে। হাওড়ার লোকেরা নিজেরা নোনতা এবং মণ্ডামিঠাই খেতে না পেলেও দুনিয়ার লোককে রসেবশে রেখেছে। তবে জেনে রাখা ভাল, এক কোকিলে বসন্ত হয় না! এক দ্বারিক ঘোষে হাওড়ার সম্মান পার্মানেন্ট হয় না।"

চ্যালেঞ্জটা ইজ্জতে লেগে গেলো। পুঁটিরামের দোকান থেকেই ডায়াল করলাম, বন্ধুবর কল্যাণ ভদ্র মশায়কে, গ্রেটেস্ট লিভিং অথরিটি অন কলকাতার খাদ্য এবং অখাদ্য। দিশী বিদেশী দোকানদারদের হাড়হদ্দ তিনি জানেন সুদীর্ঘ দিনের নিষ্কাম গবেষণা থেকে।

"টপক্লাস নোনতা এবং সেই সঙ্গে হাওড়া কানেকশন! খুবই কঠিন সমস্যায় ফেললেন অসময়ে।" টেলিফোনেই হতাশা প্রকাশ করলেন কল্যাণ ভদ্র মহাশয়। ওঁর নিজেরও একটা হাওড়া কানেকশন আছে, তাই আমার দুঃখটা বুঝলেন। তারপর বললেন, "টপ থ্রি রাধাবল্লভী মেকার দেখতে হলে চলে যান ল্যান্সডাউন রোডে, খোঁজ নিন কোথায় মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ অ্যান্ড সন্স। হাওড়া, পাতিহাল, নিজবেড়িয়া গ্রাম এবং কচুরি রাধাবল্লভীতে এর মৃত্যুঞ্জয়ী সুনাম!"

"কই কোথাও তো এই প্রতিষ্ঠানের তেমন প্রচার বা বিজ্ঞাপন দেখিনি?"

"নোবেল প্রাইজ যারা পায় তারা কি নিজেদের নামঠিকানা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়? দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, বেলুড় এসবের কি বিজ্ঞাপন প্রয়োজন হয়?"

ব্যাণ্ডোদা স্বীকার করলেন, "জাত আর্টিস্ট কখনও বিজ্ঞাপনমুখো হয় না, সে কেবল তারিফ চায়। কিন্তু সে তারিফ আসতে হবে না-চাইতে।"

অতএব উঠলো বাই তো কটক যাই! অনেক চেষ্টায় ল্যান্সডাউন ওরফে শরৎ বসু রোডে প্রবীণ শিল্পী সনাতন ঘোষ মহাশয়কে আবিষ্কার করা গেলো।

সনাতনবাবুর পিতৃদেব মৃত্যুঞ্জয় যে ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত পড়েছিলেন তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে এই অধমের নিবেদন : "বি-এ এম-এ পিএইচ-ডি আমরা অনেক দেখেছি, বেশিরভাগই পাতে দেবার মতন নয়। আমরা এখন চাই মৃত্যুঞ্জয়ের মতন গবেষক শিল্পীদের পরিচয় যাঁরা তিলে তিলে নোনতা খাবারের গোপন রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন।" উদারহৃদয় এই পুরুষ, তাঁর আবিষ্কৃত রহস্যগুলো প্রতিষ্ঠানের তরুণ কারিগরদের শিখিয়ে দিতে মোটেই ভয় পেতেন না।

ল্যান্সডাউন তথা শরৎ বসু রোডের মৃত্যুঞ্জয়ী এই দোকানের প্রতিষ্ঠা ১৯২৮ সালে। তার আগে মৃত্যুঞ্জয় এবং তাঁর পিতৃদেব পদ্মপুকুরের কাছে এক ময়রার দোকানে কারিগর ছিলেন। পরে উত্তর কলকাতানিবাসী জনৈক মল্লিকের কাছ থেকে দোকানটি জমা নেন—মাসিক রেট কুড়িটা রসগোল্লা ও একশো টাকা। শেষপর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় ভাবলেন, পুরনো দোকান তাঁর পুরনো মালিককে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেই অন্য কোথাও নতুন দোকান করবেন।

পুরনো দোকানের মালিক সদাশিব ব্যক্তি, সব কথা শুনে তিনি বললেন, "এক হাঁড়ি রসগোল্লা এবং চারশো টাকা দিয়ে তুমি নিজেই এই দোকানের মালিকানা নাও।"

এরপরেই ধারাবাহিক সাফল্যের সূত্রপাত। রাধাবল্লভী ও কচুরির মাধ্যমে স্বয়ং লক্ষ্মী এসে ঘোষ পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করলেন, একে একে কলকাতায় বেশ কয়েকখানা বাড়ির মালিক হয়েছেন তাঁরা, কিন্তু কখনও খরিদ্দারকে ঠকাননি মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ। যতোদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন লক্ষ্মী ঘি ছাড়া অন্য কোনও ঘিয়ের প্রবেশ নিষেধ ছিল তাঁর দোকানে। সেই সততার ট্রাডিশন এখনও চলছে, উৎকৃষ্ট জিনিস ছাড়া অন্য কিছুর প্রবেশ নিষেধ সনাতনবাবুর দোকানে। তবে সময়ের সঙ্গে অন্যরূপ আধুনিকতার সূচনা হচ্ছে।

এখন বিউলি ডাল গুঁড়ো অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে উৎকৃষ্ট ছাতু এবং হিংগোলা জল। রাধাবল্লভী এবং কচুরি তৈরির পিছনে রয়েছে হাজার হাঙ্গামা এবং অশেষ ধৈর্য।

অধ্যাপক রায় রাধাবল্লভীর শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের শাস্ত্রীয় উপায় বিশ্লেষণ করলেন। একটি কোণ ধরে ভাজা রাধাবল্লভীকে ঝুলিয়ে নাড়া দিলে ঝরঝর করে সমস্ত ডাল তলার দিকে নেমে যাবে মাধ্যাকর্ষণের অমোঘ আকর্ষণে।

লুচির কাহিনীও যে শোনার মতন তা সর্বদমনবচনামৃত থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

দেশে দেশে ইতিহাস ভেদে লুচির আকার ভিন্নরূপ ধারণা করেছে। সকলের মাথায় রয়েছে মালদহ। দিনাজপুরের বগিথালা লুচি-র ব্যাস ১২ ইঞ্চি, দু'হাতে ধরে খেতে হয়। কলকাতায় কেউ নতুন করে বগিথালা লুচি চালু করলে রসিকজনের ধন্যবাদ অর্জন করতে পারেন। বাংলায় গ্রামেগঞ্জে এবং কাজের বাড়িতে লুচির ব্যাস ছ'ইঞ্চি। কলকাতা চিরকালই মধ্যপথাবলম্বী—এখানে স্ট্যান্ডার্ড লুচি তিন ইঞ্চির ব্যাসের—একমাত্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং কিছু বনেদী পরিবার ছাড়া। সেখানে মেদিনীপুরের প্রভাব, আকার অনুযায়ী বলা হয় ডবল পয়সা লুচি। এক ইঞ্চি অথবা দেড় ইঞ্চি ব্যাসের লুচির মাসতুতো ভাইয়ের নাম ফুচকা। এর উৎপত্তি যে 'পুচ্ছকা' থেকে তা অধ্যাপক রায় যথাসময়ে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় ঘোষের দোকানে বসেই আমরা শুনলাম কচুরি সিঙাড়া রাধাবল্লভী এখনও বাঙালির অতি প্রিয় জলখাবার—যদিও অনেক কারণে ছুটির দিনে, বিশেষ করে রবিবারের সকালে এই সব আইটেমের বিক্রি হুড়ুম করে বেড়ে যায়।

সারা দক্ষিণ কলকাতা সেদিন ছুটে আসে ম্যাডক্স স্কোয়ারের কাছে অথবা বেকবাগানে মিঠাইয়ের দোকানে নোনতার খোঁজে। সাইনবোর্ডে নোনতার উল্লেখ না থাকলে এঁরাও খাস্তার কচুরিতে বিজয়মাল্য অর্জন করেছেন। যেমন সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন বালিগঞ্জ প্লেসের মুখার্জি সুইটস। আসলে রবিবারে সকালে কলকাতার নাগরিকদের বাঙালিত্ব যেন কিছুক্ষণের

জন্যে ফিরে আসে। আজকাল শহুরে লোকের মধ্যে বাঙালিত্ব বলতে কিছুই নেই, এই নোনতাপ্রীতিটুকু বাদ দিলে। যা একদিন উত্তর কলকাতার তথাকথিত সুতানুটি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল তা যে শেষপর্যন্ত মধ্য কলকাতা পেরিয়ে দক্ষিণ এবং সুদূর দক্ষিণে কলকাতার প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে এটাও লক্ষ্য করবার বিষয়।

ব্যান্ডোদা এক মার্কেট রিসার্চ এজেন্সিকেও অনুসন্ধানে লাগিয়েছেন। তাঁদের প্রাথমিক রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে ব্যান্ডোদা বললেন, "যা বুঝছি, ভবিষ্যতে মেঠাই পিছোবে এবং নোনতা এগোবে। এইটাই হচ্ছে নতুন যুগের ধর্ম। নোনতায় মস্তিষ্কের উর্বরতা বাড়ে না যাঁরা বলেন তাঁরা জানেন না প্রাত্যহিক কচুরি নিমকির জোরেই আমাদের উত্তর কলকাতা একদিন হয়ে উঠেছিল 'বাংলার এথেন্স'।"

"সে জিনিসটা কী?" অধ্যাপক সর্বদমন রায় ব্যাপারটা একটু বুঝতে চাইছেন।

'ইউরোপীয় সভ্যতার ধাত্রীগৃহ হলো এই এথেন্স। অর্থাৎ কচুরি সিঙাড়া খানেওয়ালারাই নর্থ ক্যালকাটায় একালের ভারতীয় রেনেসাঁর জন্ম দিয়েছে।"

শেষ কচুরিটি আক্রমণ করার পরেই ব্যান্ডোদা অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য ভবানীপুর, সেখানে তিনি নাকি কলকাতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কচুরি কিং অথবা কচুরি সম্রাটের সন্ধান পেয়েছেন।

অধ্যাপক রায় বললেন, "প্রাচীন ভারতে কচুরি, এই বিষয়ে একটা একশো পাতার মনোগ্রাফ আমরা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার করাতে পারি।"

আমার প্রশ্ন, "এতো সাবজেক্ট থাকতে ইন্ডিয়ান কচুরি নিয়ে শিকাগো কেন অযথা মাথা ঘামাবে, অধ্যাপক রায়?"

সর্বদমন রায় বললেন, "গাঁটের কড়ি খরচ করে ওঁরা রামকৃষ্ণর কালীপ্রেম নিয়ে যদি ঢাউস এবং অত্যন্ত নোংরা বই প্রকাশ করতে পারেন তা হলে হোয়াই নট কচুরি? আমি জানি, গোরখপুর থেকে এক প্রফেসর ওঁদের কাছে কচুরির ঐতিহাসিক ও সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কাগজপত্র পাঠিয়েছেন, ওই অধ্যাপকের ধারণা কচ্+পুরি থেকে পুরি=কচুরি—এটা আর্যাবর্তের

অবদান। কিন্তু সময়মতন আমরা হাটে হাঁড়ি ভাঙবো—সারা দুনিয়াকে জানাবো আর্যাবর্ত এই কচুরিকে বিশ্বসভায় দান করেনি। উত্তর ভারতকে কচুরি উপহার দিয়েছে দ্রাবিড়রা অন্তত চার হাজার বছর আগে। মূল শব্দটা হলো 'কোচ্চেপুরি', কৌচ্চেস মানে ছোট অথবা কচি, অর্থাৎ আদর করে খাওয়ার মতন জিনিস।"

অবশ্যই আদর করে খাওয়ার মতন জিনিস এই কচুরি। দ্রাবিড়রা খাবার চিনতে মোটেই ভুল করেননি, একটা আইটেমেই তাঁরা চিরকালের জন্য আর্যাবর্তর সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন।

কচুরির পরেই ঘোষমশায়ের দয়ায় মৃৎকোষে অর্থাৎ সুদৃশ্য ভাঁড়ে একটু গরম চায়ের ব্যবস্থা হলো। অধ্যাপক রায় ইদানীং আর 'চা' বলেন না, অরিজিন্যাল ইন্ডিয়ান শব্দ থাকতে কেন তিনি আধুনিক চীনে টার্ম ব্যবহার করবেন? জেনে রাখুন প্রাচীন ভারতে চা'কে বলা হতো 'কমলরস'।

প্রভাতরঞ্জন সরকারমশাই সরাসরি লিখেছেন, দুর্গম গিরিকন্দর পেরিয়ে তিব্বত অথবা চীনে যাবার সময় ভারতীয় গবেষকরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এড়াবার জন্য চা-পাতা ছেঁচে চিবিয়ে খেতেন। সায়েবদের কোনও বইতে এর উল্লেখ পাবেন না, ইদানীং চীন এবং জাপান বলতে ওঁদের মুখ দিয়ে লালা ঝরে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় চায়ের একাধিক নাম রয়েছে। চায়ের দ্বিতীয় নামটি আরও মজার-'উষ্ণকম্বল'। আরে মশাই শীতের সময়েই তো গরম চায়ে আনন্দ, অবশ্যই এর নাম হতে পারে উষ্ণকম্বল। আর কমলরস—সে তো তুলনাহীন সৃষ্টি, যা রবি ঠাকুরেরও ঈর্ষা উদ্রেক করতে পারে।

এই মুহূর্তে চা নিয়ে গবেষণার মানসিকতা নেই ব্যাঙোদার। সকাল থেকে বারংবার বাংলার নোনতা ময়রার খোলা থেকে আমাদের নোলায় চলে আসছে। ব্যাঙোদা স্বীকার করছেন, মিষ্টির দাপট কমে গিয়ে অর্থের কারণে অথবা স্বাস্থ্যের কারণে অথবা রসনার কারণে সর্বত্র নোনতার এখন বিপুল আধিপত্য।

ভদ্রতা করে ব্যাঙোদা মন্তব্য করতে গেলেন, "বলা যায় না, যাঁরা এখন নোনতা ভালবাসছেন, তাঁরাই আবার কখন মিষ্টির দিকে ঝুঁকে পড়বেন।"

"আপনার শেষ বক্তব্যটা মোটেই নিরাপদ নয়," মৃদু প্রতিবাদ জানালেন

অধ্যাপক রায়।

একজন বাঙালি মহাপুরুষ লিখিতভাবে সাবধান করে দিয়েছেন, "যখন কোনও নোনতাপ্রেমী মানুষ হঠাৎ মিষ্টির দিকে ঝোঁকেন তখন তাঁর কোনও প্রাণসংশয়কারী ব্যাধি আসন্ন এটা নিশ্চিত জেনে রাখবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য মঠ-মিশনের প্রথম সভাপতি রাজা মহারাজের কথা। যৌবনে প্রতিদিন শরীরচর্চায় পরে আধসের কচুরি এবং আনুষঙ্গিক তরকারি খেতেন, বুড়ো বয়সে হঠাৎ তিনি মিষ্টির দিকে ঝুঁকলেন এবং তার পরেই সঙ্ঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ গুরুতর অসুখে পড়লেন। এ ঘটনার উল্লেখ করে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দর মেজোভাই, খ্যাতনামা লেখক মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়।"

ফটাফট অনেক পয়েন্ট ব্যান্ডোদা তাঁর ল্যাপটপে লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছেন—খাতায় নিজের হাতে খবর লিখে নিয়ে, তা বইতে রূপান্তরিত করার অভ্যাস বিদেশে বোধহয় কারও থাকবে না।

কলকাতার কচুরি কিং যে শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের বর্তমান প্রোপ্রাইটার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গুঁই তা ব্যান্ডোদার রিসার্চ থেকেই ইদানীং বেরিয়েছে। কতো সহস্র কচুরি ক'মিনিটের মধ্যে গুঁইমশায়ের ফাস্ট ফুড কাউন্টার থেকে রসিকদের রসনায় পৌঁছে যাচ্ছে তার সঠিক হিসেব আমাদের জানা নেই।

কিংবদন্তি অনুযায়ী বাংলার মিষ্টান্নপ্রেমী বাঘ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বউবাজার ভীম নাগ থেকে প্রতিদিন সন্দেশের চ্যাঙারি ক্রয় করলেও, এই শ্রীহরির কচুরিকেও তিনি সমর্থন করতেন, যদিও ভীম নাগের মতন এখানকার কোনও নোনতার নাম আজও 'আশুভোগ' হয়নি।

এই নামকরণ সম্ভব নয় কেন তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন অধ্যাপক রায়। কচুরি রাধাবল্লভী হলো বৈষ্ণব মানসিকতার প্রতিফলন, ফলে এখানে শ্রীহরি, শ্রীগুরু, শ্রীচৈতন্যর একচ্ছত্র প্রতিপত্তি।

অধ্যাপক রায় আরও বললেন, "আপনার খবর অনুযায়ী এই শ্রীহরি দোকানের প্রতিষ্ঠা ১৯২৩ নাগাদ এবং সেক্ষেত্রে স্যর আশুতোষের আশীর্বাদপূত হবার সম্ভাবনা প্রবল, কারণ স্যর আশুতোষের মৃত্যু ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৪। ভবানীপুরে তাঁর নিজের পাড়ায় শ্রীহরি এসেছেন,

জাঁকিয়ে বসেছেন অথচ মিষ্টান্নপ্রেমী আশুতোষের নজরে পড়েনি এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।” তাছাড়া অধ্যাপক রায় খবর পেয়েছেন, কচুরি ছাড়াও শ্রীহরির অতীব জনপ্রিয় আইটেম ল্যাংচা এবং হরিভোগ।

ব্যান্ডোদা সামাল দিলেন, “ফোকাস নষ্ট করবেন না, প্রফেসর রায়। আমরা এই মুহূর্তে নোনতা ছাড়া অন্য কিছুতেই নজর দিচ্ছি না, ল্যাংচায় কি নুন থাকে?”

অধ্যাপক রায় লজ্জা পেয়েও বলতে গেলেন, “শ্রীহরির কচুরির সঙ্গে প্রায় একফুট লম্বা ল্যাংচা এক বিশ্ববিজয়ী কম্বিনেশন। সাধে কি আর দূরদূরান্ত থেকে লোক ছুটে আসে লবণ ও মধুর রসের এই শ্রীহরিসঙ্গমে!”

কিন্তু এখনকার মতন কথাটা খুব ইমপর্টান্ট, পকেটে পয়সা আছে বলে যখন খুশি শ্রীহরির কাউন্টারে উপস্থিত হয়ে যা খুশি ভোজন করা যাবে এটা মস্ত ভুল। সমস্ত ব্যাপারটা একটু হেঁয়ালি মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছু কিছু আশ্চর্য ব্যাপার আছে যা শ্রীহরিকে ময়রার দোকানের মধ্যে বিশিষ্টতা দিয়েছে। ব্যাপারটা অবশ্য কিছু গোপন নয়, ভবানীপুরে অনেকেই জানেন এবং যথাসময়ে এবিষয়ে বলা যাবে।

শ্রীহরির প্রতিষ্ঠাতা সন্তোষকুমার গুঁই উত্তর কলকাতা থেকে সরে এসে দক্ষিণ কলকাতায় ভবানীপুরের নাগরিকদের রসনাতৃপ্তির সহায়তা করবেন এতে আর আশ্চর্য কী? খাওয়া-দাওয়া করা, গানবাজনা শোনা, যাত্রা বা নাটক দেখা, জীবনের নানা ভোগের রসে নিজেকে নিমজ্জিত রাখা এসব ক্যালকাটা সাউথের কুষ্ঠিতে কস্মিনকালেও ছিল না, তাই সহজবোধ্য কারণেই নানা আকর্ষণে এখানকার রইস আদমিদের ছুটতে হতো উত্তর কলকাতায় নানা সুখের সন্ধানে। অতি সাম্প্রতিককালে ট্রাফিক জ্যাম, গর্তে ভর্তি রাস্তা এবং তথাকথিত ‘বিদ্রোহী’ বাঙালিদের নিত্য-মিছিলের দৌরাত্ম্যে দক্ষিণ-উত্তর কলকাতার স্বাভাবিক যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে, মেট্রো রেল এসেও এই ছিন্ন সম্পর্কে জোড়া লাগাতে পারলো না, বরং উত্তর কলকাতার বিরাট জনসমাজ সুযোগ পেলেই দক্ষিণমুখো অথবা সল্টলেকগামী হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

উত্তর কলকাতার স্বর্ণযুগে বিভিন্ন নোনতা খাবারের গোপন রেসিপি

সংগ্রহ করে সন্তোষকুমার গুঁই শ্রীহরিভরসায় ভবানীপুরে দোকান খুলেছিলেন। বর্তমান মালিক লক্ষ্মীনারায়ণবাবু বোধহয় এখনও সিনিয়র সিটিজেন হননি, তিনি এই অধমকে সবিনয়ে কিন্তু সবিস্তারে জানালেন, মাত্র ১১ বছর বয়সে অকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় এবং ১৩ বছর বয়সে শ্রীহরির কচুরিকে পৃথিবীময় প্রচারের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হন।

ব্যান্ডোদা ভেবেছিলেন, পয়সা ফেললে এই পৃথিবীতে সব জিনিসই সবসময় পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীহরিতে তিনি মোক্ষম ধাক্কা খেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত অনুযায়ী, বিদেশে বসেই তিনি দক্ষিণেশ্বরের কাছে ফাগুর গুটে কচুরির কথা শুনেছেন, এই কচুরি খাবারও প্রবল ইচ্ছে তাঁর। কিন্তু তাঁকে শ্রীহরির বেঞ্চিতে বসিয়ে সবিনয়ে জানানো হলো, শ্রীহরির কচুরি ট্রেন অথবা এয়ারলাইনসের মতন তার নিজস্ব টাইমটেবিল অনুযায়ী চলে। গুটে কচুরি উইথ হালুয়া শ্রীহরিতে বিপণন শুরু হয় সকাল পাঁচটা নাগাদ, সকাল সাড়ে ছ'টার পর শ্রীহরির কাউন্টারে হালুয়া কচুরি চাওয়ার অর্থ মালিক কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে লজ্জা দেওয়া। জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠলে চিকিৎসক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞরা টুক করে তাঁদের সম্মানমূল্য বাড়িয়ে দেন। শ্রীহরির মিষ্টান্নশিল্পীর জীবনবোধ অন্য, তাই চারটে গরম কচুরি ও হালুয়ার একটি প্যাকেটের দাম মাত্র দু'টাকা। যে প্রথমে আসবে সে প্রথমে পাবে, অর্থবল থাকলেই যে অজস্র কচুরি-হালুয়া কিনে ফেলে অপরকে বঞ্চিত করা সম্ভব নয় তাও শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে গেলেই বুঝতে পারবেন।

ঘড়ি মিলিয়ে সকাল সাড়ে ছ'টায় ভবানীপুরে শুরু হয় শ্রীহরির লুচি ও সিঙাড়াপর্ব। এখানে লুচির সঙ্গে ছোলার ডাল, না ছোলার ডালের সঙ্গে লুচি বিক্রি হয় তা বলা কঠিন। এই ডাল আমরা তিনজন আস্বাদন করেছি। অমন যে অমন ব্যান্ডোদা তিনিও স্বীকার করেছেন, এর শব্দময় বর্ণনা সম্ভব নয়। শ্রীহরির মনোহারিণী ডালের পিছনে রয়েছে রসবোধ, রসনাবোধ ও পরিমিতিবোধ। এঁদের ডালে মিষ্টিভাব একটু কম, কারণ জেনুইন নোনতাপ্রেমীরা ডালের মধ্য দিয়ে ফ্রি মিষ্টি খেতে মোটেই উৎসাহী নন। যাঁরা জেনেশুনে দোকানের ডালে রসগোল্লা-পান্তুয়ার রস ঢালেন ঈশ্বর তাঁদের মঙ্গল করুন, কিন্তু সেরা নোনতা শিল্পীরা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে

এবং আপন শক্তির ওপর নির্ভর করে ছোলার ডালকে ছোলার পায়েস না করে ছোলার ডালই রাখতে চান।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, সকাল আটটার পরে শ্রীহরিতে পদার্পণ করলে প্রয়োজনমতো লুচি-ডাল আপনি পাবেনই এমন গ্যারান্টি দেওয়া এই দীন লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। মনে রাখবেন, হিং-কচুরির অভাবনীয় চাহিদা মোকাবিলা করার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের প্রায়ই সাধ্যসাধনা করতে হয়। আরও মনে রাখবেন, এই বিশ্ববিখ্যাত দোকানে মোদক জাতের মুখরক্ষা যাঁরা করছেন তাঁদের বেশিরভাগই হাওড়ার অধিবাসী।

হিং-এর কচুরি ঘিরেও হাজারো রহস্য—আপনার সামনে কিছু বিউলি ডাল, আটা, হিং-এর জল, খাবার সোডা, নুন এবং ঘি/তেল রেখে দিলেই আপনি কচুরিস্বর্গে আরোহণ করতে পারবেন না। আর একটা কথা মনে রাখবেন, সব ব্যাপারটা গরম গরম হওয়া চাই, জেনে রাখুন উত্তাপটাই যৌবন, অন্তত নোনতার কাছে, তাই নোনতা অতো সহজে ডোন্টকেয়ার করতে পারে ঠাণ্ডা আলমারি অর্থাৎ ফ্রিজকে।

শ্রীহরির হিং-এর কচুরি টানা বিক্রি হয় বিকেল চারটে পর্যন্ত। তারপর সামান্য বিরতি দিয়ে আবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত দশটা। এবার সেই বহুপ্রতীক্ষিত রাত দশটা।

তার আগে বলে রাখি, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রায়ই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের গৃহে অথবা তাঁর নামাঙ্কিত সেবাসদনে এসে শ্রীহরির কচুরির খোঁজ করতেন। স্বয়ং দেশবন্ধু ছুটতেন জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে কাকিমা মৃণালিনী দেবীর (রবীন্দ্রগৃহিণী) হাতে তৈরি মাংস এবং লুচি খেতে। পরবর্তীকালে আরেকজন (দেশবন্ধুর দৌহিত্র সিদ্ধার্থ রায়ও) জানতেন শ্রীহরি কী জিনিস! তাই তো হওয়া স্বাভাবিক। বড় ডাক্তার, বড় ব্যারিস্টার হয়েছেন বলে মাঝে মাঝে কচুরি সিঙাড়া ইত্যাদি নোনতা দাঁতে কাটবেন না তা কেমন করে হয়?

আমাদেরও জানা উচিত মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রদূত যাই হও নিজের পাড়ায় তৈরি খাবার মানুষকে মাঝে মাঝে টানবেই।

শ্রীহরির সামনে রাত দশটার দৃশ্যটাও এ-পাড়ার ভি-আই-পিদের অজানা

নয়। মাঝে মাঝে মানুষের ভিড়ে রাস্তায় তাঁদের গাড়ির গতি শ্লথ করেছে। তবে শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গুঁইমশায়ের কাজটা তো ছেলেমানুষী নয়! প্রতি রাতে দশটার সময়ে বেচাকেনা এবং টাকা আনা পাইয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে আমাদের গুঁইমশাই শ্রীহরিশরণম্ বলে সেকালের সম্রাট হর্ষবর্ধনের ভূমিকা গ্রহণ করেন। দোকানের ভাণ্ডারে যতো কচুরি, লুচি, সিঙাড়া, মিষ্টি অথবা মাখা ময়দা পড়ে রয়েছে সব ভাজাভুজি হোক, এসব দেওয়া হবে তারে "যারে বিনা মূল্যে দিতে পারি"।

এই সেবার কাজটাই লক্ষ্মীনারায়ণ গুঁইমশায়ের খেয়াল। তাঁর ছেলেকে তিনি দু'নম্বর শ্রীহরি খুলে দিয়েছেন টালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে। একদিন তারাও হয়তো এই বিতরণ পথের পথিক হবে। শোনা যায় কয়েক শত অভাবী মানুষ রাত দশটার সময় অভুক্ত থাকলে সমবেত হন শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে, তাঁদের কয়েকজন এই দোকানের নিয়মিত অতিথি।

ব্যান্ডোদা বললেন, "জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ সাফল্য লাভ করেন তাঁদের কিছু অপ্রত্যাশিত গুণ থাকে যা প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মে বাঁধা যায় না।" ব্যান্ডোদের উপদেশ, "বাঙালি পাঠকদের বলবি, স্বয়ং ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে গিয়েছেন, একঘেয়েমি এযুগের ধর্ম নয়। একটু আলাদা, একটু অন্যরকম হলেই সাফল্য আসবে, এই বিশ্বাস নিয়েই জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে হবে একালের তরুণদের।"

ব্যান্ডোদা ছাড়বার পাত্র নন। পরের দিন ভোরবেলায় গুটে কচুরি-হালুয়ার জয়যাত্রা নিজের চোখে দেখতে এবং নিজের জিভে আস্বাদন করতে অরিজিন্যাল শ্রীহরির সামনে তিনি সবান্ধবে জমায়েত হয়েছিলেন।

বিদায় দেবার আগে কেন জানি না ব্যান্ডোদাকে প্রশ্ন করলাম, "তা হলে আপনি পুরোপুরি নোনতা পার্টি হয়ে গেলেন, ব্যান্ডোদা?"

উত্তর না দিয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "তুই তো ইদানীং একটু রামকৃষ্ণভক্ত হয়েছিস। খবরাখবরও কিছু কিছু রাখছিস। সোজাসুজি বল তো ঠাকুর কোন দিকে—মিষ্টি না নোনতা?"

বড়ই কঠিন প্রশ্ন। "ফাগুর দোকান থেকে তিনি যে গুটে কচুরি প্রায়ই

আনাতেন তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, স্বয়ং গিরিশকে নোনতা খাইয়ে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছেন। কচুরির ওপর তাঁর যে প্রবল টান ছিল তা সহজেই বলে দেওয়া যায়। আবার অবচেতন মানসে রয়েছে মেঠাই। শিবনাথ শাস্ত্রীর রকমসকম দেখে মোহিত হয়ে ঠাকুর বললেন, শিবনাথের কি ভক্তি—যেন রসে ফেলা ছানাবড়া। মিষ্টি ছানাবড়ার প্রতি কতটা ভক্তি শ্রদ্ধা এবং টান থাকলে এমন কথা বলা যায়?"

ব্যান্ডোদা আমার কথা মন দিয়ে শুনলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "ময়রাদের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের রীতিমতো উচ্চ ধারণা ছিল বলে তোর মনে হয়?"

"অবশ্যই!"

পরের দিন ভোরে শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে ব্যান্ডোদা গুটে কচুরি-হালুয়া উৎসব পরম আনন্দে ও বিস্ময়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। কিন্তু দোকানের ভিতরে বসে নোনতা খেতে উৎসাহ দেখালেন না ব্যান্ডোদা।

"সামথিং রং উইথ ইউ, ব্যান্ডোদা! কী ব্যাপার?" আমার মধ্যে কিছুটা দুশ্চিন্তা উঁকি মারছে।

মার্সেডিজ গাড়িতে উঠে এসে ব্যান্ডোদা রহস্যটা চেপে রাখলেন না। তিনি যে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছেন, বোঝা যাচ্ছে।

"তুই তো জানিস, ইদানীং আমি কিছুটা বিবেকানন্দভক্ত হয়েছি—দেবতা কিনা জানি না, কিন্তু এমন মহাপুরুষ পৃথিবীতে বেশি জন্মগ্রহণ করেননি। গতকাল আমার এক পেটরোগা আত্মীয় আমাদের লেটেস্ট রিসার্চের কথা শুনে আঁতকে উঠলেন। বললেন, এ তো বিবেকানন্দবিরোধী কাজ! স্বামী বিবেকানন্দ তো এই কচুরি পুরির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেছিলেন।"

ব্যান্ডোদা একথা বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না, তখন এই আত্মীয় হাতে লিখেই বিবেকানন্দরচনা থেকে কিছু উদ্ধৃতি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এই কাগজটা একটু হতাশ হয়েই আমার হাতে তুলে দিলেন ব্যান্ডোদা। বিবেকানন্দ লিখছেন, "এই যে ঘরে ঘরে অজীর্ণ, ও ওই ময়রার দোকানে খাওয়ার ফল।...পাড়াগেঁয়ে লোক যে অপেক্ষাকৃত ভাল তার কারণ হচ্ছে লুচি কচুরি প্রভৃতি বিষলড্ডুকের অভাব,...ভাজা জিনিসগুলো আসল বিষ।

ময়রার দোকান যমের বাড়ি!...কোন্ প্রাচীন কবি লুচি কচুরির বর্ণনা করেছেন? ও লুচি কচুরি এসেছে পশ্চিম থেকে।"...খিদে পেলেও কচুরিকে খানায় ফেলে দিয়ে স্রেফ শুকনো মুড়ি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিবেকানন্দ।

এসব কথা বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন তাঁর প্রাচ্য পাশ্চাত্য বইতে। বলেছেন, "ষণ্ডজাত ইংরেজ ভাজাভুজি খেতে ভয় পায় অথচ আমাদের প্রিয় আহার লুচি কচুরি।"

"তা হলে?" ব্যান্ডোদার গলার সুরেই বুঝছি, তিনি বিবেকানন্দবিরোধী পথে এগোতে তেমন উৎসাহী নন।

ব্যান্ডোদা বললেন, "কচুরি পুরি আজ বন্ধ থাক। নোনতার তো আরও অনেক দিক আছে?"

"শতসহস্র দিক আছে, ব্যান্ডোদা। যেমন তেলেভাজা—বেগুনি, ফুলুরি, পটোলি, আলুর চপ। এই অয়েলফ্রাই আস্বাদন করে এদেশের কোটি কোটি মানুষ অল্প পয়সায় অতলান্ত আনন্দসাগরে ডুবে রয়েছে।"

"আনন্দ নয়! অজ্ঞান তিমিরান্ধকার!" বিবেকানন্দর লেখাটা ব্যান্ডোদার বুকের মধ্যে যে খচখচ করে বাজছে, তার নগদ প্রমাণ পাওয়া গেলো।

ব্যান্ডোদা এবার জানতে চাইলেন, "ময়রার দোকানের বাইরে কোন নোনতা কোথায় আছে এই দেশে?"

"জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোথায় সর্বজনপ্রিয় নোনতার উপস্থিতি নেই, ব্যান্ডোদা?"

"অন্তরীক্ষটা কোথায় পেলি বাছাধন?"

তখন ব্যান্ডোদাকে বোঝাতে হলো, "সেদিন অন্তর্দেশীয় বিমানযাত্রার সময় এক সুন্দরী বিমানললনা চায়ের সঙ্গে নোনতা ডালমুটের একটি ঝলমলে প্যাকেট মিষ্টি হেসে গছিয়ে দিয়ে গেলো।" জলে ও স্থলে কচুরির দশগুণ জনপ্রিয় যে চানাচুর তার ব্যাখ্যাও শুনলেন ব্যান্ডোদা। ক'দিন আগে গঙ্গা পেরোবার ফেরি স্টিমারেও সল্টেড বাদাম ও চানাচুর দেদার বিক্রি হচ্ছিল।

ব্যান্ডোদার নির্দেশ অনুযায়ী আজ সারাদিন কচুরি সিঙাড়া প্রসঙ্গ এড়িয়ে অপারেশন চানাচুর চলবে, আগে যার নাম ছিল ডালমুট।

এখন ডালমুট কেউ বলে না। শ্রীহরিমুখো না হয়ে আমরা নিকটবর্তী উজ্জ্বলা সিনেমার কাছে চানাচুর এক্সপিডিশনে চলেছি। বিখ্যাত এই দোকানের চাকচিক্য নেই, কাচের মনোহারি শোকেস নেই, কোম্পানির সাইনবোর্ড থাকলেও, নজরে পড়ে না, কোনও ব্র্যান্ড নেমের মায়ামোহে খরিদ্দারকে অবশ করে মুনাফা বাড়াবার প্রয়াস নেই এই প্রতিষ্ঠানে।

তবু দোকান খুললেই উজ্জ্বলার সামনে লাইন লেগে যায়। বাঙালির যতো ধৈর্য প্রদর্শন এই ফুটবল ক্রিকেটের টিকিটের লাইনে, চানাচুরের দোকানে এবং ক্যালকাটা বুকফেয়ারের সময় বেনফিশ নামক সরকারি মাছভাজার দোকানের সামনে। মাথা খাটিয়ে এর অর্ধেক ধৈর্য ঠিকমতন যথাস্থানে বিনিয়োগ করলে আমরা বিত্তের সংগ্রামেও ভারতের মধ্যে ফার্স্ট সেকেন্ড হতে পারতাম।

উজ্জ্বলার লাইনে দাঁড়িয়ে ব্যান্ডোদাকে শোনালাম, এই চানাচুর যুগে যুগে নতুন রূপ এবং নতুন কলেবর ধারণ করেছে। হঠাৎ আমার পুরনো স্মৃতি উথলে উঠলো :

আমার এই হরিদাসের
বুলবুল বুলবুল বুলবুলভাজা
হরিদাসের বুলবুল ভাজা
হার মেনে যায় খুরমা-খাজা
কোথা লাগে পাঁপর ভাজা
গলদা চিংড়ি জিবে গজা!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলকাতায় এমন পাড়া ছিল না যেখানে ঘুঙুরপরা ফেরিওয়ালার কণ্ঠে এই গান শোনা যেতো না! ইনি কোথাও 'হরিদাস', কোথাও 'দ্বিজদাস', আবার কোথাও 'দেবীদাস'। বিক্রেতা হয়তো আলাদা, কিন্তু পণ্যটি এক।

লাইন মারতে অভ্যস্ত নন অধ্যাপক রায়। চানাচুর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় গবেষণা না করেই তিনি এখানে চলে এসেছেন।

ব্যান্ডোদার অনুরোধে তিনি শুধু বললেন, "'খুরমা-খাজা' আস্বাদন করতে করতে হলে আপনাকে যেতে হবে কেষ্টনগর, আর শ্রেষ্ঠ গজা তৈরি হয় চন্দননগরে। জিবেগজা শব্দটির উৎপত্তি 'গোজিহ্বা' থেকে, কারণ জিনিসটা অনেকটা গোজিহ্বার আদলে তৈরি।"

উজ্জ্বলা চানাচুরের লাইনে আমরা ধিকিধিকি এগোচ্ছি, কারণ কালীঘাটের বহু বহিরাগত দূরদূরান্ত থেকে ট্রাম বাস ট্যাক্সি রিকশ এবং হাওয়াগাড়ি চড়ে এখানে এসে প্রতিদিন এই দোকান আক্রমণ করেন। ভুলেও ভাববেন না তীর্থযাত্রীদের একমাত্র লক্ষ্য কালীঘাট কালী মন্দির। মাকালী কোনও পুরাণেই চানাচুর খেতে নিষেধ করেননি। উজ্জ্বলা চানাচুর লুকিয়ে ভি-আই-পি ব্যাগে পুরে কত অনাবাসী ইন্ডিয়ান যে ইউরোপ আমেরিকা এবং কানাডায় নিয়ে যান তা আলোচনা না করাই ভাল, কারণ ওই সব দেশের এয়ারপোর্টে বেরসিক কাস্টমস অফিসারের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। তাঁদের ধারণা, ইন্ডিয়ার যে কোনও খাবার নিজের দেশে ঢুকলে জনস্বাস্থ্যের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

লাইনে দাঁড়িয়েই জানা গেলো, মুদ্রাস্ফীতি কী হারে হচ্ছে এই শহরে তা জানবার সহজতম উপায় উজ্জ্বলা চানাচুরের কাউন্টারে টাঙিয়ে রাখা মূল্যতালিকার নমুনা সংগ্রহ করে রাখা। হাজার গ্রাম থেকে ২৫ গ্রাম পর্যন্ত চানাচুরের কতো দাম যাচ্ছে তা কাউন্টারেই প্রতিদিন ঘোষণা করা হয় এবং এই তালিকা যে ঘন ঘন পরিবর্তিত হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যাঁরা কেবল ট্যাকের তোয়াক্কা করেন তাঁদের সেবার জন্যে আশেপাশে অসংখ্য সস্তাদরের চানাচুরকেন্দ্র আছে, সেই সব ভাজাভুজি অবুঝের মতন খেয়ে, ঝালের প্রকোপে হাঁসফাঁস করতে করতে আপনি ভাল থাকুন। ভাল থাকুক আপনার পিতৃদত্ত হজমযন্ত্র— নিকটস্থ কালীমন্দিরে মায়ের কাছে আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

উজ্জ্বলার ব্যাপার স্যাপারই আলাদা! লাইনে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক তো চানাচুর কেনবার আগে পকেট থেকে নামকরা ডাক্তারের জাঁদরেল প্রেসক্রিপশন বার করলেন। তাঁর চিনি খাওয়া বারণ, আধুনিক বউমা চানাচুরেও তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখন বাধ্য হয়ে আড়াইশো টাকা

দর্শনী জমা দিয়ে বিলেত ফেরত ডাক্তারের পূর্ণ দাস রোড চেম্বারে কনসাল্টেশন, ধন্বন্তরীসদৃশ এই ডাক্তার অনেক ভেবেচিন্তে জানালেন, চানাচুরে আপত্তি নেই যদি তা উজ্জ্বলার চানাচুর হয়।

"এ মশাই আহারকে আহার ওষুধকে ওষুধ—শরীরের স্নায়ুগুলো প্রয়োজনীয় একটু কিক পায়, লালা ক্ষরণ হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে, ফলে পরিপাকযন্ত্রটি পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করে দেয় এবং প্রবীণ শরীরেও নবীনত্বের নানা লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।"

অধ্যাপক সর্বদমন রায় নিজের স্বার্থে এই ডাক্তারের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন, রোগীদরদী হিসেবে এঁর তো অবিলম্বে ডাক্তার বি সি রায় পুরস্কার পাওয়া উচিত। কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই ডাক্তারের নম্বর দিতে চাইলেন না, আপনারা সবাই ওঁর চেম্বারে একই প্রত্যাশায় ভিড় করলে উনি হয়তো চানাচুর প্রেসক্রিপশন চেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নেবেন, কারণ একসময় দয়াপরবশ হয়ে রোগীদের আহার তালিকায় তিনি সন্দেশ প্রেসক্রাইব করতেন, পরবর্তীকালে অপব্যবহার হতে পারে এই আশঙ্কায় সন্দেশনির্দেশ খুবই কমিয়ে দিয়েছেন।

উজ্জ্বলা চানাচুরের কর্ণধাররা সেলস কাউন্টারে কেন হাঁড়িমুখ করে বসে থাকেন তা এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। এমন সাফল্যের পরেও কোথায় দুঃখ লুকিয়ে আছে কে জানে। কাউন্টারে তাঁদের একটিই কাজ, চানাচুর ওজন করা, মশলা মেশানো এবং দাম গুণে নেওয়া। মুখে একটিও রা নেই। পৃথিবীর সেরা জিনিস এই ভাবেই বোধ হয় বিক্রি হয়, ফেরিওয়ালার মতন হড়বড় করে আত্মপ্রশংসায় খরিদ্দারকে হাজার কথা বলতে নেই। আসলে উজ্জ্বলা চানাচুরের দোকান নয়, চানাচুরের বুটিক! দূর থেকে প্রতিটি খরিদ্দারের মুখের দিকে তাকিয়েই মালিক অদৃশ্য শক্তিবলে বুঝতে পারেন কোন মশলা কোন ঠোঙায় কতটা দিতে হবে।

যে একবার উজ্জ্বলায় এসেছে সে যে মজেছে চিরকালের জন্যে তা সবাই জানে। এর রহস্যটা কোথায়? তা বোঝবার বা জানবার কোনও সহজ উপায় নেই। লোকে শুধু দেখে কেনবার সময় চানাচুর হাতে গরম, খেলে মনে থাকে না, ঢেকুর ওঠে না, অতি সহজে হজম হয়ে যায়। চিবোবার সময় শুধু

জিভ নয়, সমস্ত শরীরটা মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যেন মহানন্দে এক অব্যক্ত সিমফনি অর্কেস্ট্রা শুরু করে দেয়। জগতের আনন্দ 'যজ্ঞে' আপনাকে সসম্মানে সামনের সিটে বসিয়ে দেবার জন্যেই যেন উজ্জ্বলা চানাচুরের টিকিট আপনাকে দেওয়া হয়েছে।

ব্যান্ডোদা ব্যাপারটা বুঝলেন। কোকাকোলা কোম্পানির কর্ণধারকে তাঁদের পানীয়র গোপন ফর্মুলা সম্বন্ধ প্রশ্ন করে যেমন লাভ নেই তেমন এই উজ্জ্বলাতেও মশলা সংক্রান্ত কোনও কৌতূহল প্রকাশ করবেন না। হিসেবের জন্যে আপনার জন্ম নয়, কেবল রহস্যজনক মশালামিশ্রিত উজ্জ্বলা পণ্য ভোগ এবং উপভোগ করার জন্যে আপনার এই মানব জন্ম। কিন্তু এখানে মনোহরণ প্যাকেজিং প্রত্যাশা করবেন না। ঝকঝকে শপিং ব্যাগ চাইবেন না, একমাসে দু'বার দাম বেড়েছে কেন জিজ্ঞেস করবেন না, পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে টুক করে নিজের প্যাকেটটি হাতে নিয়ে সরে যান, কারণ আপনার পিছনে যাঁরা লাইন মেরে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে হাইকোর্টের জজ, পি জি হাসপাতালের বড় ডাক্তারবাবু, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশ্ববিখ্যাত গাইয়ে, সদবিতে ছবি বিক্রি হওয়া আর্টিস্ট, প্রতিরক্ষা বিভাগের লেফটেনান্ট জেনারেল এবং ভারত বিখ্যাত নভেলিস্টও রয়েছেন। দূরদূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীর মতন এসেছেন তাঁরা। অধীর অথচ মধুর এই প্রতীক্ষা।

চানাচুর কোম্পানির কর্ণধাররা নিশ্চয় ভোরবেলায় উঠে গীতা কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে এই বিপুল সাফল্যের জন্য বিন্দুমাত্র মানসিক উত্তেজনার লক্ষণ নেই—লক্ষ লক্ষ হাতে গরম প্যাকেট জনগণের হাতে তুলে দিতে দিতে এঁরা স্থিতপ্রাজ্ঞ এবং সবরকম প্রশংসায় বিগতস্পৃহ হয়েছেন!

অধ্যাপক সর্বদমন রায় বললেন, "চানাচুর হচ্ছে চর্ব। বোধ হয় নিজে আকর্ষক নয়। যা কিছু নামডাক ও টানাটানি তা ওই মশলার জন্যে, যার মধ্যে রয়েছে বিটনুন, প্রাচীন ভারতে যাকে কুরুবিন্দ বা কালানুন বলা হতো। আর আছে সৈন্ধব লবণ যা পাকিস্তানে অঢেল পাওয়া যায়। সৈন্ধব লবণে অস্থিমজ্জা দৃঢ় হয় এবং গলক্ষত রোগের আশঙ্কা থাকে না। আমি চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়েছি।"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে উজ্জ্বলার চানাচুর খেতে খেতে অনেক যুবক তনুমোটন করছে অর্থাৎ আড়মোড়া ভাঙছে এবং আড্ডা দিচ্ছে। অধ্যাপক রায় জানালেন, "অড্ড শব্দটি অতি প্রাচীন, যার অর্থ একস্থানে অনেকে একত্রিত হওয়া। এই কারণেই বিমানবন্দরের হিন্দি নাম হয়েছিল 'হাওয়াই আড্ডা', ভাল শব্দ, হাসাহাসি করার মতন কিছু নেই।"

লজ্জার বিসর্জন দিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে আমরাও চানাচুর চিবিয়ে যাচ্ছি, শুধু অধ্যাপক রায় উৎসাহী হচ্ছেন না। গতকাল নাকি বিভিন্ন দোকানে অতিমাত্রায় নোনতা ভক্ষণ হয়েছে। স্বয়ং শিব নাকি ফতোয়া দিয়েছেন : "অতিভোজনম রোগমূলম, আয়ুক্ষয়কারণম্।"

ব্যান্ডোদা এসব তোয়াক্কা করেন না, তেমন প্রয়োজন হলে এখান থেকে দৌড়ে হাওড়া শিবপুরে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবেন। একদিকে দেদার খাওয়া, অন্য দিকে শরীর থেকে যেনতেন প্রকারেণ তা ঝরিয়ে ফেলা, এই হলো একালের সায়েবদের জীবনযাত্রা ও সুস্বাস্থ্যরহস্য।

ব্যান্ডোদা ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। এক কোকিলের ডাকে যে বসন্ত আসে না তা তিনি ভালই বোঝেন। তাই চানাচুর রহস্যটা ঝটপট বুঝে নিতে চান। একটা ভ্যান দ্রুতগতিতে চলে গেলো আমাদের সামনে দিয়ে, তার গায়ে লেখা 'বাপী' চানাচুর। বললাম, চানাচুর জগতে আরেকটি জনপ্রিয় নাম।

একটু দূরে আর একটি দোকান—হলদিরাম ভুজিয়াওয়ালা। এঁরাই ইদানীং সারা শহরে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। বিলিতি কায়দায় দিশি খাবারের বিপণন প্রচেষ্টায় লোকের মন টেনেছেন।

হলদিরামজির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কি না জানতে চাইলে ব্যান্ডোদাকে বললাম, "বছরখানেক আগে এই প্রতিষ্ঠানের প্রভুশঙ্কর আগরওয়ালার এক সাক্ষাৎকার বাংলা কাগজে পড়েছিলাম। এঁর ঠাকুর্দা ১৯২১ সালে বিকানিরে ভুজিয়ার দোকান খোলেন। এঁরই সুযোগ্যপুত্র হলদিরাম ভুজিয়াওয়ালা ১৯৪৭ সালে কলকাতায় এক বিয়েবাড়িতে আসেন এবং শহরটা পছন্দ হওয়ায় ব্রিজলাল সেন স্ট্রিটে ৫০০ টাকা বিনিয়োগ করে দোকান খোলেন। এরপর ১৯৭৬ সালে নাগপুরে এবং ১৯৮১ সালে দিল্লিতে এঁরা ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৯১ সালে বাবা মারা

যাবার পর সমস্ত ভারতের ভুজিয়া ব্যবসা ভাইদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই প্রভুশঙ্কর আগরওয়ালা কলকাতায় পৃথিবীর বৃহত্তম মিষ্টির শোরুম স্থাপনের কথা ভাবছেন যেখানে নাকি প্রতিদিন কুড়ি হাজার কেজি মিষ্টি তৈরি হবে। আমি বললাম, "সম্প্রতি এই সেন্টার এয়ারপোর্টের কাছে ভি আই পি রোডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

এর পরও দিল্লিতে হলদিরামের সম্বন্ধে সংবাদ প্রতিবেদন দেখেছি। বহুজাতিক পেপসি কোম্পানিকে টেক্কা দিয়ে উত্তর ভারতে ভুজিয়া মার্কেটের শতকরা ৮০ ভাগ এঁরা দখল করে আছেন। ইংরিজি ভাষায় এই মার্কেটের নাম নাকি 'স্ন্যাকফুড', যার পিছনে ভারতীয়রা হাসিমুখে বছরে দু'হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেন। অর্থাৎ তিন লক্ষ টন ভুজিয়া খাট্টামিঠা এবং ডাল সেঁউ চোখের সামনে উড়ে যাচ্ছে। সাপ্লাই দিতে গিয়ে মানুষ হিমসিম খাচ্ছে। বহুজাতিক কর্পোরেশনের সঙ্গে হলদিরামের সম্মুখসমর দিল্লিতে যে জমে উঠবে সংবাদপত্রে তার ইঙ্গিত রয়েছে। ভুজিয়াযুদ্ধের সমরাধিনায়ক কৃতবিদ্য, হলদিরামের এই কর্তাটির নাম মনোহরলাল আগরওয়ালা। দিল্লি এবং উত্তর ভারতে এঁদের তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র আছে বলে শোনা যায়।

অধ্যাপক রায় বললেন, "দিল্লি গেলে মথুরা রোডে একটু খোঁজখবর করবেন—হলদিরামের রাজকচুরি খুবই বিখ্যাত, দিনে অন্তত তিন হাজার প্লেট বিক্রি হয় বলে কাগজে লিখেছে।"

কলকাতায় কিন্তু অবাক কাণ্ড। কোনও আজ্ঞাত কারণে, পঁচিশ-ত্রিশবার চেষ্টা করেও হলদিরামের কর্ণধারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না, যাঁরা ফোন ধরেন তাঁরা মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রস্তাবে অস্বস্তিবোধ করেন। ফলে হলদিরাম ভুজিয়াওয়ালার পূর্ব ভারতীয় পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে তেমন কিছু জানানো সম্ভব হলো না।

তৃতীয় দিনে অধৈর্য ব্যান্ডোদা আমাকে মার্চিং অর্ডার দিলেন। "চলে যাও বাপী চানাচুরের অফিস কাম কারখানায়।"

ওখানে উল্টো বুঝলি রাম। প্রতিষ্ঠাতার প্রতিনিধিরা ভাবলেন, এই অধম বাপী চানাচুরের বিজ্ঞাপনসংগ্রহে অধিকতর উৎসাহী। আমরা যে স্রেফ

চানাচুর সম্পর্কে কথা বলে আনন্দ পেতে চাই তা নিজের পায়ে-দাঁড়ানো এই কৃতী মানুষটিকে বোঝানোর কোনও সুযোগ পাওয়া গেলো না। অতি সামান্য অবস্থা থেকে তিনি সাফল্যের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর খ্যাতি দিগন্তপ্রসারী হোক এই প্রার্থনা।

এবার আমার গন্তব্যস্থল দক্ষিণ কলকাতার নাকতলায় 'মুখরোচক' অফিস। ব্যান্ডোদা কোনও অজ্ঞাত কারণে আজ সকালে বেলুড়মঠের যাত্রী হয়েছেন—দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে!

মুখরোচক চানাচুরের দাপট যে কলকাতায় প্রবল এবং প্যাকেট চানাচুরে এই প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা যে অভাবনীয় সে খবর আগেই সংগ্রহ করেছি।

প্রতিষ্ঠানের তরুণ কর্ণধার প্রণবচন্দ্র চন্দ্রর জন্ম ১৯৫৯ সালে। চানাচুর এবং মুখরোচক সম্বন্ধে অনেক মজার কথা জানিয়ে প্রণববাবু অনুরোধ করলেন, "বাবার সঙ্গে দেখা করুন, তিনিই এই প্রচেষ্টার নায়ক, বয়স সত্তর বছর, ব্যবসা থেকে ক্রমশ নিজেকে বিলিতি স্টাইলে গুটিয়ে নিচ্ছেন যাতে নতুন প্রজন্মের মানুষরা বিনাবাধায় নতুন ভাবনা-চিন্তা ব্যবসায়ের কাজে লাগাতে সমর্থ হয়।" জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে বসে থাকার ফলে বহু দিশি ব্যবসায়ের যে সর্বনাশ হয়েছে প্রবীণ নির্মলেন্দু চন্দ্রের তা অজানা নয়।

পূর্ব ভারতের চানাচুর প্রস্তুতকারকদের প্রথম সারিতে দীর্ঘ দিন ধরে নিজের আসন বজায় রাখা যে সহজ কাজ নয় তা পিতা-পুত্রের সঙ্গে দু'মিনিট কথা বললেই বোঝা যায়। এ লাইনে প্রতিযোগিতা তীব্র।

অনেকেই জানেন না, যে কলকাতা এবং শহরতলিতে প্রায় দু'হাজার সংস্থা এই প্যাকেট চানাচুর ব্যবসায় নিযুক্ত রয়েছেন। এঁরা নিজেদের কারখানায় চানাচুর তৈরি করেন, প্যাকেটে ভরেন এবং তারপর সাইকেল ভ্যানে চালান করেন দোকানে দোকানে পরিবেশনের জন্য। ভ্যানওয়ালাই সেলসপার্সনের কাজ করেন।

প্রতিযোগিতা এতই তীব্র যে দাম এবং কমিশন নিয়ে মরণপণ লড়াই চলতে থাকে। ফলে তৈরির খরচ কমাবার জন্য নানা প্রচেষ্টা, যার ধাক্কায়

চানাচুরের গুণগতমান ক্রমশই নিম্নমুখী হতে বাধ্য। বিশেষ করে মার খায় ভাজার মাধ্যম তেল, এ নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা থেকে যায়। একই দুশ্চিন্তা থেকে যায় ডাল ও বেসন সম্পর্কে। কোন ডাল থেকে বেসন হচ্ছে তা না জানা থাকলে বিপজ্জনক খেসারির ডাল বেশি খাওয়া হয়ে যেতে পারে। তেমনি চীনে বাদামের মান। ওড়িশার বাদামের দাম কম, কিন্তু বিজৌড়া অর্থাৎ বেজোয়াদা বাদামের দাম বেশি। সেরা প্রস্তুতকারকরা দামি কোম্পানির বাদাম তেল, বেসন এবং অবশ্যই বেজোয়াদা বাদাম ব্যবহার করতে চান। বিটনুন আসে কানপুর থেকে, কিন্তু সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এই যে সস্তার চানাচুর প্যাকেট বালি বালি মনে হয় তার কারণ অশোধিত বিটনুন। এই কালা নুন শেষ প্রক্রিয়ায় মাটির হাঁড়ির মধ্যে বসানো হয়।

প্রণবচন্দ্র আর একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন। গরম থাকলে প্রায় সব চানাচুরই খেতে ভাল, কিন্তু একমাস দোকানে পড়ে থাকলে সস্তা চানাচুরের তিন অবস্থা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে, তখন মুখে দেওয়া যায় না! যাঁরা সুনাম রক্ষা করতে চান তাঁরা বাজারের বেসনে নির্ভর না করে নিজেরাই ডাল-গুঁড়ো করার ব্যবস্থা রাখেন।

সল্টেড বাদাম বলে যা রাস্তায় বা ট্রেনে বিক্রি হয়, সে সম্বন্ধেও চিন্তার কারণ রয়েছে, কারণ প্রায়ই বাদামের খোলা হাতে ছাড়ানোর জন্য বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে স্বাস্থ্যের উদ্বেগ ঘটানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকতে পারে।

নির্মলেন্দুবাবুদের আদি ব্যবসা ছিল স্বর্ণকারের। এক রবিবার নরেন্দ্রপুরে চন্দ্রদের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বসে এই প্রবীণ মানুষটি পুরনো দিনের অনেক কথা বললেন। বাবা প্রথমে কারিগর ছিলেন, পরে স্যাকরার দোকান করেন, কিন্তু তার সরলতার সুযোগ নিয়ে সেই ব্যবসা নষ্ট করে দেওয়া হয়। টাকার অভাব তখন এমনই যে রেশন দোকানের চাল গম কেনার সঙ্গতি নেই। নির্মলেন্দুবাবুর বাবা বাধ্য হয়ে টালিগঞ্জে ছোট্ট এক কাপড়ের দোকানে কর্মচারীর কাজ নিলেন। ছেলে ইস্কুলে পড়ে, কিন্তু দীর্ঘ দিন কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী। এই সময় তারিণী মুখুজ্যে জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, ছেলের নামে চানাচুরের ব্যবসা করুন। স্কুলে পড়া বন্ধ হলো,

ম্যাট্রিক পাস না করেই পৈত্রিক ব্যবসায় নেমে পড়লেন নির্মলেন্দুবাবু। গোড়ার দিকে ভাঙা সাইকেলে চেপে নির্মলেন্দুবাবু যখন চানাচুর বিভিন্ন পাইকারি বাজারে বিক্রি করতেন তখন লোকে হাসতো। বলতো, ভেতো বাঙালির হাড়ে এতো পরিশ্রম সহ্য হবে না। তখন পাউন্ড দরে চানাচুর বিক্রির জন্য নির্মলেন্দুবাবুকে ছুটতে হতো টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত।

সে যুগের কলকাতায় বাঙালিদের কাছে চানাচুর তেমন প্রিয় ছিল না, জানালেন নির্মলেন্দুবাবু। তাঁর ব্যবসা চলতো পশ্চিমিদের দয়ায়।

একদিন হঠাৎ খেয়াল হলো, টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর কাছে একটা চানাচুরের খুচরো দোকান দিলে কেমন হয়? একজন সহৃদয় পানের দোকানদার নির্মলেন্দুবাবুকে সুযোগ করে দিলেন—শ' আড়াই টাকা দিতে হবে শুরুতে এবং দিনে এক টাকা ভাড়া। নির্মলেন্দুবাবুর বেশ মনে আছে, প্রথম দিনে ১৭ টাকার মাল তৈরি হয়েছিল। তখন পাইকিরি বাজারে চানাচুরের বারো আনা পাউন্ড। প্রতিযোগিতার চাপে পড়ে প্রায়ই দশ আনাতে বিক্রি করতে হতো।

এই সময় চন্দ্রমশায়ের ইচ্ছা হলো চানাচুরে বাঙালি স্বাদ অথবা 'টেস্ট' আনলে বিক্রির পরিমাণ বাড়াতে পারে, সেই সময়ে দিল্লি গিয়ে বিভিন্ন বৈষ্ণব হোটেলে খেয়ে ওঁর মাথা খুলে গেলো। মশলার গুণে নিরিমিষ হোটেলের বিভিন্ন পদে যেন মাংসের টেস্ট!

কলকাতায় ফিরে এসে নির্মলেন্দুবাবু চানাচুরের নতুন ফর্মুলা উদ্ভাবন করলেন বেশ কয়েক রকম মশলার সংমিশ্রণে। সেই সব মশলা ফর্মুলা এখনও ব্যবহার হচ্ছে। আজও যে মুখরোচক তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে প্রতিযোগিতায় এতো এগিয়ে আছে তার পিছনে রয়েছে এই জটিল মশলামাহাত্ম্য, যার মধ্যে রয়েছে জোয়ান, লবঙ্গ, জিরে, দারুচিনি, পিপুল, বিশেষ ধরনের লঙ্কা, শুকনো আদা, হিং এবং আরও ডজনকয়েক উপাদান। মশলার মিশ্রণ পর্বে তা জিভে দিয়ে সারা জীবন টেস্ট করেছেন নির্মলেন্দুবাবু, এখন এই গোপন গুরু দায়িত্ব পালন করেন তাঁর ছেলে প্রণবচন্দ্র। এই কাজটা কারও ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে, শুধু কলকাতায় দশ হাজার দোকান থেকে চানাচুর বিক্রি হয়

এবং সেখানে মুখরোচক সবার ওপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

নির্মলেন্দুবাবুর খরিদ্দারভাগ্য এবং শুভানুধ্যায়ীভাগ্য ভাল—অনেক নামী লোক বিনা অনুরোধে সস্নেহে তাঁর উপকার করেছেন, এঁর মধ্যে ছিলেন সেকালের কয়েকজন চিত্রতারকা এবং সঙ্গীতবিদ। টালিগঞ্জ চলচ্চিত্র স্টুডিও থেকে বেরুবার সময় এঁদের অনেকেই তাঁর দোকানে ঢুঁ মারতেন, যদিও দোকানের আকার নিতান্তই ছোট।

'মুখরোচক' নামটি অনবদ্য। এটিও এক নাম-না-জানা নিয়মিত খরিদ্দারের প্রীতি উপহার। ব্যবসায়ের প্রারম্ভে একদিন দোকানে এসে তিনি নিজেই নাম দিয়ে চলে গেলেন, যাবার আগে বললেন, নাম শুনলেই লোকের আগ্রহ বাড়বে।

নির্মলেন্দুবাবুর ধারণা, এই ভদ্রলোক কোনও একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। হঠাৎ কী করে নামটা তাঁর মাথায় এলো কে জানে?

নির্মলেন্দুবাবুর গল্প আমার মুখে শোনবার পরে একজন বিদগ্ধ গবেষক জানালেন, মুখরোচক শব্দটির সঙ্গে সেকালের বিখ্যাত গল্পকার কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি জড়িত আছে।

কেদারবাবু সরকারি কাজে এই শতাব্দীর গোড়ায় চীনে যাচ্ছিলেন। কলকাতা থেকে জাহাজে যাত্রা। জাহাজঘাটে বন্ধুরা বিদায় জানাতে এসে দেখলেন কেদারবাবুর সঙ্গে বিস্কুটের টিন। তাঁরা রসিকতা করলেন, মনে হচ্ছে তোমার আশঙ্কা চীন এমন এক জায়গা যেখানে বিস্কুটও পাওয়া যায় না! কেদারনাথ উত্তর দিলেন, আমার বিস্কুটের টিনে আরও মুখরোচক কিছু আছে। বন্ধুরা আন্দাজ করলেন, তা হলে নিশ্চয় চানাচুর অথবা ডালমুট। এ জিনিস চীনে না-পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কেদারবাবু ইঙ্গিত করলেন, চানাচুরের থেকেও মুখরোচক কিছু ওই টিনে আছে! সবার থেকে মুখরোচক তো পরচর্চা পরনিন্দা! বাঙালি তো সে বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এই গল্পের শেষে একটু বিস্ময় আছে। শেষপর্যন্ত কেদারবাবুর কৌটা খুলে দেখা গেলো তার মধ্যে বিশুদ্ধ মাটি। সবাই বললো, চীনে কি মাটিও নেই? তখন বন্ধুদের শেষ মন্তব্য : ওখানে তো চীনেমাটি বা চায়না-ক্লে, সে তো বাসন তৈরির কাজে লাগে। কেদারবাবুর চীনযাত্রী বইটা সম্প্রতি

পড়লাম, বাংলায় বিদেশ ভ্রমণসাহিত্যে একটি স্মরণীয় দান, কয়েক জায়গায় দেখলাম, বাঙালি যাত্রীরা শৌচকার্যে অর্থাৎ হাতে-মাটি করার জন্য সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ মাটি নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই গল্পটি উদ্ধারে সমর্থ হলাম না।

নির্মলেন্দুবাবুর সামান্য প্রচেষ্টা তাঁর নিষ্ঠা, সাধনা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে এখন বৃহত্তর রূপ ধারণ করেছে। আধুনিক কারখানা হয়েছে, উৎপাদন বেড়েছে, এমনকি এক্সপোর্টও শুরু হয়েছে। ছেলে প্রণবচন্দ্র নানা নতুন বিস্তৃতির পরিকল্পনা করছেন, কারণ প্যাকেট-মোড়া চানাচুরের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই করার আছে, বহুরকম সরকারি বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও।

প্রতিষ্ঠাতা নির্মলেন্দুবাবু অবশ্য বিত্তসাধনা থেকে নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছেন। কমবয়সে ইস্কুল ছেড়ে চলে আসার দুঃখ এখনও তিনি ভুলতে পারেননি, তাই পড়াশোনায় বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করেন। নির্মলেন্দুবাবুর আরও আনন্দ, এই চানাচুর লাইনে অনেক বাঙালির ছেলে সীমিত বিত্ত নিয়ে করে খাচ্ছে। তারা যদি খরিদ্দারকে না ঠকায়, যদি কোয়ালিটির হেরফের না করে, তা হলে ব্যবসায়ে উন্নতি হবেই।

নির্মলেন্দুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারি তারিণী মুখুজ্যে জ্যোতিষী ভবিষ্যৎ দেখতে ভুল করেননি। আর নির্মলেন্দুবাবু বললেন, "বহু ভাগ্য করে এসেছিলাম, কিছু মানুষকে আনন্দ দিতে পেরেছি এবং সেই সঙ্গে দুটো পয়সাও করতে পেরেছি। সেই সঙ্গে বাড়তি লাভ, মুখরোচক বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। মুখরোচক মানেই যে চানাচুর এটা বাঙালিদের মাথায় ঢুকে গিয়েছে।"

নির্মলেন্দুবাবু তাঁর ছেলেকে কি ব্যবসায়িক উপদেশ দিয়েছেন জানতে চাইছেন ব্যান্ডোদা। আমি বললাম, "প্রণবকে তিনি স্বধর্মে থাকতে বলেছেন, এক কাঁড়ি প্রোডাক্টে নামতে বারণ করেছেন। নির্মলেন্দুবাবু বলেছেন, চানাচুরেই আমাদের মুক্তি, চানাচুরেই আমাদের মোক্ষ!"

"এর নামই কোর-কমপেটেন্স," উৎফুল্ল ব্যান্ডোদা বলে উঠলেন। "যে ব্যবসায়ের হাড়হদ্দ তুমি জানো কেবল তাতেই দেহমন সঁপে দাও। এই যে নকুড়চন্দ্র নন্দী কেবল সন্দেশেই থাকতে চায়, নোনতাতে তাঁদের কোনও

মাথাব্যথা নেই, এর গভীর তাৎপর্য আছে।"

ব্যান্ডোদার শেষ কথাতেও যেন কচুরি সিঙাড়ার স্রষ্টাদের প্রতি একটু অবিশ্বাসের ভাব। স্বামী বিবেকানন্দ হয়তো ভীষণ সিরিয়াসলি কলকাতার ময়রাদের নিন্দে করেননি, কিন্তু সে কথা কেমন করে বোঝাবো ব্যান্ডোদাকে?

গম্ভীরভাবে বসে আছেন তিনি, জানতে চাইছেন, বিবেকানন্দের ময়রাসংক্রান্ত লেখাটার ইংরিজি অনুবাদ পাওয়া যায় কি না?

শেষপর্যন্ত বিবেকানন্দ-বিশারদ শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে ফোন করতে হলো। শঙ্করীপ্রসাদ গবেষক, কিন্তু ভক্ত মানুষ, অনুসন্ধানের নামে প্রাতঃস্মরণীয়দের ছিদ্র খুঁজে বার করতে হবে এই থিয়োরিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। তেলেভাজা ঘিয়েভাজা সম্পর্কে ওঁর সরল উত্তর : "স্বামীজি যদি বারণ করে থাকেন তা হলে কচুরি সিঙাড়া বর্জন করাই তো বাঙালির পক্ষে ভাল।"

"দাদা, আমি বিরুদ্ধমত সংগ্রহের চেষ্টা করছি, যাতে ব্যান্ডোদার নোনতা প্রোজেক্টটা রক্ষে হয়, বিদেশি ফাউন্ডেশনের কাছে অনুদানের দাবি করে আমরা দেখাতে পারি ইন্ডিয়ান নোনতা সম্পর্কে বিপুল গবেষণা প্রয়োজন।"

অ্যান্টি-বিবেকানন্দ কোনও কাজ যাতে না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য শেষপর্যন্ত হাওড়ায় হুটকো হালদারকে খোঁজ করতে হলো। ঠাকুর-স্বামীজির জীবনের অসংখ্য মুখরোচক সংবাদের চলমান বিশ্বকোষ এই হুটকোদা।

"নোনতার ফেভারে তুই কয়েকটা পয়েন্ট চাস এই তো?" মৃদু হেসে স্থিতধী হুটকোদা ভাবতে লাগলেন।

এ বিষয়ে সংগৃহীত সংবাদগুলো যথাসময়ে নিবেদন করলাম ব্যান্ডোদার সামনে : বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ একটু বেশি খেতে পারতেন। একবার তাঁর অসুস্থ শরীর। খবরাখবর নিতে গিয়ে বিবেকানন্দ শুনলেন, রোগীর পথ্য হিসেবে তাঁর এই সুযোগ্য গুরুভাইটি আধসের কচুরি এবং সেই অনুযায়ী তরকারি খেয়েছেন, সেই সঙ্গে মাত্র একসের রাবড়ি। ব্যাপারটা শুনে বিবেকানন্দ রাগ তো করলেনই না বরং তারিফ করে বললেন, "শালা তোর স্টম্যাকটা দে দেখি—দুনিয়ার চেহারাটা একেবারে বদলে দি!"

কচুরির ওপর প্রচণ্ড রাগ থাকলে স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চয় এই কথা বলতেন না।

স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দপর্বে স্পষ্ট জানা আছে, একদিন মেসে বসে তিনি কচুরি খাচ্ছিলেন। পুলিনবিহারী মিত্রকে দেখে তিনি কচুরির ভাগ দিলেন। কিন্তু কচুরি এতোই ভাল লেগেছে যে পরমুহূর্তে বিবেকানন্দ বললেন, "এইটে থেকে আর একটু দে না!" এখানে তো কচুরীপ্রেমী বিবেকানন্দকেই পাচ্ছি আমরা।

নরেন্দ্রনাথ দত্তর প্রাক-সন্ন্যাসপর্বে কলকাতার সিমলা অঞ্চলে জনৈক পরমহংসের কচুরির দোকানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। বন্ধু রাখালের জন্যে (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) এই দোকান থেকে খাবার আসতো। রাখাল যখন খাচ্ছেন নরেন সে সময়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন তা ভাববার কারণ আছে কি?

১৮৮৬ সালে নরেন্দ্রনাথের মেজোভাই মহেন্দ্রনাথ তাঁর দাদাকে ডাকতে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যান। তখন শশী (পরে রামকৃষ্ণানন্দ) বিখ্যাত ফাগুর দোকান থেকে গরম লুচি, গুটকে কচুরি এবং আলু ছেঁচকি নরেন ও মহিমকে দেন। এর বিস্তারিত বিবরণ তো আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে।

"শুধু ইন্ডিয়া নয়, লন্ডনেও স্পেশাল কেস রয়েছে, ব্যান্ডোদা," আমি সবিনয়ে নিবেদন করলাম। "বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ড এসে ভাই মহেন্দ্রর সঙ্গে লন্ডনে স্বামীজির দেখা হয়ে গেলো। সেবার স্বামীজি বেসমেন্টের ঘরে নেমে এসে, মাখন গলিয়ে ঘি করে খানকতক আলুপুর দেওয়া কচুরি বানালেন। সেই সঙ্গে বেশ ঝালঝাল চচ্চড়ি। তারপর ডাইনিং রুমে এসে সবাই মিলে তার সদ্ব্যবহার হলো। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ কচুরি শুধু ভালবাসতেন না, নিজে কচুরি ভাজতেও অদ্বিতীয় ছিলেন!"

ব্যান্ডোদা আবার যেন তাঁর পুরনো উৎসাহ ফিরে পাচ্ছেন। "তা হলে ওঁর বইতে কচুরি-সিঙাড়ার লিখিত নিন্দা একটা কথার কথা!"

"মনে হয় তাঁর কিছু বাণী ও রচনা প্রিয়বন্ধু রাখাল মহারাজের নজরে যাতে পড়ে তার জন্যে লেখা—ইনি তো যৌবনে কুস্তি লড়ার পরে প্রতিদিন

আধসের কচুরি এবং সেইসঙ্গে বিপুল পরিমাণে আলু ছেঁচকি সানন্দে ভোজন করতেন। তখন একসের কচুরির দাম ছ'আনা। তরকারি ফ্রি।"

গোপন খবরগুলো সংগ্রহ করতে পেরে খুশি হলেন ব্যান্ডোদা। তখন বললাম, "ব্যান্ডোদা আরও বড় খবর আছে। মহাপুরুষ মানুষ—কোন দুঃখে লুচি পুরি কচুরি এবং বিভিন্ন নোনতার সুখ থেকে তিনি অভাগা বাঙালিকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করতে যাবেন? জানেন তো কিছু বাঙালির স্বভাব! স্বয়ং স্বামীজি বারণ করে গেছেন শুনলে, লুচি পুরি রাধাবল্লভীর ধারে কাছে যাবে না বংশপরম্পরা ধরে।"

ব্যান্ডোদার সঙ্গে কথা বলছি ঠিক সেই সময় হুটকো হালদার হুড়মুড় করে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। তাঁর চোখেমুখে উত্তেজনা। বললেন, "চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গিয়েছে, ইতিহাসের ওপর নতুন আলোকপাত বলতে পারেন। আপনারা তো জানেন, এদেশের সন্ন্যাসীদের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় রয়েছে। ঠাকুর যেহেতু তোতাপুরীর কাছে বেদান্তসাধনা ও গোপনে সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন এবং গদাধরকে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম সম্ভবত তিনিই দিয়েছিলেন, সেইহেতু তাঁর ত্যাগী সন্ন্যাসীসন্তানরা নিজেদের 'পুরী' সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করতেন।"

হুটকো হালদার বললেন, "ভীষণ ব্যাপার মশাই! পরিব্রাজক রূপে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যখন ভারতবর্ষ চষে বেড়াচ্ছেন তখন কয়েকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত—পুরী? গিরি? বিবেকানন্দ একমুহূর্ত দ্বিধা না করে উত্তর দিলেন : কচুরি সম্প্রদায়ভুক্ত! হয়তো এটা ব্যঙ্গ করে রসিকতা করে বলেছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রতিষ্ঠাতার শ্রীমুখে এইটাই অফিসিয়াল পলিসি স্টেটমেন্ট হয়ে রইলো। কারণ পরবর্তী কোনও সময়ে এর প্রতিবাদ বা সংশোধন করা হয়নি।"

ব্যান্ডোদা আনন্দে আত্মহারা। কচুরি প্রেমিকদের কাছে এর থেকে মূল্যবান খবর আর কী হতে পারে?

হুটকো হালদারকে ব্যান্ডেদা সহস্র ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, "চলুন একদিন শ্রীহরি মিষ্টান্ন, অথবা বালিগঞ্জের মুখার্জি সুইট্‌সে, অথবা বেকবাগানের মিঠাইতে।"

তারপর আলোচনা চললো অনেকক্ষণ ধরে। ব্যান্ডোদা বললেন, "তা হলে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সন্ন্যাসীদের আমরা বিবেকানন্দর প্রকাশ্য পলিসি স্টেটমেন্ট অনুযায়ী পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত না বলে কচুরি সম্প্রদায়ভুক্ত বলতে পারি।"

সাবধানী হুটকো হালদারমশাই ততোটা উৎসাহী হলেন না। বললেন, "ওটা স্বামীজির রঙ্গরসিকতা! কর্তা আর তাঁর একনম্বর চেলা দু'জনেই ছিলেন রসরসিকতার অমৃতভাণ্ডার।"

"তা হলে স্বামীজির তিরোধানের পর কচুরি সম্পর্ক মঠ-মিশনের সুচিন্তিত নীতি কী?"

হুটকো হালদার সবিনয়ে বললেন, "আর একটা প্রমাণ নিবেদন করছি। গুরুভাই তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) ১৯২৩ সালের মে মাসে বারাণসী থেকে এক চিঠিতে লাটু মহারাজের তিরোধানের পরে ভাণ্ডারার হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা দিচ্ছেন। নশো টাকা খরচ করে পাঁচশো সাধুকে ভোজন করানো হলো। সেদিনের মেনুতে ছিল, খাস্তার লুচি, কচুরি, জিলিপি এটসেটরা। এ ছাড়াও এক হাজার লোককে খাওয়ানো হলো, পুরি এবং তরকারি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, পুরি, কচুরি, রাধাবল্লভী থেকে ঠাকুরের মানসপুত্র এবং কন্যাদের দূরে সরে আসার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।"

এবার ব্যান্ডোদাকে বড় খবর দিলাম। "অ্যাকর্ডিং টু হুটকো হালদার, স্বামীজির শেষ জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছিল যা প্রমাণ করে তেলেভাজা অথবা চানাচুর ভাজা কিছুর ওপরেই তাঁর বিন্দুমাত্র বিরাগ ছিল না।"

স্বামীজির শেষ জীবনের শেষ পর্বের কথা। বেলুড়ের মঠে বসে বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ একদিন প্রকাশ্যে পাড়ার ফুলুরিওয়ালা হতে চাইলেন। উনুন জ্বললো, কড়া বসলো, তেল ঢালা হলো। ফাটানো বেসন গরম তেলে ছেড়ে, পিঁড়িতে বসে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে উঠলেন ফুলুরিওয়ালা নরেন। ছোটবেলায় সিমলে পাড়ায় যেমন দেখেছেন ফুলুরিওয়ালাকে। বেলুড়ের মাঠে হাঁক ছেড়ে খদ্দের ডেকে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ মহা আনন্দ পেতে লাগলেন।

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন ব্যান্ডোদা, "এতো জব্বর খবর! খোঁজ করে

দ্যাখ, কোথাও হয়তো বাংলার ময়রাদেরও তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করে গিয়েছেন। উনি না চাইলে ফাগুয়ার গুটকে কচুরির দোকান কি এমন ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেতো? এ-এক অদ্ভুত দেশ, ওরে মুখুজ্যে। এখানে একজন পরমহংস নিজেই ময়রা হলেন এবং একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ শখ করে ফুলুরির দোকান দিলেন। তবেই না এই দেশ বাংলাদেশ হয়েছে। ধন্য মা তুমি, বঙ্গজননী। স্নেহে অন্ধ হয়ে, আদর দিয়ে দিয়ে, কচুরি সিঙাড়া অঢেল খাইয়ে খাইয়ে বিশকোটি সন্তানকে রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি!"

এদেশ থেকে ব্যান্ডোদার বিদায়ের সময় আর দূরবর্তী নয়। আজ মাঝরাতেই ব্যান্ডোদার প্লেন দমদম থেকে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টের দিকে উড়ে যাবে, ওখান থেকে আর এক বিমানে আটলান্টিক পেরিয়ে মার্কিন দেশ।

অধ্যাপক রায় বললেন, "চরকসংহিতায় লবণরসের বিশ্লেষণ রয়েছে। মুখে প্রদানমাত্র সত্বর লয়প্রাপ্ত হয়, মুখ জ্বালা করতে থাকে, ক্লেদ নির্গত হয় তাকে লবণরস বলে। জল ও অগ্নিগুণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, কিন্তু লবণরস সমস্ত রস অপেক্ষা লঘু, অত্যধিক সেবনে পিত্তকোপ ও গাত্রদাহ, এবং সেই সঙ্গে কেশের পক্বতা ও টাক।"

ব্যান্ডোদা আমাকে ও অধ্যাপক সর্বদমন রায়কে নিরুৎসাহ করলেন না। যাবার আগে বললেন, "নোনতা সম্বন্ধে আপনারা দু'জনে ইতিমধ্যেই যা খবর সংগ্রহ করেছেন তা সায়েবদের কোনও সংগ্রহে নেই। এই অনুসন্ধান আমাদের চালিয়ে যেতে হবে বিপুলবিক্রমে, কারণ খোলা থেকে নোলার দুর্গম দূরত্বটি পৃথিবীর আর কোনও জাত বাঙালির মতন আয়ত্ত করতে পারেনি বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। শুধু আমাদের মন স্থির করতে হবে মিষ্টি এবং নোনতা এ দুটো বিষয় আলাদা রাখবো, না দু'টি রস সম্বন্ধেই আমাদের অনুসন্ধান চলবে একই সঙ্গে।"

ঝোলে ঝালে অম্বলে

"গ্রেট সুখবর!" সাত সকালেই আমার টেলিফোন ঝন ঝন করে বেজে উঠেছে। ইলেকট্রনিক দূরভাষ যন্ত্রের অপর প্রান্তে রয়েছেন স্বয়ং ব্যান্ডোদা। ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিল্‌স-এ এখন সন্ধ্যা সাতটা। অনাবাসী ভারতীয় আমাদের প্রিয় ব্যান্ডোদা যে এখন আমেরিকায় পসার জমিয়ে বসেছেন তা তো এই বইয়ের পাঠকদের অজানা নয়।

টেলিফোনে দু'বার মাত্র হ্যালো-হ্যালো করেছি, তার জন্যেই বকুনি খেলাম ব্যান্ডোদার কাছে। "ওরে, এখন এ টি অ্যান্ড টি এবং বিশ্বায়নের যুগ, এখন আর নাইনটিনথ্‌ সেঞ্চুরির আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের মতন হ্যালো হ্যালো করে হাঁপাতে হয় না। এখন ফিস ফিস করে কথা বললেই দুনিয়ার সব জায়গায় স্পষ্ট শোনা যায়।"

শ্রদ্ধেয় ব্যান্ডোদাকে একজন সম্মানিত বাঙালি হিসেবে মনে করিয়ে দিলাম, নাইনটিনথ্‌ সেঞ্চুরিতে গেরস্ত বাঙালির বাড়িতে বিদ্যুৎও ছিল না, টেলিফোনও ছিল না, যদিও টেলিফোন কোম্পানি এবং ইলেকট্রিক কোম্পানি ঐ শতাব্দীর শেষ পর্বে কলকাতায় দোকান সাজিয়ে বসেছে। টোয়েনটিয়েথ্‌ সেঞ্চুরির শেষ পর্বেও এদেশে ফোন কানে নিয়ে যথেষ্ট

পরিমাণ 'হ্যালোর' ফোড়ন না দিলে এবং শ্রবণযন্ত্রে সজোরে চাঁটি না মারলে কিছুই শোনা যেতো না।

স্নেহময় ব্যান্ডোদা জিজ্ঞেস করলেন, "তোর পিসির কী হলো?"

বোকার মতন আমি ভুল বুঝলাম। "স্যর পি সি রায়ের সম্বন্ধে সম্প্রতি যথাসম্ভব উপাদান সংগ্রহ করেই চলেছি। সামনেই বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিটিউক্যাল কোম্পানি লিমিটেডের শতবার্ষিকী।" কিছু একটা তো করতেই হবে।

"শতবার্ষিকী উৎসবের সময় বস্তাপচা নাম-কেত্তন উৎসবের অভ্যাসটা ছাড়, তোরা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল, মা আমাদের মানুষ করো।" ব্যান্ডোদার মুডটা যে আজ খুব মিঠে নয়, তা তাঁর কথা শুনেই আমি আন্দাজ করতে পারছি।

"আই অ্যাম ভেরি ভেরি স্যরি, ব্যান্ডোদা। আপনি পিসি বলতে পার্সোনাল কমপিউটার বুঝিয়েছেন, আমি প্রথমে ভেবেছি আপনি আমার পিসির কথা জিজ্ঞেস করছেন, পরের মুহূর্তে খেয়াল হলো লাস্ট বার আপনি তো আমার পিসির নিয়মভঙ্গ সেরিমনিতে উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং ইট মাস্ট বি আচার্য পি সি রে।"

ব্যান্ডোদার ভবিষ্যদ্বাণী : "তোরা জাত হিসেবে মরবি। এখনও বাড়িতে পিসি আনলি না, কার্ডে ই-মেল নম্বর ছাপলি না ; আর আমেরিকায় এমন সংসার নেই যেখানে ইন্টারনেট ঢুকে পড়েনি।"

"ব্যান্ডোদা, এইভাবে আমাদের ভাজা-ভাজা করবেন না, আমরা এখন সব বাঙালিকে বঙ্গোপাধ্যায় টাইটেল দিতে চাই ; ক্যালকাটাকে করতে চাই 'কোলকাতা', দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই. আমাদের দেশ, আমাদের শহর নিয়ে আমরা যা খুশি করবো, একেই বলে মুক্তির স্বাদ।"

"তোরা আরও দুটো দল তৈরি কর! সুতানুটি পার্টি আর গোবিন্দপুর পার্টি। জোব চার্নক আদিতে কলকাতায় ল্যান্ড করেছিলেন? না সুতানুটিতে? এই বিষয়ে তোরা চব্বিশ ঘণ্টার বাংলা বন্‌ধ ডাকতে পারিস এবং এরই মধ্যে চুপিচুপি কলকাতায় বাঙালিদের সমস্ত ভদ্রাসন অন্য রাজ্যের ধনীদের কাছে বিক্রি হয়ে যাক।"

"মাই ডিয়ার ব্যান্ডোদা, দূর দেশ থেকে এই ভাবে অভাগা বাঙালিকে মনোকষ্ট দেবেন না। আমি সেকেন্ডহ্যান্ড পিসি অর্ডার দিয়েছি, দাম আর একটু কমলে আমি নিজেই ই-মেল নেবো এবং তখন আপনার সঙ্গে আমার কোনও দূরত্ব থাকবে না।"

শান্ত হয়ে গেলেন মার্কিন দেশের ব্যান্ডোদা। দুঃখ করলেন, "এই আমাদের লাস্ট চান্স রে। কমপিউটারটা বাঙালিদের স্বধর্ম—ওটা আয়ত্ত করে, জন্মসূত্রে পাওয়া অঙ্কের মাথাটা খাটিয়ে দুনিয়াকে টেক্কা দেওয়াটা যে অসম্ভব নয় তা সিলিকন ভ্যালিতে ইন্ডিয়ান এবং চীনেদের দাপট দেখলেই বুঝতে পারবি।"

"ব্যান্ডোদা, সেবার আপনি অনুপ্রেরণা দিলেন, আমরা প্রমাণ করে দিলাম, কলকাতা এখনও বিশ্বের মিষ্টান্ন রাজধানী—সুইটমিট ক্যাপিটাল অব দ্য ওয়ার্ল্ড। পরের বার আপনি কলকাতায় এলেন কচুরি সিঙাড়ার উৎস সন্ধানে। নোনতা খাবারেও আমাদের এই ইন্ডিয়া—দ্যাট ইজ ভারত—-যে কারও কাছে দু'নম্বর ছিল না তার ইঙ্গিত পাওয়া গেলো। তবে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত অনুসন্ধান প্রয়োজন ; এবং এই ধরনের অনুসন্ধান ঠিক মতন করতে যা খরচ তার ধাক্কা সামলাতে সাহেবি ফাউন্ডেশন লাইক ফোর্ড ফাউন্ডেশন অথবা গুগেনহাইম অথবা রকফেলারই পারেন।"

ব্যান্ডোদার উত্তর : "সায়েবরা তো এই সেদিন টাকার মুখ দেখলো, তার আগে আমাদের ইন্ডিয়ায় নানা বিষয়ে বিশাল বিশাল গবেষণা এবং ঢাউস-ঢাউস গ্রন্থ রচনা হয়েছে। সায়েবরা একটা আধলা না ঠেকালেও এশিয়ায় মহাভারত সাইজের বই লেখা হবে।" তারপর সোজাসুজি ষড়রস প্রসঙ্গে চলে এলেন ব্যান্ডোদা। আমি বুঝছি ব্যান্ডোদা ব্যান্ড পাল্টেছেন। তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন, "পৃথিবীতে মিষ্টান্নর ভবিষ্যৎ তেমন ভাল নয় রে।"

"কী বলছেন, ব্যান্ডোদা? মধুর রসের পিছনেই তো আমরা বাঙালিরা যথাসর্বস্ব বিনিয়োগ করেছি। বাংলার নাম পাল্টে গৌড় করবার জন্যেও তো আন্দোলন শুরু হয়েছে। দুনিয়ার সেরা গুড় এই দেশে তৈরি হতো, তাই এই মহান দেশের নাম হয়েছিল গৌড়।"

“একেবারেই বাজে কথা! লোকগুলো বোধহয় গৌরবর্ণ ছিল, তার থেকেই নিশ্চয় গৌড়।” সবকিছু সহজে মেনে নেবার পাত্র নন আমাদের আন্তর্জাতিক পথপ্রদর্শক ও উৎসাহদাতা ব্যান্ডোদা।

“ব্যান্ডোদা, প্লিজ আমাদের গায়ের রঙের কথা তুলে মনে দাগা দেবেন না। জেনে রাখুন, মেগাস্থিনিসের আমলে গোটা ইন্ডিয়ার লোকের রং ছিল ধবধবে ফর্সা। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, বৌদ্ধ আমলে এদেশের মানুষের গায়ের রং বাদামি হয়ে গেলো, অবাধ মিশ্রণ ও সহজবোধ্য বৈবাহিক কারণে। সাদা দুধের মধ্যে কালো কফি পড়লে, অথবা ভাইসি-ভারসা হলে যে রকম পরিবর্তন ঘটে। লিকারের রংটা ব্রাউন হয়ে যায়।”

ব্যান্ডোদা চামড়ার রং নিয়ে মাথা ঘামালেন না। বললেন, “ওরে জেনে রাখ, নতুন সহস্রক বা মিলেনিয়াম এসে গেলো, এবার পীত এবং বাদামি জাতরাই দুনিয়ার সব হাটে নিজেদের লাঠি ঘুরোবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীও বিবেকানন্দর।”

আবার মিষ্টির কথা উঠলো। ব্যান্ডোদা সাবধান করে দিলেন, “তোরা মিঠাই ইনডাসট্রিতে বেশি বিনিয়োগ করিস না, এদেশে যতো মেয়েমদ্দ আছে সবাই নিজেদের ওজন কমাবার জন্যে নাচানাচি করে শরীর ঘামাচ্ছে—পেটে এক ছটাক মেদ জমতে দেবে না। এদেশে ধারণা, মিষ্টি খেলেই ওজন বেড়ে শরীরের টুয়েলভ ও ক্লক বেজে যায়। খবরদার সুগার কোম্পানির শেয়ার কিনবি না!”

“হোয়াট অ্যাবাউট কচুরি সিঙাড়া?” জিজ্ঞেস করি ব্যান্ডোদাকে কাতরভাবে। “ওই সাবজেক্টেও তো অনেক অনুসন্ধানের কাজ পড়ে রয়েছে।”

লবণরসের লাইনেও যে গভীর অন্ধকার তা দুঃখের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন ব্যান্ডোদা। “তেলেভাজা, ঘিয়েভাজার কাছাকাছি যাবে না এদেশের সায়েব-মেমরা। ওরা জেনেছে, এক চামচ তেলে কয়েকশো ক্যালরির রাক্ষস লুকিয়ে রয়েছে!”

“ব্যান্ডোদা, আমরা বাঙালিরা স্নেহপ্রবণ জাত। আমাদের মা-বোন

শাশুড়িরা চিরদিন স্নেহময়ী। আবার তেল-ঘির নামও স্নেহ। আমরা কিছুতেই খ্যাংরা কাঠি মেমসায়েবদের মতন স্নেহহীন হয়ে এই দুনিয়াকে শুষ্কং কাষ্ঠং করতে পারবো না। ক্ষমা করবেন আমাদের।"

"ওসব ওয়ান্স আপন এ টাইম, মুখুজ্যে। এখনকার ইন্ডিয়ান বউমাদের নাম হচ্ছে সুতনুকা, তনিমা, তনুশ্রী। এরা আরও তন্বী হতে চাইছে।" বেশ জোরের সঙ্গেই জানালেন ব্যাডোদা।

আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই। "ব্যাডোদা, গাঁজার কলকের মতন সরু লম্বা চেহারার মেয়েদের আমরা হাওড়ায় এখনও ছিলিম বলি, কথাটা যে 'স্লিম' থেকে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই।"

ব্যাডোদা আমার সঙ্গে একমত হলেন না। শেষবারে ইন্ডিয়াতে এসে ফেরবার পথে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স মর্নিং ফ্লাইটে তিনি কলকাতা থেকে বোম্বাই গিয়েছিলেন। বিমানসেবিকা তাঁকে চুপি চুপি বলেছে, সারা বিশ্বের মধ্যে মাখনের বৃহত্তম অপচয় এদেশেই হয়—আড়াইশো প্যাসেঞ্জারের মধ্যে দুশো পঁচিশজন যাত্রী মাখনের ঝকঝকে প্যাকেটকে আমূল বর্জন করেন!

মানে, কমবয়সী ফিগারসচেতন রুমকি ঝুমকিরা শুধু নয়, মধ্যবয়সী বোস ঘোষ প্যাটেল ধাওয়ানরাও সায়েবদের মায়ামোহে পড়ে ক্রমশ ভাজাভুজি থেকে দূরে সরে আসবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং ক্রমশ আরও দূরত্ব সৃষ্টি হবে।

"ডিয়ার ব্যাডোদা, ফোন তুলেই আপনি বললেন, গ্রেট সুখবর। অথচ আমি তো দেখছি, সবই খারাপ খবর। আমার ডাক্তারবন্ধুর বোন বিলেতে পিঁয়াজির দোকান করবার আগে এদেশে ব্যবসায়িক সমীক্ষায় আসবে বলছিল। বেচারা তো ধনে-প্রাণে মারা পড়বে।"

টেলিফোনে বকুনি লাগালেন ব্যাডোদা। "তুই বড় অধৈর্য হয়ে পড়িস। তোদের মতন নার্ভাস লোক দিয়ে বাঙালিদের কস্মিনকালেও কোনও উন্নতি হবে না। ব্যাপারটা শোন ভাল করে। কচুরি সিঙাড়া জিলিপির যুগ পশ্চিমে সহজে আসছে না। কিন্তু পিঁয়াজির ব্যাপারটা আলাদা। ড্রিংকের

সঙ্গে গোল্ডেন-ব্রাউন পিঁয়াজির স্বাদ বিদগ্ধ সায়েবরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছেন।"

"পিঁয়াজি কথাটা সায়েবরা উচ্চারণ করতে পারছে, ব্যান্ডোদা?" গভীর আশঙ্কা মনে পুষে রেখে আমি জানতে চাই।

"নোলা দিয়ে জল গড়ালে প্রাণের দায়ে এযুগের আয়েসী সায়েবরা সব উচ্চারণ করতে রাজি। ওই যে ইন্ডিয়াতে স্কুটার তৈরি করে ইটালিয়ান কোম্পানি—পিয়াজিও, ওই নামটা পিঁয়াজির বদলে উচ্চারণ করছে।"

গোপন খবরটা এবার বলেই ফেললাম ব্যান্ডোদাকে। উচ্চারণ প্রমাদ থেকে সায়েবদের রক্ষে করবার জন্যে ভাষাতত্ত্ববিদ প্রফেসর সর্বদমন রায়কে লাগিয়েছিলাম। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে আমার বন্ধুর বোনের পিঁয়াজি কোম্পানির ব্র্যান্ডনেম ঠিক করে দিয়েছেন— ওনিওনি।

ব্যাখ্যা চাইলেন ব্যান্ডোদা। "খুবই সহজ ব্যাপার—পিঁয়াজ ইজিকলটু ওনিওন—বেগুন থেকে যেমন বেগুনি, তেমনি ওনিওনি। ঝটিতি রেজিস্ট্রি করে নিচ্ছে আমার বন্ধুর বোন—বিদেশে নামকরা ব্র্যান্ড হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁরে, 'ব্র্যান্ড' শব্দটার বাংলা নেই বুঝি? নামটার গোড়াতেই তোদের গলদ। তোরা বিদেশে ব্র্যান্ড বিল্ডিং করবি কী করে?"

"ব্যান্ডোদা, প্রফেসর সর্বদমন রায়কে আমি চ্যালেঞ্জটা দিয়েছিলাম, উনি তিন দিন সময় নিয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই এসে আমাকে বললেন, আনন্দমার্গের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাতা প্রভাতরঞ্জন সরকার আনন্দমূর্তিজি ব্র্যান্ডের চমৎকার বাংলা করে দিয়েছেন— 'কেতন।' অতি যোগ্য নাম, কিন্তু পতাকার মতন এই কেতন তুমি ওড়াতে পারো। কিন্তু নামটা এখনও তেমন চালু হয়নি।"

খবরটা পেয়ে খুব খুশি হলেন ব্যান্ডোদা। "আমার বন্ধু, কেলগের মার্কেটিং প্রফেসর অজয় বসুমিত্রকে খবরটা দিতে হবে।"

"বসুমিত্র! ব্যান্ডোদা, ওঁকে বলবেন না, প্রভাতরঞ্জনের মতে বসুমিত্র কথাটির আদি অর্থ ছুঁচো। মাটির গর্তে থাকে তাই এই নাম।"

আরও খুশি হলেন ব্যান্ডোদা। "ওরা আমেরিকান সিটিজেন, ব্যাপারটা স্পোর্টিং স্পিরিটে নেবে। হ্যাঁরে অজয়ের বউ ছিল প্রামাণিক। ওই নাম

নিয়ে কোনও রিসার্চ আছে?”

“অবশ্যই আছে। তবে আমার নয়। এগেন পি আর সরকার রিসার্চ! নপ্ত শব্দ থেকে এসেছে নাপিত। প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণের পরেই ছিল নাপিতের স্থান—বিধিবিধানের জন্যে বাউনকে হাতের গোড়ায় না পাওয়া গেলে সোজা চলে যাও নাপিতের কাছে—তাই প্রামাণিক।”

আরও খুশি হলেন ব্যান্ডোদা। তারপর ফিরলেন পিঁয়াজ প্রসঙ্গে। সায়েবরা যে শীঘ্রই পিঁয়াজিপ্রেমী হয়ে উঠবে সে সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ নেই। তবে পেঁয়াজ রসুন সম্বন্ধে চিরন্তন ভারতবর্ষের মানসিকতা কি তা জানতে তিনি বিশেষ আগ্রহী। এবিষয়ে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমি শুধু জানি, প্রাচীন ভারতে পিঁয়াজ আমাদের পূর্বপুরুষদের তেমন মনোহরণ করতে পারেনি।

“খোঁজখবর নে, আমি মিনিট পনেরো পরে আবার তোকে ফোন করছি”, এই বলে ফোন নামিয়ে রাখলেন ব্যান্ডোদা। আর আমি ভাবতে লাগলাম, কালে কালে হলো কি! কোথায় আমেরিকা আর কোথায় ইন্ডিয়া—কিন্তু ফোনের বোতাম টেপামাত্র হৃদয় আজি মোর কেমনে গেলো খুলি, জগৎ আসি সেথা করেছে কোলাকুলি।

আমি এবার অধ্যাপক সর্বদমন রায়ের সঙ্গে স্থানীয় টেলিফোনে কিছু কথা বললাম।

“প্রফেসর রায়, আপনি রেডি হয়ে থাকুন। ব্যান্ডোদার মতিগতি ভাল মনে হলো না! যেভাবে টেলিফোনে পিঁয়াজ রসুন সম্বন্ধে এনকোয়ারি করছেন, তাতে কোনও একটা কঠিন বিষয়ের স্পেশাল রিসার্চে আমাদের জড়ালেন বলে।”

সর্বদমনবাবু সিরিয়াস রিসার্চে সারাজীবন জড়িয়ে থেকেছেন। ফলে আমাদের সঙ্গে কাজ করে তিনি যে মজা পান তা সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে জানিয়ে দিলেন।

“প্রফেসর রায়, কাজের মধ্যে এই মজাটাই তো সব। এই জন্যেই তো আমেরিকান ডলারে মিলিয়নেয়ার এবং এদেশের টাকায় বিলিয়নেয়ার

হয়েও ব্যাণ্ডোদা এই সব স্পেশাল অনুসন্ধান চালিয়ে যান।"

একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে প্রফেসর রায়ের। আমি বললাম, "সর্বদমন বাবু, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। আমেরিকায় কুড়ি মিলিয়ন জমাতে পারলেই, ইন্ডিয়ান রুপির হিসেবে আপনি শত কোটিপতি হয়ে গেলেন। বিলিয়নেয়ার হিসেবে তখন আপনার মাথায় অবশ্যই নানা রকম স্পেশাল খেয়াল জাগতে পারে।"

পিঁয়াজ রসুন একেবারেই পছন্দ করেন না প্রফেসর রায়। তবু জানালেন, "ব্যাণ্ডোবাবুকে বলবেন, এ দুটোতেই দুর্গন্ধ—এসেছিল গান্ধারীর দেশ আফগানিস্থান থেকে। ১৭০০ বি সি-তে পেটুক গ্রীকরা রসুন আমদানি করতো ইন্ডিয়া থেকে। পিঁয়াজের নাম ছিল পলাণ্ডু। যার থেকে পোলাও শব্দটা এসেছে। নবাবী আমলে পিঁয়াজ জাতে উঠেছে।"

"ম্লেচ্ছ ও যবনদের প্রিয় বলে পিঁয়াজকে অবজ্ঞা করা যাবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সাধনভজনে পিঁয়াজ নিষিদ্ধ। আনন্দোৎসবেও পিঁয়াজ বারণ। স্বামী বিবেকানন্দকে লন্ডনের সায়েব ভক্তরা সেবার জিজ্ঞেস করলেন, পিঁয়াজ খাওয়া চলবে কি না? সাধনকালে পিঁয়াজ খেতে বারণ করলেন বিবেকানন্দ, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দিলেন, কম বয়সে তিনি নিজে প্রচুর কাঁচা পেঁয়াজ খেতেন। মুখের গন্ধ দূর করবার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে তিনি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন।"

ঘড়ির কাঁটা ধরে আবার সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে ফোন এলো ব্যাণ্ডোদার।

"হ্যালো ব্যাণ্ডোদা। ব্যাড্ নিউজ। প্রফেসর রায় ঋগ্‌বেদের ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮২৬টি পদ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন—একবারও পিঁয়াজের উল্লেখ নেই, যদিও গোরুর উল্লেখ আছে অন্তত সাতশোবার।"

"তোর ফিগার নির্ভরযোগ্য?" অনুসন্ধানী ব্যাণ্ডোদার তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

"কী বলছেন! প্রফেসর রায় বাড়িতে পিসি বসিয়েছেন। হিসেব করে ফেলেছেন ১০২৮টা সূক্ত আছে ঋগ্‌বেদে। প্রতিটি সূক্তের আবার আটটা

খণ্ড।”

“সাম্‌বেদে নিশ্চয় পেঁয়াজকে পাওয়া যাবে,” সাজেশন দিলেন ব্যান্ডোদা।

“স্যরি ব্যান্ডোদা। ওই বেদে তো স্রেফ কবিতা—১৫৪৭টা স্তবক আছে, অ্যাকর্ডিং টু সর্বদমন রায়। প্রায় সবই ঋগ্‌বেদের পুনরাবৃত্তি, ৭৫টি স্তবক ছাড়া। ওখানে কেন, পরবর্তীকালের উপনিষদেও কান্দাহারি পেঁয়াজকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।”

“সেকালে ইন্ডিয়া ভীষণ রক্ষণশীল ছিল। তবে তোকে পূর্বপুরুষদের নিন্দে নিজের মুখে করতে হবে না।”

“দুধ মুড়ি চিড়ে এই সবই বোধ হয় শ্রদ্ধেয় আর্যদের প্রিয় খাদ্য ছিল, ব্যান্ডোদা।”

“মুড়ি এবং খই সম্বন্ধে একটা রিসার্চ পেপার এখানকার সায়েবরা তৈরি করেছে। খইয়ের তখন নাম ছিল ‘লাজ’—এই লাজই বিয়ের কনে আগুনে ফেলতো, যার থেকে লাজবন্তী কথাটার উৎপত্তি। আর চ্যাপ্টা বলে চিড়ের নাম চিপিট, এটাও বইতে দেখলাম।”

“ওর আর একটা নাম প্রফেসর রায় প্রায়ই বলেন—পৃথুক। বইতে মুড়ির পোশাকী নামটি চমৎকার ঢাণ্ডিঢাক। আর এক নাম হুড়ুম্ব—সংস্কৃত বলে মনে হয় না।”

“প্রফেসর রায়ের মাথা খারাপ। আমাকে লিখেছেন, স্যুপ এবং জুস দুটি শব্দই নাকি আবহমান ভারতের নিজস্ব অবদান। ডাল দিয়ে যে তরল স্যুপ তৈরি হতো, তার নাম স্যুপ অথবা জুস। আর রাঁধুনিকে যে সূপকার বলা হতো তা বাংলা অভিধানেও বেশ কয়েকবার দেখেছি! সস্‌ শব্দটিও নাকি ইন্ডিয়ান। আচার্য সর্বদমন রায়ের হাতে পড়লে, দুনিয়ার সব খাদ্যদ্রব্যই ইন্ডিয়ান হয়ে যাবে।”

“ও কথা ওঁকে বলবেন না, ব্যান্ডোদা। ভীষণ সেন্টিমেন্টাল ভাষাবিদ। আমি ওই ধরনের ইঙ্গিত দিতে তিনি ফোঁস করে উঠলেন। বললেন, কই আমি তো বলিনি কাবলি ছোলা আমাদের, যদিও সংস্কৃতে এর নাম পাওয়া যাচ্ছে ওলিসন্দগ। কিন্তু এটি এসেছে প্রাচীন কালের আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চল থেকে।”

ব্যান্ডোদার খেয়াল থাকে না যে আন্তর্জাতিক টেলিফোনের বিল চড় চড় করে উঠে যায়। এইবার আমার দিক থেকে বিনীত অনুরোধ, "আর, সাসপেন্সে রাখবেন না ব্যান্ডোদা, সমবয়সী হলে বলতাম এবার ঝেড়ে কাশুন!"

ব্যান্ডোদা জানালেন, "গতকালই লন্ডন থেকে ফিরেছি। গ্রেট সুখবর—বিলিতি সায়েবরা তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাতীয় ডিশ নির্বাচন করেছে!"

"নিশ্চয় ফিশ অ্যান্ড চিপ—আলু-মাছ ভাজা। জাতটা আর কিছু জানে না। আঙুল সাইজ ছাড়া আলুও কাটতে শেখেনি, অথচ আমার মা গরিব ঘরের মেয়ে হয়েও অন্তত বাইশ রকমভাবে আলু কাটতে জানতেন। আঙুলে আলু প্রথমে সেদ্ধ করে এবং পরে ভেজে সায়েবরা রসনায় যে কি সুখ পায়!"

"ভাজাভাজিই তো বাঙালিদের পছন্দ! ভাজা পেলে আমরা তো আর কিছুই চাই না।"

আমার সবিনয় প্রতিবাদ : "তা ঠিক নয়, ব্যান্ডোদা। স্বামী বিবেকানন্দ তো শুধু বেদ-বেদান্তকে মডার্নাইজ করেননি, নতুন যুগের বাঙালিদের মডার্ন করবার জন্যে বলেছেন, বাছাধন, ওঠো জাগো, কিন্তু সকালবেলায় উঠেই ময়রার ভাজাভুজি খেয়ো না। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মশায় পর্যন্ত স্বামীজির অ্যাডভাইসকে গুরুমন্ত্র হিসেবে নিয়ে মায়াবৌদিকে নির্দেশ দিয়েছেন, পিঁয়াজ ভাজবে না, হজম সহজে হয় পিঁয়াজসিদ্ধ! স্বামীজি নাকি পই পই করে বলে গিয়েছেন।"

ব্রিটেনের ভোট কোন্ দিকে পড়লো? ব্যান্ডোদা আবার একটা চান্স দিলেন আমাকে। "নিশ্চয় বিফ স্টেক জাতীয় কিছু একটা হবে।"

"ওরে কলকাতায় বসে কূপমণ্ডুক তোরা কোনও খবরই রাখছিস না। এখন গ্যালপ পোলে দেখা যাচ্ছে, বিলিতি সায়েবদের সবচেয়ে প্রিয় ডিশের নাম 'কারি'। ৬ কোটি ইংরেজদের সিকিভাগ, মানে দেড় কোটি সায়েব, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার চিকেন টিক্কা কারি খেতে না পেলে মনে করবে সায়েব হয়ে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না!"

একটু থেমে ব্যান্ডোদা বললেন, "কেলেংকেরিয়াস কাণ্ড! পলাশির

যুদ্ধের বদলা নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন অকুপাই করতে আমাদের মাত্র আড়াইশো বছর লাগলো।”

“গ্যালপ পোলে স্বীকার করা মানে তো একেবারে সারেন্ডার করা, ব্যান্ডোদা। ইংরেজদের আত্মসমর্পণের এতো বড় খবরটা স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বছরেও আমাদের খবরের কাগজে ফলাও করে বার হলো না!”

ব্যান্ডোদা নিজেরও বেশ উত্তেজিত। জানালেন, “আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করিনি। তারপর শ্রাবণী বসু বলে এক ধানিলঙ্কা মহিলার সঙ্গে বিলেতে যোগাযোগ করলাম। আনন্দবাজারের লন্ডন প্রতিনিধি, তিনিই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন ; জন্মভূমির গর্বে গরবিনী হয়ে শ্রাবণী এই কারি নিয়ে বই লিখছেন—সায়েব মহলে হই হই পড়ে গিয়েছে।”

ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছি। বললাম, “আমরা এখান থেকে এই লেখিকার জয়ধ্বনি তোলার জন্য কী করতে পারি?”

ব্যান্ডোদা জানালেন, “বইয়ের নাম বাংলা করলে দাঁড়ায়, ‘রাজমুকুটে কারি’!”

“আহা! স্বয়ং ইংলন্ডেশ্বরীর রাজমুকুট বলে কথা! শুনেছি, এই রাজমুকুট সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লি দরবারে পরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠাবান সায়েবরা দ্বীপপুঞ্জের বাইরে এই রাজমুকুট পাঠাতে রাজি হলেন না—আইন নেই। ওদেরও কালাপানি পেরনোর বিধিনিষেধ আছে! তখন অনুগত ভারতীয় প্রজারা বহুটাকা খরচ করে আর একটা রাজমুকুট বানালেন স্রেফ দিল্লি দরবারের জন্যে। এক বাংলাদেশি ছোকরা বললে, সেই মুকুটেরও ভ্যালুয়েশন এখন নাকি চারশো কোটি টাকা! রাজার মুকুটে এখন কারির ভুরভুরে গন্ধ! আহা!”

ব্যান্ডোদা বললেন, “তোরা শ্রাবণীর লেখাকে জাতীয় পর্যায়ে একটু ফোড়ন দে।”

“কী দেবো?”

“ফোড়ন—একটি ছ্যাঁক ছ্যাঁক আওয়াজ হোক, চারদিকে বইটার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ুক, লোকে জানুক আমাদের ইংলন্ড বিজয়পর্ব অবশেষে সম্পূর্ণ হয়েছে।”

ফোন নামিয়ে রাখার আগে ব্যান্ডোদা অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। মণ্ডামিঠাই ফুলুরি কচুরি ফেলে রেখে এবার আমাদের ঝালের দিকে নজর দিতে হবে তড়িৎগতিতে।

প্রফেসর রায়ের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমাকে আলোচনায় বসতে হবে। যতোই ব্যান্ডোদা অপছন্দ করুন, সর্বদমনের দৃষ্টিভঙ্গি বেদান্তিক, ওঁর মতামত থেকে অনুসন্ধানের অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আমি বলেছি, "ব্যান্ডোদা, যদি আপনাকে ঝাল নিয়ে কাজ করতে হয় তা হলে দলে একজন তেলুগু বিশেষজ্ঞ রাখারও বিশেষ প্রয়োজন—ঝালের হাড়হদ্দ ওরাই বোঝে।"

ব্যান্ডোদা রাজি নন। "তোরা দু'জন আমার কাছাকাছি থাকলেই যথেষ্ট। দু'জনে দুশো। জেনে রাখ, সাচ্চা বাঙালি ঝালোয়ান এখনও দুনিয়ার সেরা।"

"পালোয়ান থেকে আপনি ঝালোয়ান করে দিলেন। বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হলো, ব্যান্ডোদা।"

প্রফেসর সর্বদমন রায় এখন বেশি সময় এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ব্যয় করেন।

এশিয়াটিকের কাছেই পার্ক স্ট্রিটের ওপর যে কাঠি রোলের দোকান আছে সেখানেই ওঁর সঙ্গে দেখা করলাম। সর্বদমন রায় ভেজিটেব্‌ল রোলের অর্ডার দেওয়ায় আমি দুঃখ পেলাম। "সর্বদমনদাদা, আপনার পরমশ্রদ্ধেয় স্বামী বিবেকানন্দ তো কখনও ভক্তদের শাকাহারী হতে বলেননি।"

অধ্যাপক রায় একটি বোমা ছাড়লেন। "মোগল সম্রাটরাও স্বেচ্ছায় শাকাহারী হয়ে পড়েছিলেন এটা জেনে রাখুন। উপোস এবং নিরিমিষ, দুটোই টেনেছিল সম্রাট আকবরকে। স্বয়ং হুমায়ুন গোমাংস ভক্ষণের বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন একসময়। আর সম্রাট ঔরঙ্গজীব তো কট্টর নিরামিষী! উপবাসে ইসলামের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া পৃথিবীর কোনও ধর্মের পক্ষে সম্ভব নয়।"

এ বিষয়ে একদিন বিস্তারিত আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রফেসর রায়।

এখন এই কাঠি রোলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে উপবাসের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কথা তুললে আর্যপুত্রদের নার্ভের ওপর অত্যধিক চাপ পড়বে।

প্রফেসর রায় এখন যে বিষয়ে সারাক্ষণ ডুবে আছেন তা হলো—কৌদ্রাবিক।

"ব্যাপারটার তাৎপর্য কী?" জানতে চাই আমি।

"এর মানে হলো যার বাড়িতে নুন খাওয়া চলে। সে যুগে নিজের জাতভাই ছাড়া অন্য কারও হাতে নুন খাওয়া চলতো না। কাজের বাড়িতে পৃথক পাত্রে পৃথক জাতের জন্য পৃথক পাত্রে নুন থাকতো।"

আমি বললাম, "কারি তৈরি করতে ঝাল লাগে, নুনও লাগে। সুতরাং আপনি অনুসন্ধান চালিয়ে যান।"

প্রফেসর রায় : "ব্যান্ডোদাকে বলবেন, নুন নিয়ে ইন্ডিয়াতে অনেক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। লবণকে আগে বলত লক্তপ্রাণ অর্থাৎ রক্তপ্রাণ।"

"নুন বলতে ছোটবেলায় বুঝতাম বিটনুন!"

"জেনে রাখুন, আগে একে বলা হত খণ্ডনুন। মুসলমানি আমলে হয়ে গেলো সুলেমানি নুন।"

"ছোটবেলায় ফেরিওয়ালার মুখে গান শুনেছি, সুলেমানি নিমক খেতে আর ভুলো না দাদা, আর ভুলো না।"

প্রফেসর রায় : "ব্যান্ডোদা কী প্রমাণ করতে চাইছেন জানি না। কিন্তু জেনে রাখুন প্রাচীন ভারতে নুন সহজলভ্য ছিল না। সমস্ত ঋগ্‌বেদে একবারও নুনের উল্লেখ নেই—পুণার ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে আমাকে বলেছে। আসলে মানুষকে নুন খেতে কোনওরকমে উৎসাহ দেওয়া হতো না। শাস্ত্রে প্রথম তিনদিন যাদের নুন খাওয়া নিষিদ্ধ তাদের মধ্যে রয়েছে—ছাত্র, বিধবা এবং নববিবাহিতা।"

এরপর যা বললেন সর্বদমন রায় তা লিখে নেবার জন্যে রাস্তার ফুটপাথেই আমি নোটবই খুললাম। ব্যান্ডোদা ঢিলেঢালা কাজ পছন্দ করেন না। যা জানা যাচ্ছে, ইংরেজরা নুনের ওপর একটা ট্যাক্সো চাপিয়েছিলেন বলে গান্ধীজি লবণ আন্দোলন ও ডাণ্ডি অভিযান করে দেশ কাঁপিয়ে তুললেন। অথচ আদিযুগ থেকে দুটো টাকা রাজকোষে তুলবার জন্যে

লবণের দিকে নজর সব সরকারের, মৌর্য যুগে সরকারের একচেটিয়া অধিকার ছিল নুনের উপর।

"শুনুন মশাই, সায়েবরা নুনের ওপর একটা ট্যাক্সো চাপিয়ে গালমন্দ খেলেন, আর আমাদের হিন্দু রাজারা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে ছিলেন একটা নয় ছ'টা লবণ ট্যাক্সো। চারটে দিতো বিক্রেতা, আর দুটো দেওয়ার দায়িত্ব ছিল ক্রেতার।"

"এখন আর এসব খারাপ খবর সায়েবদের কানে তুলে লাভ নেই।"

সর্বদমন রায় একমত হলেন না। বললেন, "সায়েবরা তো তাদের অনেক অপ্রিয় খবরের মহাফেজখানা শত্রুমিত্র সবার কাছে খুলে দিচ্ছে ইতিহাসের মুখ চেয়ে। আমাদেরও এই পথ অনুসরণ করতে হবে। এইটাই তো যুগধর্ম।"

ব্যান্ডোদার নির্দেশ মতন কয়েকটা জটিল প্রশ্ন তুলে দিলাম অধ্যাপক সর্বদমন রায়ের হাতে। সবিনয়ে বললাম, "ব্যান্ডোদার মনটা এখন ঝালের দিকে। তাই এবারের প্রোজেক্টের নাম দিয়েছি 'ঝালে-ঝোলে-অম্বলে'।"

"খুব ভাল নাম হয়েছে! ঝালে-ঝোলে-অম্বলে—কমন মশলা হলো ঝাল! অথচ প্রতিযোগীরা বুঝতে পারবে না আমরা কী নিয়ে অনুসন্ধান করছি! নুন হতে পারে, ঝাল হতে পারে, টক হতে পারে, এমনকি মিষ্টিও হতে পারে। অথচ ব্যান্ডোদা অ্যান্ড কোং-এর আসল নজর থাকবে ঝালের দিকে।"

কোশ্চেনগুলোর দিকে তাকালেন সর্বদমন রায়। এসব প্রশ্ন তাঁর কাছে ডালভাত। ভগবান এই ভদ্রলোককে একখানা স্মৃতিশক্তি দিয়েছিলেন বটে! মাথার মধ্যে যেন একডজন ইন্টেল পেন্টিয়াম চিপ্‌স সাজানো রয়েছে।

"লিখে নিন," বললেন সর্বদমন রায়। "সত্যজিৎ রায় বেঁচে থাকলে খাদ্যরহস্য নিয়েই খানকয়েক সর্বজনপাঠ্য উপন্যাস লিখে ফেলতেন। দেশের যে কী ক্ষতি হলো, মানুষটা অকালে চলে গেলো, অথচ শরীরের ওপর কোনওরকম অত্যাচার করতেন না, নিয়মে বাঁধা সংযমী জীবন।"

আমি লিখতে প্রস্তুত। সাবজেক্টটা বললে মাসিক চমচম পত্রিকার সম্পাদক ইন্দ্রলুপ্ত চৌধুরী মশাই আমাকেও হয়তো চান্স দিতে পারেন।

কিন্তু বড় কঠিন এই অনুসন্ধান।

সর্বদমন শুরু করলেন : “ব্যান্ডোদাকে বলবেন, গোলমরিচের আদিনাম কৃষ্ণ! ইংরিজিতেও তো ব্ল্যাক পেপার বলে! পিপুলীর আদি নাম কৃষ্ণা।”

“কী ব্যাপার—কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে দেশটা গেলো! এই সেদিন শুনলাম, আমের নামও কেশবায়ুধ!”

“হ্যাঁ! কৃষ্ণের অস্ত্র ছিল এই আম। অপরকে আম খাইয়ে অনেক কাজ তিনি করিয়ে নিতেন, তাই কেশবায়ুধ! ওঁর প্রিয় লতা—মাধবস্য প্রিয়—তাই তার নাম মাধবী। প্রিয়পথতরু—দেবদারু।”

কৃষ্ণনিন্দা বেশিদূর এগলো না। কারণ ভোজনে ও রন্ধনে কেশবের যে প্রবল আগ্রহ ছিল তা জানা গেলো। সুতরাং ব্যান্ডোদা ও কৃষ্ণের কমন ইনটারেস্ট!

সর্বদমন জানালেন, “যজ্ঞিডুমুরের তরকারি পর্যন্ত রাঁধতে পারতেন গীতার শ্রীকৃষ্ণ।”

সামান্য কয়েকদিন পরেই খোদ তাজ বেঙ্গল থেকে এই অধমকে ফোন। ব্যান্ডোদা চুপি চুপি কে এল এম ফ্লাইটে ক্যালকাটায় পদার্পণ করেছেন। বিরাট সুইট নিয়েছেন চারতলায় হোটেলের উত্তর-পশ্চিম দিকে। আজকাল সায়েবরা যে অনুপাতে ইন্ডিয়ান হবার চেষ্টা করছেন, তার সমপরিমাণ উৎসাহে ইন্ডিয়ানরা সায়েব হবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। এদেশেও ব্যান্ডোদার নামকরা ক্লায়েন্ট আছেন—তাঁরাই সাগ্রহে সব খরচাপাতি দিয়ে ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ ব্যান্ডোদার দেখভাল করছেন এদেশে।

হাওড়া হাট থেকে আগের বারে সংগৃহীত একটি ফুলকাটা কোরা পাঞ্জাবি পরে ব্যান্ডোদা সোফায় বসে আছেন। সেবার সর্বদমন জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আপনার দাদা কখনও ‘কোষাতক’ পরেন না?” এর অর্থ যে গেঞ্জি তা আমার জানা ছিল না। চরণকোষ অর্থাৎ মোজাতেও ব্যান্ডোদার উৎসাহ নেই—আন্তর্জাতিক বিমানের উঁচু শ্রেণীতে মোজাবিহীন হয়ে তিনি ভ্রমণ করেন।

এবারে ভীষণ আনন্দিত এবং উত্তেজিত আমাদের ব্যান্ডোদা। লন্ডনে

তিনদিন তিনরাত বসবাস করে লেখিকা শ্রাবণী বসুর সঙ্গে যে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন তা বুঝতে পারছি।

ব্যান্ডোদা বললেন, "ভাবা যায় না, মুখুজ্যে! অ্যালকহলিকের মতন নতুন একটা কথা—কারিহলিক—ওদেশে সৃষ্টি হয়েছে। ওইটুকু দেশে আট হাজারের বেশি ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ! দিল্লি বম্বেতেও এতো ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ পাবি না তুই।"

"নামেই ইন্ডিয়ান! বিলেতের প্রায় সব ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁই তো বাঙালিদের।"

প্রতিবাদ করলেন না ব্যান্ডোদা। "সিলেটিরা বিশ্বের দরবারে বাঙালিদের মান রাখছে। এই কলকাতায় বাঙালি খাবারের রেস্তোরাঁ মাত্র দেড়খানা ; অথচ আমরা বাঙালিরাই এদেশের খাবার নিয়ে বিলেত জয় করলাম। শুনে রাখ, কারির জন্ম এদেশে, কিন্তু কারির বিশ্বকেন্দ্র হয়ে উঠেছে লন্ডন—থ্যাংকস্ টু বেঙ্গলিজ। প্রতি সপ্তাহে কুড়ি লাখ সায়েব হট কারি খেয়ে হা-হু করার জন্যে ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় যায়। প্রতি বছর এই খাতে ইংরেজ সায়েবদের খরচ দুইবিলিয়ন পাউন্ড—অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায়...না, শুনলে তোদের হার্ট ফেল করবে—১৪০০০ কোটি টাকা।"

আরও কিছু খবর দিলেন ব্যান্ডোদা। "একজন ইংরেজ সায়েব ব্যবসায়িক কাজে লন্ডন থেকে আমেরিকার মিয়ামি, ফ্লোরিডায় গিয়েছিলেন। সেখানে মনের মতন কারির দোকানের খবর না পেয়ে তিনি তাঁর পরিচিত লন্ডন রেস্তোরাঁ থেকে একটা কারি মিল আনিয়ে নিলেন—খরচ পড়ল মাত্র এক লাখ টাকা। সো হোয়াট! কারির নেশা বড় নেশা। ১৯৯৮ সেপ্টেম্বর মাসে লেবার পার্টির জরুরি বৈঠক চলেছে। প্রধানমন্ত্রী টোনি ব্লেয়ারের স্ত্রী চেরি ব্লেয়ার চুপিচুপি চলে গেলেন স্থানীয় সুনম তন্দুরিতে খাবারের অর্ডার দিতে—পাপড়ম্, চিকেন টিক্কা মশালা, মাদ্রাজী ল্যাম্ব, ডাল ও সব্জি। আঠারো জনের জন্য লাঞ্চ প্যাকেট, খরচ পড়লো ১১৫ পাউন্ড।'

টেলিভিশনের বিখ্যাত রাঁধুনি কেন হোম। সাংবাদিকদের চাপে পড়ে এই তারকা স্বীকার করেছেন, যেখানেই ভোজ খেতে যান পকেটে রাখেন

ম্যাড্রাস হট কারি পাউডার। খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে নেন এই পাউডার জিভে স্বাদ আনার জন্যে।

"ব্যান্ডোদা, আমরা আজ যা ভাবি, মহাপুরুষরা একশো বছর আগে তাই করে থাকেন। এইট্টিন নাইনটি ফাইভ থেকে একজন বাঙালি খাদ্যরসিক একই কাণ্ড করেছেন আমেরিকায় ও ইংলন্ডে।"

"কে এই মহাপুরুষ?" সাগ্রহে জানতে চাইছেন আমাদের প্রিয় ব্যান্ডোদা।

"সর্বত্যাগী পুরুষ, কামিনীকাঞ্চনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, বিশ্বকে বেদান্ত সম্বন্ধে অবহিত করার জন্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতন যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সারাক্ষণ নিজের জোব্বায় রেখেছেন নানা ধরনের ইন্ডিয়ান গুঁড়ো মশলা। এই ভদ্রলোকের নাম স্বামী বিবেকানন্দ।"

কপালে হাত ঠেকালেন ব্যান্ডোদা। "সাধে কি আর রামকৃষ্ণদেব নরেন দত্তকে এক নম্বর শিষ্য হিসেবে সিলেক্ট করেছিলেন। প্রবাসে স্বদেশি রান্না ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সব খবরাখবর যোগাড় করে ফেল, দরকার হলে তুই প্রফেসর শঙ্করীপ্রসাদ বসুর বাড়িতে ধর্না দিয়ে পড়ে থাক, কিন্তু রান্নাবান্না সম্পর্কে সমস্ত অকথিত কাহিনী যেন আমাদের রিসার্চ রিপোর্টে থেকে যায়।"

"ব্যান্ডোদা, কেন সামাজিক ভদ্রতায় ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান করছেন? বলুন, পলাশিতে বাঙালির রক্তেই ক্লাইভের খঞ্জর লাল হয়েছিল, আবার সময়ের রসিকতায় বাঙালিরাই ইংলন্ডের মাটিতে রসনালোলুপ সায়েবদের নিঃশর্ত সারেন্ডার গ্রহণ করলো।"

ব্যান্ডোদা বেশি প্রতিবাদ করলেন না। "বিলেতের আশিভাগ রেস্তোরাঁই এখন বাঙালিদের। এঁদের বাৎসরিক রোজগার ১.৬ বিলিয়ন পাউন্ড—টাকায় ধরলে এগারো হাজার কোটি। এঁরা সেলস্ ট্যাক্স দেন বছরে ১৮০০ কোটি টাকা—তোদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে সকলে মিলে এর অর্ধেক সেলস্ ট্যাক্স দিতে পারিস না। বুঝছিস ব্যাপারটা!"

শ্রাবণী বসুর লেখা থেকে ব্যান্ডোদা যে অনেক মালমশলা সংগ্রহ

করেছেন তা বুঝছি, যদিও পরিসংখ্যান আমার মাথায় কোনওদিন তেমন ঢোকে না।

ব্যান্ডোদা বললেন, "শুনে রাখ, ইংরেজের ইস্পাত শিল্পে এবং বিলেতের সমস্ত খনিতে যতোলোক কাজ করে তার থেকে বিলেতে বেশি লোকের কর্মসংস্থান করে দিয়েছেন সিলেটের প্রতিভাবান বাঙালিরা! ওঁদের কর্মচারীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের মতন।"

জয় হোক বাঙালিদের। জয় বাংলা বলা উচিত ছিল, কিন্তু ছোঁয়াচে চোখের রোগের কল্যাণে এখন তার অর্থ অন্য।

শুধু রেস্তোরাঁয় মুখ পাল্টানো নয়, মেমসায়েবের হেঁসেলেও ইন্ডিয়ান কারি ইদানীং বীরবিক্রমে ঢুকে পড়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণ নিয়ে এসেছেন ব্যান্ডোদা।

মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের দোকান থেকে বিলিতি মেমরা প্রতি সপ্তাহে ১৮ টন চিকেন টিক্কা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন বাড়িতে সার্ভ করার জন্যে। জেনে রাখুন, বিখ্যাত এই দোকানে অন্তত ছাব্বিশ রকম ইন্ডিয়ান ডিশ পাওয়া যায়। প্রতি মিনিটে সায়েবরা দশটা প্যাক মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের দোকান থেকে কিনছেন। এই রেটে প্রতি বছর কলকাতার এক কোটি লোককে একটা করে মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার ইন্ডিয়ান কারি দেওয়া যেতে পারে।

ব্যান্ডোদার হাতে এখন অনেক খবর। মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের দোকানে যারা কারি সরবরাহ করেন তাঁরা বছরে সাড়ে সাত লাখ রসুন কোয়া ব্যবহার করেন।

আরও খবর আছে। ভারতীয় মশলার জয়জয়কার। এদেশে আমরা যখন বহুজাতিক কর্পোরেশনের ব্রান্ডের তাড়নায় বিব্রত, ভিটেমাটি সামলাতে পারছি না, তখন শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এক গুজরাতি কোম্পানির 'পাঠক' মশালা ইংলন্ডের সবচেয়ে দ্রুত প্রসারমান ব্র্যান্ডের সম্মান অর্জন করেছে। এঁরা বিক্রি করেন নানা রকমের আচার এবং কারি পেস্ট। কোম্পানির বিক্রি বছরে তিনশো কোটি টাকার ওপরে। ইন্ডিয়াতে বারোটা এবং বিলেতে তিনটে কারখানা চালান এই পাঠক পরিবার। প্রতিদিন পনের থেকে কুড়ি টন আচার এবং বাটা মশলা ওঁদের বিলিতি কারখানায় তৈরি হয়। এর জন্যে

সরষে আসে কানাডা থেকে, রসুন ইতালি থেকে, আম, আদা এবং লেবু ইন্ডিয়া এবং ব্রাজিল থেকে, তেঁতুল পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া থেকে, নারকেল তাইল্যান্ড থেকে, ধনিয়া কেনা হয় ইরান থেকে। শুনুন, বছরে ধনিয়া পাউডার লাগে ৫০০ টন, হলদি ২৫০ টন এবং ৫০০ টন কাঁচা আম।

লঙ্কার কথা উঠছে না। ব্যান্ডোদা বললেন, "ওটা পুরো একটা সাবজেক্ট—পাঠকমশাই নিজে ব্যবহার করেন ৫০০ টন গুঁড়ো লঙ্কা। ওঁদের পপুলার কয়েকটি আইটেম—কোর্মা কারি পেস্ট, ম্যাড্রাস কারি পেস্ট, টিক্কা মশালা কুকিং সস, দোপিঁয়াজা কুকিং সস।"

"এই নিঃশব্দ বিপ্লব কীভাবে ঘটলো, ব্যান্ডোদা?" আমি সবিনয়ে জানতে চাই।

শ্রাবণী বসুর লেখা থেকে কিছু মেটিরিয়াল পেয়েছেন ব্যান্ডোদা। তিনি বললেন, "ঝাল? এই ঝাল ছাড়া ইংরেজের জীবন এখন অচল। যখন এদেশে সায়েবরা রাজত্ব করতেন তখন তাঁদের মেমসায়েবরা স্বামীদের ঝাল থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। অথচ রাজত্ব ছেড়ে দেশে ফিরে গিয়ে সেই ইংরেজ ভারতবর্ষের 'নস্টালজিয়ায়' পড়লো। সম্ভব হলে, গাঁটের কড়ি খরচ করে একবার অন্তত চলো বীরস্বামী রেস্তোরাঁয়।"

"তবে এই যে আমরা নোলার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে জয় করলাম, তার পিছনে রয়েছে সুইডিশ অবদান। শুধু বোফর্স কামান নয়, সুইডেন আমাদের কারি বিপ্লবকে নিঃশব্দে ভীষণ সাহায্য করেছে।"

"কী করেছে সুইডেন?" আমরা সকলে জানতে চাই।

"সুইডেনের রাজা গুস্তভ প্রায়ই লন্ডনে থাকতেন। তাঁর প্রিয় রেস্তোরাঁ বীরস্বামী। এখানেই তিনি বীয়রের সঙ্গে কারি খাওয়ার রেওয়াজ চালু করেন। তাঁর ফেভারিট আইটেম কার্লসবাড বীয়র ও সেই সঙ্গে ডাক ভিন্ডালু অর্থাৎ ঝালসহ হাঁসের মাংস। এই থেকেই স্টাইলটা চালু হয়ে গেলো ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে!"

ব্যাপারটা অতো সহজ নয়, এক রাজা গুস্তভ থেকে প্রবাসে ভারতীয় কারির জয়যাত্রা শুরু হয়ে কেমন করে?

ব্যান্ডোদা বললেন, "তোর সঙ্গে তো সিলেটিদের বেশ জমে।

আজেবাজে সাবজেক্টে সময় নষ্ট না করে চলে যা লন্ডনে—জীবনের বাকি ক'টা দিন ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁগুলো মন দিয়ে স্টাডি কর। মিসেস শ্রাবণী বসু করেছেন কিছুটা, কিন্তু ওটা তো আইসবার্গের ওপরের দিকটা।"

কারি ইন দ্য ক্রাউন আমি পড়ে ফেলেছি।

"কেমন লাগলো?" জানতে চাইছেন কৌতূহলী ব্যান্ডোদা।

"এক কথায় চমৎকার, ব্যান্ডোদা! তবে..."

"তবে আবার কি!"

"গুজরাতি পাঠক কিংবা শা, কিংবা তাজের বম্বে ব্রাসারিতে অনভিজ্ঞ সেবিকা একটু বেশি সময় দিয়েছেন, বাঙালিদের বিলেতবিজয়ের বিষয়ে তেমন মাথা ঘামাতে পারেননি।"

"বিলেত না গিয়েই পরনিন্দা করছিস!" ব্যান্ডোদা এই ধরনের মানসিকতা পছন্দ করেন না।

"না ব্যান্ডোদা। এই অধম ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে বার্মিংহামের এক রেস্তোরাঁয় বসে বাঙালি মুসলমানদের আচরণ দেখে আশঙ্কা করেছিল পূর্ব পাকিস্তান টিকবে না, বুঝতে পেরেছিল, এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে কোথায় এক অদৃশ্য ভালবাসার বন্ধন অটুট থেকে গিয়েছে—তখন অবশ্য অনেকেই আমাকে বিশ্বাস করেননি, তারপর তো সকলের চোখের সামনেই অঘটন ঘটে গেলো। এর অনেকদিন পরে এক সিলেটি বন্ধুর সঙ্গে দু'দিনের জন্যে লন্ডনের কয়েকটি ভারতীয় রেস্তোরাঁয় ঢুঁ মেরেছি ১৯৮৯ সালে।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "তুই যদি এবার ওখানে যাস তা হলে খোঁজ-খবর করার দুটো দায়িত্ব তোকে দেবো। এক : বিলিতি সায়েবদের ঝাল খাওয়ার দুর্মতি কীভাবে হলো? শুনছি, যতো ঝাল বেশি বিলেতে ততো সেই পদের জনপ্রিয়তা। এখন একনম্বর ঝাল ইন্ডিয়ান আইটেম হলো পিরিপিরি। কাঁদতে কাঁদতে খাওয়া এবং খেতে খেতে কাঁদা সায়েবদের স্বভাবে ঢুকে যাচ্ছে। দু'-নম্বর : কারা কারা কীভাবে এই নিঃশব্দ বিপ্লবের জনক হলেন? সেই সব পথপ্রদর্শকের অমৃতজীবনকথা জাতীয় স্বার্থে আমাদের সংগ্রহ করতে হবে।"

"বাঙালি যে আত্মবিস্মৃত জাতি সে সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ নেই,

ব্যান্ডোদা। বিলেতবিজয় করলো দুঃসাহসী বাঙালিরা, অথচ নাম হলো অন্যদের। খোদ বিলেতে সায়েবদের নোলা পাল্টানো ইস্ট আফ্রিকান গুজরাতিদের কম্মো নয়, ব্যান্ডোদা। এ-বিষয়ে এই অধম দু'দিনের বিলেতভ্রমণকালে নুরুল ইসলাম বলে এক ধৈর্যশীল সিলেটি গবেষকের কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে, তার কথা আমরা এখনও প্রচার করে উঠতে পারিনি।"

বেজায় আগ্রহী এই ব্যান্ডোদা। সস্নেহে আমাকে সুযোগ দিয়েছিলেন বাঙালিদের বিলেতবিজয়ের কিছু নতুন ঘটনা জোগাড় করে রাখতে।

আমি যথাসময়ে তাজ বেঙ্গলে ব্যান্ডো সুইটে পদার্পণ করেছি। আসবার সময় বউবাজারের বঙ্গলক্ষ্মী কেবিনের মাছের ঝাল-দে সংগ্রহ করে এনেছি টিফিন বক্সে।

খুব খুশি হলেন ব্যান্ডোদা। বঙ্গলক্ষ্মীর স্বাদ অবহেলা করে এই সব তাত্ত্বিক আলোচনা অসম্ভব! আমাদের উচিত ছিল সুইডেনের রাজা গুস্তভকে এবং হেনরি কিসিংগারকে বউবাজারের পাইস হেটেলে হাজির করা। তা হলে বিস্ফোরণটা এখান থেকেই শুরু হতো। পলাশির উত্তরটা পলাশি থেকেই দেওয়া যেতো।

ব্যান্ডোদা প্রশ্ন করলেন, "ব্রিটিশ কারির হিস্ট্রিটা কেমন বুঝলি?"

আমার সবিনয় উত্তর : "ব্যান্ডোদা, সাধারণ লোকদের ধারণা, একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, যাঁর বাবা ছিলেন সায়েব জেনারেল এবং মা ভারতীয় রাজকুমারী, ভারত থেকে বিলেতে ডাক্তারি পড়তে এসে নিজের অজান্তে ব্রিটিশ কারি-বিপ্লবের সূচনা করলেন। এঁর নাম এডওয়ার্ড পামার। জন্মভূমিতে কারিতে অভ্যস্ত এই ইউরেশিয় যুবকটি বিদেশে ইন্ডিয়ান খানার অভাব সহ্য করতে না পেরে ১৯২৬ সালে লন্ডনে বীরস্বামী রেস্তোরাঁর সূচনা করেন। সৌভাগ্যক্রমে এই রেস্তোরাঁ হাতবদল হয়েও এখনও টিকে রয়েছে লন্ডন শহরে। সময় হলে এই বীরস্বামী রেস্তোরাঁ হয়তো জাতীয় কারির হেরিটেজ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পাবে।"

"ভালই তো।" সুরসিক ব্যান্ডোদার তাৎক্ষণিক মন্তব্য।

আমি বললাম, "শ্রাবণী বসু বলেছেন, এই বীরস্বামীতে এডওয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েলস, সুইডেনের রাজা গুস্তভ, চার্লি চ্যাপলিন থেকে ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত কে আসতেন না? বীরস্বামী নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন ১৯৫৯ সালে লন্ডনের প্রথম তন্দুরি চিকেন সাপ্লাই করে।"

ব্যান্ডোদার মন্তব্য : "শ্রাবণী বসু যা বলেননি তা এবার শুনতে চাই, মুখুজ্যে।"

"লেখিকা খোদ বীরস্বামীর জীবনকথা বললেন না। কেমন করে বিলেতের এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে এই কমবয়সী রাঁধুনি সায়েবদের ভারতীয় রান্না খাইয়ে রাতারাতি হিরো বনে গেলেন এবং আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন না। বহু বছর আগে গল্প শুনেছি, এই বীরস্বামীই বিদেশে ম্যাড্রাস কারির সূচনা করেন, যদিও স্বদেশে এই ধরনের কোনও নাম খাদ্যপ্রেমীদের জানা ছিল না। এই বীরস্বামীই যে বিদেশে মুলিগাটানি স্যুপকে সায়েবীসমাজে জনপ্রিয় করেছিলেন এমন গল্পও আমি গ্রেট ইস্টার্ন ও স্পেনসেস হোটেলের রাঁধুনি মহলে অনেকবার শুনেছি, তখন আমি 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের জন্য তথ্য সংগ্রহ করছি এবং লন্ডনের বীরস্বামীতে তখন সবেমাত্র তন্দুর বসছে। মুলিগাটানি আসলে ডালের ঝোল, এর যে দক্ষিণভারতীয় অর্থ আছে তা অভিধানে উল্লিখিত। কিন্তু স্পেনসেসের রাঁধুনিরা আমাকে বলতেন, আসলে কথাটি 'মুলুকতানি' অর্থাৎ দেশের জিনিস শব্দটির অপভ্রংশ। বীরস্বামীর জীবনকথা আমাদের কাছে অমৃতসমান, নতুন যুগে সমস্ত ভারতীয়দের জন্য তা অবশ্যপাঠ্য হোক।"

"ভালই বলছিস, চালিয়ে যা," উৎসাহ দিলেন ব্যান্ডোদা। তিনি এবার জিজ্ঞেস করলেন, "চা খাবি?"

"এখানে বড্ড দাম। এককাপ চা মানে একশো টাকার ধাক্কা। দু'কাপের খরচে আর এক কপি শ্রাবণী বসু কিনে ফেলা যাবে হারপার কলিন্স্ থেকে," আমার সবিনয় নিবেদন।

আবার ইতিহাস প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বিলিতি এক সূত্র উল্লেখ করে শ্রাবণী বসু বলেছেন, লন্ডনে প্রথম ভারতীয় ভোজনালয় স্যালুট ই হিন্দ ১৯১১ সালে হোবর্নে স্থাপিত হয়। প্রথম চাইনিজ রেস্তোরাঁ ম্যাক্সিম ১৯০৮

সালে লন্ডনে ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। তারপর ঝাঁপ দিয়ে লেখিকা ১৯৪৬ সালে চলে এসেছেন এবং জানিয়েছেন তখন লন্ডনে মাত্র তিনটে ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ—শফি, বীরস্বামী ও কোহিনুর। এইখানেই বোধহয় বেশ কিছু জানবার থেকে গিয়েছে। এই ফাঁক সিলেটের দুঃসাহসী বাঙালি লেখক নুরুল ইসলাম তাঁর প্রবাসীর কথায় অসীম ধৈর্য সহকারে সংগ্রহ করে গিয়েছেন। নুরুল ইসলামের কাজকর্ম দেখে আমি নিশ্চিত যে একজন সিলেটি ছাড়া আর কারও পক্ষে বাঙালি জাহাজিয়া এবং বাঙালি রেস্তোরাঁচালকের পরিপূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

"নুরুল ইসলামের সঙ্গে আমার যে লন্ডনে দেখা হয়েছিল এবং কিছু আলোচনার সৌভাগ্য হয়েছিল একথা আগেই আপনাকে বলেছি, ব্যান্ডোদা।"

"ওঁর মতামতটা শুনুন। লন্ডনে প্রথম ইন্ডিয়ান ভোজনালয় স্থাপনের কৃতিত্ব সিলেটি সৈয়দ তফুজ্জুল আলির। ভিক্টোরিয়া ডক রোডে এই মিস্টার আলি তাঁর বোর্ডিং হাউসের সঙ্গে একটি কাফে খোলেন—চা নাস্তার সঙ্গে এখানে ভাত ও কারি পাওয়া যেতো। বিখ্যাত সারং আত্তর আলি ৭৫ বছর বয়সে তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'বিলেতে এই সময় আর কোথাও ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ ছিল না।' মিস্টার আলির কাফেতে সায়েব ডাকাতদের অত্যাচার ছিল, খাবারের দাম নিয়ে তারা প্রায়ই মারামারি লাগিয়ে দিতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমাবর্ষণে এই কাফে ধ্বংস হয়ে যায়।"

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হোয়াইট চার্চ লেন, কেব্‌ল স্ট্রিট ও ড্রামন্ড স্ট্রিটে তিনটি দিশী কাফের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বীরস্বামীর আগেই ১৯২৫ সালে মোহাম্মদ ওয়াছিম এবং মোহাম্মদ রহিম দুই ভাই লন্ডনের প্রথম ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ শফি ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরপ্রদেশ থেকে লেখাপড়া করতে এসে ভারতীয় খাবার সম্বন্ধে সায়েবদের কৌতূহল লক্ষ্য করে এঁরা এই ব্যবসায় নেমে পড়েন। এরপরেই 'আবদুল্লা কারি পাউডার' খ্যাত বোম্বায়ের আবদুল্লা এখানে দ্বিতীয় রেস্তোরাঁ স্থাপন করেন। তৃতীয় স্থানে মেজর পামারের বীরস্বামী। পরবর্তীকালে এই রেস্তোরাঁ তিনি বিক্রি করে দেন স্যর উইলিয়াম স্টুয়ার্ড

এম. পি-কে।

নুরুল ইসলাম ধৈর্য ধরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত বিলেতে যে চোদ্দোটি ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ ছিল তার খবরাখবর সংগ্রহ করেছেন। দিল্লি, বম্বে, পাঞ্জাবের পাইওনিয়ারদের সঙ্গে কলকাতার এক বঙ্গসন্তানের ব্যবসায়িক দুঃসাহসের খোঁজ পেয়ে আমি উল্লসিত হয়ে উঠি। কে বলে গতরবিহীন বোস, ঘোষ, মুখুজ্যের ফরেন বিজনেসে রুচি নেই? প্রাতঃস্মরণীয় এই বঙ্গসন্তানটির নাম নগেন্দ্র ঘোষ, উইন্ডমিল স্ট্রিটে এঁর রেস্তোরাঁর নাম ছিল দিলখোস। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার দিলখুশা রেস্তোরাঁর পরিচালকরা এই নগেন ঘোষের খোঁজখবর নিতে পারেন। যুদ্ধ শুরুর আগেই ১৯৩৮ সালে নগেন ঘোষ মশাই এই প্রতিষ্ঠান বিক্রি করেন জনৈক সিলেটিকে। বিলেতে সিলেটি মালিকানায় এইটিই প্রথম রেস্তোরাঁ, যার আদিতে রয়েছেন কলকাতাইয়া নগেন ঘোষ।

ব্যান্ডোদা নগেন ঘোষের নাম শুনে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। কিন্তু মন্তব্য করলেন, "স্ট্রে ইনসিডেন্ট—বিক্ষিপ্ত ঘটনা—এক কোকিলে তো বসন্ত হয় না।"

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। সৌভাগ্যক্রমে হাতের গোড়ায় কিছু অস্ত্র ছিল। বললাম, "ব্যান্ডোদা, আমাদের দুঃখ, সবাই হিন্দুস্থান রেস্তোরাঁর মিস্টার চাটওয়ালকে মনে রেখেছেন, কিন্তু কেউ লন্ডনের অশোক মুখার্জির নাম করে না। ইনি বহুকাল আগে লন্ডনের পার্সি স্ট্রিটে 'দরবার' রেস্তোরাঁ খুলেছিলেন, এঁর আদি নিবাস নগর কলকাতা। একই সময়ে একটা নয় দুটো রেস্তোরাঁর মালিক হয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ চৌধুরী। প্রতিষ্ঠানের নাম—'খৈয়াম' ও 'ইন্ডিয়া-বার্মা'। উড়িষ্যা থেকে গিয়েছিলেন জুবল হক—রেস্তোরাঁর নাম দিয়েছিলেন 'বেঙ্গল-ইন্ডিয়া'। আমার সন্দেহ কলকাতার সঙ্গে হক সায়েবের নিবিড় যোগাযোগ ছিল—কারণ ঐতিহাসিকভাবে উড়িষ্যার কর্মীরাই কলকাতার সমস্ত বিখ্যাত হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ক্লাবের সেবা করেছেন। এঁদের অনেকের সঙ্গেই একসময় কর্মসূত্রে আমার সখ্যতা জমে উঠেছিল।"

মিটমিট করে হাসছেন ব্যান্ডোদা। বললেন, "তোর বক্তব্য, লন্ডনের

আদিপর্বে ১৪টি উদ্যমের মধ্যে অন্তত পাঁচটি মুখার্জি, ঘোষ ও চৌধুরীদের। এবং এসব ঘটেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। বড় সহজ কথা নয়।"

"মহাযুদ্ধের সময় এঁদের কী অবস্থা হলো?" জানতে চাইছেন ব্যান্ডোদা।

"পরিস্থিতি তখন গুরুতর। চারদিকে বোমা পড়ছে। জার্মান বোমায় বিধ্বস্ত হলো নগেন ঘোষ প্রতিষ্ঠিত দিলখোস রেস্তোরাঁ। খাবারের অভাব, পয়সার অভাব, মানুষের অভাব। এরই মধ্যে মশরফ আলি ও ইছ্‌রাইল মিয়া খুললেন অ্যাংলো-এশিয়া। এইটিই সিলেটি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত লন্ডনের প্রথম রেস্তোরাঁ।

"মশরফ আলিকে নিয়ে বোধহয় বাংলায় একখানা উপন্যাস লেখা যেতে পারে, ব্যান্ডোদা। ১৬ বছর বয়সে জুনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত পড়ে মশরফ আলি সিলেটের কুচাই গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন ভাগ্যসন্ধানে। সেটা ১৯৩১ সাল। চার বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নাবিকবৃত্তি অবলম্বন করে তিনি লন্ডনে নেমে পড়েন ১৯৩৬ সালে। বিলাতে তখন মহামন্দা—কোথাও কোনও চাকরি নেই। তার ওপর মশরফ আলির ইংরিজি অক্ষর পরিচয় ছিল না। মশরফ আলি ধৈর্য ধরে ইংরিজি অক্ষর শিখলেন, ফেরিওয়ালার কাজ করে তিনি জীবনধারণ করতেন। বাস ভাড়া ছিল দু' পেনি, তাও দিতে পারতেন না, তাই পায়ে হেঁটে লন্ডনের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতেন।

"বিলেতের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে মোজা, রুমাল, চিরুনি ইত্যাদি দরজায় দরজায় বিক্রি ছাড়া তখন নতুন এক পেশার সন্ধান পেলেন মশরফ আলি। 'চকোলেট গেম'—এটা এক ধরনের বাজির খেলা, এর উদ্ভাবক একজন বাঙালি—ছওয়াব উল্লা। এক পেনি ফেলে এই খেলা খেলতে হতো—জিত হলে দু'পেনি দামের একটি নেসলে চকোলেট। মশরফ আলি ঘুরে ঘুরে এই খেলা দেখানো শুরু করলেন। তিনি থাকতেন তাঁর গ্রামের মানুষ জয়তুন মিয়াঁর বাড়ি। ইনি একজন শাদিওয়ালা।"

"এই বস্তুটি কী?" মৃদু হেসে ব্যান্ডোদা জানতে চাইলেন।

"যেসব বাঙালি স্থানীয় মেমসায়েব বিয়ে করে বিলেতেই ঘরসংসার পাততে সমর্থ হতেন বঙ্গীয় সমাজে তাদের শাদিওয়ালা বলা হতো। এঁদের

সামাজিক সম্মান একটু বেশি ছিল।”

“তারপর?”

“কিছুদিন পরে আমাদের মশরফ আলি শালিমার রেস্তোরাঁয় চাকরি পেয়ে গেলেন। মনে রাখা ভাল, তখন বেশির ভাগ ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয়, এমনকি বীরস্বামীতে ওয়েটাররা মাইনে পেতেন না। নির্ভর একমাত্র বকশিস বা টিপ্‌স। কিন্তু শালিমারে তখন মাইনে সপ্তাহে এক পাউন্ড—তবে নো টিপ্‌স, যা বকশিস সংগৃহীত হতো তা অন্যত্র চলে যেতো। ওখান থেকে মশরফ গেলেন তাজমহল রেস্তোরাঁয়, সাপ্তাহিক মাইনে এক পাউন্ড ১৫ শিলিং। এর পরেই ওঁর সঙ্গে আলাপ হয় অশোক মুখার্জির। তিন পাউন্ড বেতন নিয়ে মশরফ আলি চলে এলেন অশোকবাবুর দরবার রেস্তোরাঁয়।

“যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে নতুন বিপদ। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে মশরফ আলির ওপর নোটিস পড়লো। নোটিস এড়াবার জন্য চটজলদি মশরফ আলি আবার বাণিজ্যিক জাহাজে ফিরে গেলেন।

“১৯৪২ সালে অনেক ঘা খেয়ে মশরফ আলি আবার লন্ডনে ফিরে এলেন এবং ইছরাইল মিয়ার সঙ্গে পার্টনারশিপে অ্যাংলো-এশিয়া রেস্তোরাঁ খুললেন। এই সময় বিলেতে খাদ্যদ্রব্যের কড়া রেশনিং। রেস্তোরাঁ খোলার জন্যেও লাইসেন্স দরকার। মশরফ আলি পাকড়াও করলেন তাঁর পুরনো মালিক হিন্দুস্তান রেস্তোরাঁর চাটওয়ালকে। সহৃদয় চাটওয়াল তাঁকে পাঠালেন ভারতীয় হাইকমিশনার রঙ্গনাথনের কাছে। পরোপকারী রঙ্গনাথনের সুপারিশের জোরে মশরফ আলি অল্প সময়ের মধ্যে লাইসেন্স পেয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে রঙ্গনাথন একবার অ্যাংলো-এশিয়াতে ডিনার খেতে আসেন। কৃতজ্ঞ মশরফ পয়সা নিতে চাইলেন না। কিন্তু রঙ্গনাথন শুনলেন না, বললেন, ভারতীয়দের সাহায্য করবার জন্যেই আমি ভারতীয় হাইকমিশনার। আপনারা ব্যবসায় আরও উন্নতি করুন। এই রেস্তোরাঁ খুলতে দুই পার্টনারের তখনকার দিনে মাত্র সাতশ পাউন্ড লেগেছিল।”

“তোর সিলেটি বন্ধু তো দেখছি লন্ডনের হাঁড়ির খবর জোগাড় করে ফেলেছে।” ব্যান্ডোদা এমন বিস্তারিত বিবরণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

“এই ভদ্রলোক বেশি কথা বলেন না, কিন্তু খবরের স্বর্ণখনি—বিলেতের

বাঙালি সম্বন্ধে লিখতে গেলে নুরুল ইসলামের কাছেই হাতেখড়ি হওয়া প্রয়োজন।”

“মশরফ আলির এবার কী হলো?”

“ভীষণ কাণ্ড, ব্যান্ডোদা। ছটফটে মানুষটি। এক এক জায়গা ঘুরে আসেন এবং সেখানে এক একটা ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ খুলে বসেন। বিশ্বাস হয় না সাঁইত্রিশ বছরের কর্মজীবনে এই মশরফ আলি বিলেতে আঠারোটা রেস্তোরাঁ খোলেন। তার একটার নাম ছিল ‘ক্যালকাটা’, আরেকটি ‘দার্জিলিং’ এবং আর একটি ‘হিন্দুস্তান’, শেষ রেস্তোরাঁ হোবর্ন এলাকায় ‘কারি গার্ডেন’। ১৯৭৯ সালে এই রেস্তোরাঁ বেচে দিয়ে দেশে ফিরে আসেন মশরফ আলি। কিন্তু তিন বছর পরে তিনি আবার লন্ডনে পাড়ি দেন।

“মশরফ আলির আদি পার্টনার ইছরাইল মিয়াও সিলেট থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন ১৯৩১ সালে। জাহাজে চাকরি নিয়ে ইছরাইল মিয়াও প্রায় সাত বছর পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ১৯৩৭ সালে লন্ডনে নেমে পড়েন। কোনও আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় মাত্র ১৫ শিলিং মাইনেতে এক ইহুদির কাপড়ের দোকানে চাকরি নেন। এঁর ইংরিজি অক্ষরজ্ঞান ছিল না।

ব্যান্ডোদা বললেন, “তুই কায়দা করে দেখাতে চাইছিস, অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও সুদূর প্রবাসে বড় হওয়া যায় স্রেফ নিজের সাধনায়। এবং বাঙালিরাই এটা পারে এখনও।”

“ইয়েস ব্যান্ডোদা, এঁরা তো বিজনেস সৃষ্টি করবার জন্যে ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টদের সাহায্য পান না, তবু মাঝে মাঝে ভেলকি দেখিয়ে দেন, এমন ভেলকি যা ম্যাকিনসে অথবা আর্থার অ্যান্ডারসনের বিদ্যেবুদ্ধির অতীত। ধরুন ইছরাইল মিয়ার কথা। ইংরিজি পড়তে না জানলে লন্ডনে ওয়েটারের চাকরি পাওয়া যাবে না বুঝে ইছরাইল মিয়া অনেক চেষ্টায় বীরস্বামী রেস্তোরাঁর একখানা মেনু কার্ড জোগাড় করে সেটা কাকাতুয়ার মতন মুখস্ত করে নিলেন। ইংরিজী অক্ষরগুলি তাঁর কাছে ছবির মতন। চাকরির জন্যে ঘুরতে ঘুরতে ধূর্জটিপ্রসাদ চৌধুরীর খবর পাওয়া গেলো—ওয়াল স্ট্রিটে এঁর ইন্ডিয়া-বার্মা রেস্তোরাঁ চালু হয়েছে, সেখানে ওয়েটার প্রয়োজন। পদ একটি, কিন্তু প্রার্থী দু'জন। ইছরাইল মিয়া আর তাঁর

আত্মীয় আফছর মিয়া। ধূর্জটিপ্রসাদ এঁদের দু'জনকে মেনুকার্ড পড়তে দিলেন—আফছর সফল হলেন না, কিন্তু ইছরাইল আন্দাজে গড়গড় মুখস্ত বলে গেলেন। ইছরাইলের চাকরি হয়ে গেলো। কিন্তু দিনে ১৬ ঘণ্টা খাটতে হতো ইন্ডিয়া-বার্মায়। মাইনে মাত্র ১৫ শিলিং।"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করলেন ব্যান্ডোদা। "তোর বন্ধু নুরুল ইসলাম তো প্রচুর গবেষণা করেছেন।"

আমি বললাম, "ব্যান্ডোদা, বাঙালিরা যে কুঁড়ে, ভীতু এবং ঝুঁকি নেবার মতন কলজে তাদের নেই একথা যারা বলে তাদের জন্যে বিলেতে গরিব বাঙালিদের জয়যাত্রা সম্বন্ধে একখানা বই লিখে বিশ্বের প্রতি বাঙালির ঘরে বিনামূল্যে বিতরণ করা বিশেষ প্রয়োজন।"

ব্যান্ডোদাকে শুনিয়ে দিলাম ইছরাইল মিয়ার পরবর্তী খবর। মাঝেমাঝে তাঁর পরিশ্রমের মাত্রা ১৮ ঘণ্টা ছাড়িয়ে যেতো। যুদ্ধের সময় তিনিও আবার জাহাজি হলেন। ১৯৪২ সালে আবার বিলেতে ফিরে এসে মশরফ আলির সঙ্গে অ্যাংলো-এশিয়া রেস্তোরাঁ খুললেন। একে একে ১২টি ইন্ডিয়ান ভোজনালয়ের মালিক হয়েছেন তিনি। এর মধ্যে একটার নাম ছিল 'ভোগ'। ইংরিজি 'ভোগ' নয়, বাংলা 'ভোগ', তিনটের নাম ছিল মতিমহল। ভাগ্য পরিবর্তন করে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়ে তিনি স্বদেশে পঞ্চাশ বিঘা জমির ওপর বাড়ি করেছিলেন। যথাসময়ে মেমসায়েব বিয়ে করে ইনিও শাদিওয়ালা হন। মেমসায়েবের মৃত্যুর পরে ইনি দেশে গিয়ে আবার নতুন করে সংসার পাতেন।

ব্যান্ডোদা আন্দাজ করলেন, "ইন্ডিয়ান ডিশ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই এঁরা দু'জনেই এক্সপার্ট ছিলেন।"

আমি বললাম, "এই সব প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালির মধ্যে বহুরকম দুর্লভ গুণের সমন্বয় হয়েছিল। এঁদের প্রধান গুণ দুর্জয় সাহস। শুনুন একটা গল্প। লন্ডনের জেরার্ড প্লেসে ইছরাইল মিয়ার দোকানের নাম ছিল ইন্ডিয়া কফি বার। ১৯৪৪ সালে দুটি দৈত্য আকারের মার্কিন সৈন্য ওখানে আহার করে পয়সা না দিয়ে তাচ্ছিল্যভরে চলে যেতে চাইলো। ইছরাইল মিয়া হইচই বাধিয়ে এদের দু'জনকে দোকানের ভিতর টেনে আনলেন। দোকানের

দরজায় তালা পড়ে গেছে ততক্ষণে। সৈন্য দু'জন গালাগালি করে বললো, তারা কালা আদমির রেস্তোরাঁয় খেয়ে কখনও পয়সা দেয় না, সাদা আদমি যে এখানে খেয়েছে এটাই তো যথেষ্ট সম্মানের। দুঃসাহসী ইছরাইল মিয়া কিচেন নাইফ হাতে নিয়ে জানিয়ে দিলেন, পয়সা দিতেই হবে। সায়েবরা রিভলবার বার করে বললেন, জানো এটা কি? ইছরাইল বললেন, জানি এটা রিভলবার। কিন্তু তোমরাও জেনে রাখো, মাত্র একটা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমেরিকা থেকে তোমরা এখানে এসেছো, আর আমি এখানে হাজির হয়েছি সাতটা সমুদ্র পেরিয়ে। আমার সমস্ত ভয় পানিতে মিশে গিয়েছে। সায়েবরা তখন বাধ্য হয়ে ১৩ শিলিং ৪ পেন্সের বিলের জন্য এক পাউন্ডের একখানা নোট টেবিলে রেখে বললো, কিপ দ্য চেঞ্জ। যাবার সময় আরও বললো, গুড বাই গ্রেট লিট্ল ম্যান।"

ব্যাণ্ডোদা বিমোহিত। "দেখা যাচ্ছে, বিলেতের ভারতীয় খানার ইতিহাস আসলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস! ওয়ান সাগর ভার্সেস সপ্তসাগর, ব্যাপারটা খুবই চিত্তাকর্ষক, কখনও আমার মাথায় আসেনি।"

"প্রবাসী বাঙালিদের উদ্ভাবনী শক্তিও কম ছিল না, ব্যাণ্ডোদা। যুদ্ধের সময় চালের ভীষণ অভাব—অথচ চাল ছাড়া লন্ডনের ভারতীয় রেস্তোরাঁ প্রায় অচল। তখন গ্রিন মাস্ক রেস্তোরাঁয় সিলেটি শেফ মাথা খাটিয়ে ম্যাকারনিকে ভাতের মতো রেঁধে মাংসের কারির সঙ্গে বিক্রি আরম্ভ করেন। প্রচারের জন্যে প্রথমে দিনে ম্যাকারনি-কারি বিনামূল্যে পরিবেশন করা হলো, ফলে ভীষণ কাণ্ড, রাতারাতি এই ডিশের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠলো। এখানকার শেফের নাম ছিল আইন উল্লা এবং তাঁর সহকারী কিচেন পোর্টার ছিলেন তোতা মিয়া।"

ব্যাণ্ডোদা মন্তব্য করলেন, "তা হলে বোঝা যাচ্ছে, ভারতীয় রান্নার বিশ্ববিজয়ের পিছনে রয়েছে ভাল রান্না, উদ্ভাবনী শক্তি ও বাঙালিদের দুর্জয় দুঃসাহস।"

"আরও একটা শক্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যা বাঙালিদের নজরে পড়া উচিত। সেটা হলো দেশাত্মবোধ, সেই সঙ্গে প্রবাসে পরস্পরকে সাহায্য করবার প্রবণতা। প্রবাসী চীনাদের মধ্যে এই গুণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে,

আপনি নিজেই সেবারে আমাকে বলেছিলেন।”

মিটিমিটি হাসছেন ব্যান্ডোদা, “এই যে শুনি বাঙালি বিদেশে গিয়েও দল পাকায়, কাঁকড়া মনোবৃত্তির ঝগড়াঝাটি পাকিয়ে নিজেদের আরও দুর্বল করে তোলে।”

“ব্যান্ডোদা, সবদেশে সবসময় খারাপ খবরগুলোই তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু গ্রিন মাস্ক রেস্তোরাঁর খবর আমাদের কাছে পৌঁছয় না। এই রেস্তোরাঁ কেনবার চেষ্টা করছিলেন আবদুল মান্নান সায়েব ও তাঁর পার্টনার বাতির মিয়া। ওঁদের হাতে তখন আছে দেড় হাজার পাউন্ড, অথচ রেস্তোরাঁর দাম দিতে হবে চার হাজার পাউন্ড, সাজাতেগোছাতে লাগবে আরও এক হাজার পাউন্ড—মোট পাঁচ হাজার পাউন্ড। ওঁদের বাঙালি বন্ধু-বান্ধবরা খবর পেয়েই হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। তাঁদের অবস্থাও তেমন ভাল নয়। কিন্তু অনেকেই সপ্তাহের মাইনে পাওয়া প্যাকেট ওঁদের দিকে এগিয়ে দিলেন। প্রত্যেককে দু' পাউন্ড ফিরিয়ে দিয়ে বাকিটা নিলেন মান্নান সায়েব। কয়েক সপ্তাহে গ্রিন মাস্ক কেনার টাকা উঠে গেলো। অবশ্য সমস্ত দেনা অতি অল্প সময়ের মধ্যে শোধ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, কারণ চালু রেস্তোরাঁয় তখন লাভের পরিমাণ মোট বিক্রির প্রায় অর্ধেক।”

“প্রবাসে সম্প্রদায়গত সৌহার্দ্য ও সাহায্য—এটা একটা দামি পয়েন্ট, মুখুজ্যে। আমাদের রিসার্চ পেপারে অবশ্যই এবিষয়ে উল্লেখ রাখতে হবে।”

অধ্যাপক সর্বদমন রায়ের বাড়িতে বৈদ্যুতিক ডোর বেল বাজিয়েই চলেছি, কিন্তু কোনও সাড়া নেই। শেষে সাবেকি পন্থায় কড়া নাড়তে ফল হলো। সর্বদমন রায়ের দোষ নেই, ঐ অঞ্চলে তখন বিপুলবিক্রমে লোডশেডিং চলছে।

সর্বদমন বললেন, “লোডশেডিং হয়েছে বললে এখন মন্ত্রীদের গোঁসা হয়, ওটা নাকি লোকাল ফল্ট! আমি মশাই মোমবাতি জ্বালিয়ে আপনাদের রিসার্চের কাজ করে চলেছি।”

“রায়সাহেব, এ যাত্রায় আমাদের যে কী গতি হবে তার ঠিক নেই। হয় আমরা লন্ডনের বাঙালি রেস্তোরাঁয় বসে সুইসাইড খাব, না হয় ব্যান্ডোদার

সঙ্গে পাড়ি দেবো পেরু অথবা বলিভিয়া!"

"দুগ্গা দুগ্গা! সকালবেলায় আত্মহত্যার কথা তুললেন—আত্মহনন মহাপাপ থেকে কোনওরকমেই মুক্তি নেই, শাস্ত্রে বলছে।"

"প্রফেসর রায়, আমি সায়েবদের ঝাল প্রীতির ব্যঙ্গ করেছি। লন্ডন রেস্তোরাঁয় সব খাবার নাকি তিন রকম থাকে। যেমন ধরুন : হট, ভেরি হট এবং সুইসাইড। ভেরি হটেই আপনি আমি ভিরমি খাবো, আর সায়েবের পো আরও ঝাল খেয়ে পাগল হবার জন্যে বেপরোয়া স্টাইলে অর্ডার দেবে সুইসাইড। ওই জিনিস মুখে যাবার পরে রেস্তোরাঁয় দাপাদাপি শুরু হয়ে যাবে, মনে হবে যেন বোষ্টমপার্টির কেত্তন শুনছেন।"

প্রফেসর রায় আজ উত্তেজিত হয়ে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নতুন ক্লাসে তিনটি মেয়ের নাম সবিতা, কেতকী ও বিপাশা।

"হয় না মশাই! খোঁজখবর না করে ফুটফুটে ইন্ডিয়ান মেয়েদের এমন বেমক্কা নাম বাপ-মা কেমন করে দেয়? ঋগ্‌বেদে সবিতা তো পিতা! কেতকী ফুল তো ক্লীবলিঙ্গ, একই অবস্থা বিপাশার। এসব কথা সকলের সামনে মেয়েগুলোকে বলি কেমন করে?"

"গতবারেও আপনি ওই রকম একটা ভুলের কথা বলেছিলেন। সম্ভ্রান্ত শব্দের অর্থ অবশ্যই অভিজাত নয়—যিনি বড় রকমের ভুল করেছেন তিনি (সম+ভ্রম+ক্ত) সম্ভ্রান্ত।"

"এই তো আপনি চমৎকার মনে রেখেছেন", খুশি হলেন সর্বদমন রায়।

আমার প্রশ্নের উত্তরে রায়সায়েব বললেন, "গোলমরিচ অতি প্রাচীন মশলা—আদিতে নাম ছিল কোলক। মুখে লালা আসে, পরিপাকে সাহায্য করে, স্নায়ুতন্ত্রে সজীবতা আনে, আলস্য ও বিযাদবায়ু রোধ করে—মরিচের কোনও তুলনা ছিল না প্রাচীন ভারতে। দক্ষিণ ভারতের চেরা দেশে এই মরিচ পাওয়া যেতো—এই চেরাই আজকের কেরালা! ব্যান্ডোদাকে বুঝিয়ে বলবেন, কারি শব্দটি আমরা বাংলাতেও তরকারির মধ্যে পাচ্ছি, আবার দক্ষিণ ভারতেও পাচ্ছি, ওরা মরিচকে কারি বলে। মাংস কষবার পক্ষে অপরিহার্য এই কারি। সরষে এবং মরিচ দিয়ে মেখে তেলে ভাজলে পদের নাম হয় থাল্লিতকারি। ভাজা মাংসর নাম পোরি-কারি। যে অর্থে

সায়েবরা এখন কারি শব্দটি ব্যবহার করছেন তা অনেক সুদূরপ্রসারী—যে কোনও ব্যঞ্জনই বিলেতের অজ্ঞ সায়েবদের কাছে কারি।"

আমার প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসর সর্বদমন রায় আরও বললেন, "জেনে রাখবেন, বেদে অন্তত আড়াইশো রকমের মাংসের উল্লেখ আছে। বৈদিক বাজারে এক একটি স্টলে এক এক রকম মাংস বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। যেমন—অরাবিকা (ভেড়া), শূকরিকা (শূকর), নগরতিকা (হরিণ), শকুন্তিকা (মোরগ), গিধবুদ্দকা (কচ্ছপ)। কিছু মনে করবেন না, সুপক্ক ঘোড়ার মাংস বিক্রির উল্লেখও দেখতে পাচ্ছি। এদেশের আর্যরা পোলাও খাচ্ছেন দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে। রামায়ণে সীতা পোলাও রাঁধছেন, আর মহাভারতে পাণ্ডবরা কিমা কারি সহযোগে ভাত খাচ্ছেন মহানন্দে!"

রায় জানালেন, "সেযুগে অন্নপ্রাশন ও শ্রাদ্ধেও মাংসের প্রচলন ছিল। শিশুকে যেমন জিনিস দেবে পরবর্তীকালে তার প্রকৃতি তেমনি হবে। পাঁঠার মাংসে বলশালী, তিতিরের মাংসে সন্তভাব, মাছে শান্তভাব এবং ঘি-ভাতে গৌরবশালী হবার ইঙ্গিত রয়েছে। শ্রাদ্ধে প্রয়োজন হতো গণ্ডারের মাংস। বলতে লজ্জা নেই, বাঁদরের মাংসও বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষে গ্রহণীয় ছিল।"

রায়সাহেব সবিনয়ে জানালেন, "তবু মনে রাখবেন, ভারতের সিকিভাগ লোক এখনও স্বেচ্ছায় শাকাহারী—দুনিয়ার ইতিহাসে এমন যুগান্তকারী ঘটনা কোথাও ঘটেনি এই ইন্ডিয়া ছাড়া। আমাদের এই বাংলাতেও শতকরা ৬ জন মানুষ শাকাহারী। সবচেয়ে বেশি শাকাহারী গুজরাতে (৬৯%), রাজস্থানে (৬০%) এবং উত্তরপ্রদেশে (৫০%)।"

"মাদ্রাজীরা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"খুব ভুল ধারণা। ওরা মাংসর যম! প্রতি পাঁচজনে মাত্র একজন শাকাহারী তামিলনাড়ুতে।"

আজ কিছু খাবেন না আচার্য রায়—নিষ্ঠাবান মানুষ। বললেন, "খেতেও যেমন, না খেতেও তেমন সেকালের ভারতীয়রা। প্রাচীন যুগে পাঁচরকমের না-খাওয়ার সঙ্গে আমরা পরিচিত—একনাথ : এক দুপুর থেকে আরেক দুপুর অনাহার। উপবাস : এক দুপুর থেকে তৃতীয় দুপুর। কৃচ্ছ্র : দু'দিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনাহার। তারপর তৃতীয় দিনে না চেয়ে যা পাওয়া

যায় তাই ভোজন। পারক : তিন দিন দুপুরে অনাহার, তারপর তিন সন্ধ্যায় অনাহার, অবশেষে পুরো তিনদিন তিন রাত অনাহার। চান্দ্রায়ণ : সম্পূর্ণ অনাহার থেকে শুরু করে একটু একটু আহার বাড়িয়ে চোদ্দ দিন, তারপর আবার একটু একটু কমিয়ে চোদ্দদিন। আরও আছে : সান্ত্বা!"

"এসব খবর সায়েবদের সরবরাহ্ করে লাভ নেই। একবার উপোসের দিকে শ্বেতাঙ্গদের নজর গেলে বিলেতের বাঙালি রেস্তোরাঁগুলো বেশ বিপদে পড়ে যাবে।"

ব্যান্ডোদার জন্যে অন্য প্রশ্নে এলাম। "প্রাচীন ভারতে লঙ্কার সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় ছিল না, তা বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নেওয়াই তো সঙ্গত?"

"তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। প্রাচীন ভারতে পাচ্ছি মাত্র জিরে, পিপুলী এবং সর্ষপ! এমনকি ঝাল ঝাল লবঙ্গও এদেশে ছিল না। এই মশলাটি ইংরেজরা নিয়ে এসেছে এদেশে।"

"প্রায় পাঁচ হাজার বছর ইন্ডিয়ানরা লঙ্কা ছাড়া রান্নাঘর সামলিয়েছে একথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না—এমনকি জার্মান গবেষকরাও। তাঁরা ধরে বসে আছেন লঙ্কার জন্ম এই ইন্ডিয়ায়।"

"যে বস্তুতে আমাদের অধিকার ছিল না তা দাবি করাটা অন্যায়, ব্যান্ডোদাকে বলবেন।" জানালেন সর্বদমন রায়।

"রায়সায়েব, তা হলে প্রবলপ্রতাপ মোগল সম্রাটরাও লঙ্কার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন?"

"অন্তত জাহাঙ্গির পর্যন্ত কেউ যে লঙ্কার স্বাদ পাননি, তা জোর করে বলা যায়। সম্রাট শাজাহানের সময় লঙ্কা এলো এদেশে, সম্ভবত গোয়াতে প্রথম। সম্রাট শাজাহানের ইতিহাস তন্নতন্ন করে দেখতে বলুন ব্যান্ডোদাকে, হয়তো ঝাল লঙ্কা সম্বন্ধে নতুন কিছু তথ্য পেয়ে যাবেন।"

সর্বদমন এবার পিপুলী সম্বন্ধে কিছু খবর দিলেন। "যে পিপুল দিয়ে আমাদের পাঁচ হাজার বছর কটুরসের স্বাদ নিতে হয়েছে, বেদে তাকে বলা হয়েছে কণ।"

"ওঃ, রায়সায়েব আপনি বিপুল বিক্রমে কতো খবরই সংগ্রহ করে রেখেছেন।"

"ব্যান্ডোদার জন্যে দু' দিন বড়বাজারে বেনের দোকান চষে বেড়িয়েছি। সূক্ষ্ম হয়ে শরীরে প্রবেশ করে বিকৃত রসধাতু পান করে নেয় এবং সূক্ষ্ম হয়েই নির্গত হয়ে যায়, তাই এই নাম। কণের প্রিয় জন্মভূমি মগধ দেশ। তাই আর এক নাম মাগধি। শুধু মশলা নয়, ভেষজ হিসেবে হাজার হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এই পিপুলকে পর্যবেক্ষণ করছেন। কণ্ঠরোগে, তৃষ্ণা রোগে, শিরোবিরোচনে, হিক্কা দমনে, শীতপ্রশমনে এর তুলনা নেই।"

"শীতপ্রশমনে কালো মরিচেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। স্বামী বিবেকানন্দর জীবনী পড়ে দেখবেন। ওঁরা একবার হিমালয়ে আচমকা তুষারবৃষ্টির মধ্যে পড়ে যান। পথ হারিয়ে কোনওরকমে একটা গুহায় আশ্রয় নিলেন। সেই সময় সামনে অনিবার্য মৃত্যু। তখন একজন সহযাত্রী সান্যালমশায়ের কাছে কয়েকটা গোলমরিচ ছিল। সেই মরিচ মুখে দিয়ে কোনওরকমে সে যাত্রায় প্রাণরক্ষা হলো!"

বড়বাজারে গিয়ে অধ্যাপক রায় নানারকম পিপুলী দেখে এসেছেন—মাগধি, গজপিপুলী, সিংহলী এবং বনপিপুলী। সিংহলী পিপুলীকে বাজারে জাহাজি পিপুলী বলে।

রায়সায়েব দয়াপরবশ হয়ে আমাকে কয়েকটি নমুনা দিলেন মুখে পুরবার জন্যে। ঝাল আছে, কিন্তু এমন কিছু নয়। এই পিপুলী দিয়ে আমরা কী করে ইংলন্ডের কারিযুদ্ধে জয়ী হতাম?

অধ্যাপক রায় উপদেশ দিলেন, "নিয়মিত পিপুলী খেতে পারেন, মেদহ্রাসে অদ্বিতীয়! মেধাহ্রাস রোধেও অনেকে পিপুলী ব্যবহার করেন।"

আমার নোট বইয়ের পাতার দিকে তাকালাম। ব্যান্ডোদা গোলমরিচের ইতিহাস সংগ্রহে আমাদের দু'জনকে নিয়ে ক'দিনের জন্যে কেরালায় যাবেন। অধ্যাপক রায় কেরলদেশে কখনও গমন করেননি, অথচ ভাস্কো দা গামার জীবন সম্বন্ধে তাঁর প্রবল আগ্রহ রয়েছে।

আমাকে বললেন, "গোলমরিচের ইতিহাস মানেই তো চার হাজার বছরের মানুষের ইতিহাস, মুখুজ্যে মশাই। টু থাউজেন্ড বি সি-তেও ইন্ডিয়া

সদর্পে মরিচ রপ্তানি করছে মধ্যপ্রাচ্যে, সেই সঙ্গে দারুচিনি। ইজিপ্টের ফারাওদের মমিতে ইন্ডিয়ার অত্যাশ্চর্য মশলা ব্যবহার হচ্ছে অন্তত ১৭০০ বি সি থেকে। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন! এই মরিচের সন্ধানে যুগযুগান্ত ধরে ফিনিসিয়ান, সিরিয়ান, ইজিপসিয়ান, গ্রীক, রোমান, আরব এবং চাইনিজরা আমাদের দেশে হাজির হয়েছে। রোমানরা মরিচের বদলে ভারতবর্ষকে সোনা দিতো। ভেনিস ও জেনোয়া ঘুরে ভারতবর্ষের এই মরিচ রোমে হাজির হতো। তিনশো বছর (পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত) ভারতীয় মরিচের ব্যবসা একচেটিয়াভাবে ভেনিসের হাতে ছিল।"

"ইংলন্ডে মরিচের খবর পৌঁছতে দেরি হয়—নর্মানরা ইংলন্ড জয়ের পর অভিজাত ধনীরা প্রথম মরিচের স্বাদ পেলেন। বহুদিন ধরে সোনা রুপোর মতন মূল্যবান ছিল এই মরিচ। মরিচ দিয়ে ট্যাক্সো দেওয়া যেতো, দেনা শোধ করা যেতো—সাড়ে চারশো গ্রাম মরিচের বদলে পাওয়া যেতো বেশ কয়েকটি ভেড়া।"

আমি বললাম, "ডানলপ কোম্পানিতে একসময় উঁচুপদে একজন পেপারকর্ন সাহেব ছিলেন—পরে তিনি বিলেতের পিলকিংটন কোম্পানির বড় কর্তা হন। এই পেপারকর্নের মানে যে মরিচ দিয়ে দাম দেওয়া এটা আমি জানতাম না। নিশ্চয় প্রাচীন কোনও পরিবার।"

মজার ব্যাপার। ভেনিসের লোকরা ক্রমশ মরিচের জন্যে এতো বেশি দাম চাইতে লাগলো যে পর্তুগিজ ও স্প্যানিশরা মশলার দেশ ভারতে আসবার জন্যে নতুন জলপথ সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজরাও তখন ব্যগ্র মরিচের উৎপাদনস্থলে সোজা চলে যেতে। স্পেনের রাজা যে কলম্বাসের পিছনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঢালতে রাজি হলেন তার কারণ কলম্বাস বোঝালেন, আটলান্টিক মহাসাগরের অপর প্রান্তে রয়েছে ভারত ও চীনের মহামূল্যবান মশলাসম্ভার।

এরপর তো পর্তুগিজ ভাস্কো ডা গামার গল্প। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভাস্কো ডা গামা ভারতে আসতে চাইলেন, যাতে কমদামে সোজাসুজি মরিচ মশলা কেনা যায়, মধ্যিখানে যেন তৃতীয়পক্ষ না থাকে। কেনিয়া থেকে ভারতীয় নৌ-বিশারদ ইবন মজিদ পথ দেখিয়ে ভাস্কোকে নিয়ে এলেন

আজকের কোজিকোড় অথবা কালিকটে।

ভাস্কোর পরে কালিকটে এলেন পেদ্রো আলভারিস কাব্রাল। এঁকে স্থানীয় বিক্ষুব্ধরা নৃশংসভাবে হত্যা করে।

প্রতিহিংসা নেবার জন্যে ভাস্কো আবার সদলবলে ভারতে ফিরে এলেন এবং রাজাকে পরাভূত করে পর্তুগালে ফিরে গেলেন ১৫০৩ সালে। ভারতীয় মরিচের ব্যবসা এবার পর্তুগিজরা কব্জা করলো। একটা জাহাজে যেতো ১৫০০ টন গোলমরিচ, আঠাশ টন আদা, সাত টন লবঙ্গ এবং ন'টন দারুচিনি। শোনা যায় প্রথমবার ভাস্কো ডা গামা এদেশ থেকে যা মশলা নিয়ে গিয়েছিলেন তাতেই তাঁর অভিযানের খরচের ছ' গুণ উঠে গিয়েছিল।

১৫৯১ সালে ইংরেজরা ভারতীয় মশলার জন্যে হন্যে হয়ে অভিযান শুরু করলো। চার বছর পরে ডাচরাও একই পথের পথিক হলেন—তাঁদের কোম্পানির নাম হলো ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। প্রথমবারে স্রেফ লবঙ্গ বেচে ২৫০০ পারসেন্ট লাভ হয়েছিল এঁদের।

১৬০০ সালের শেষ দিনে রানি এলিজাবেথের চার্টার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হলো ইংরেজের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। উদ্দেশ্য মশলার ব্যবসা। উদ্যোগের কারণ ডাচরা তাল বুঝে অযথা গোলমরিচের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

সর্বদমন রায় মহাশয়কে জিজ্ঞেস করলাম, "গোলমরিচের প্রতি দুনিয়ার মানুষের এতো বেশি টান কেন?"

সর্বদমন উত্তর দিলেন, "মরিচ না হলে ইউরোপের আধপচা মাংস তখনকার সাহেবরা খাবে কী করে?"

"সাহেবদের মাংস আধপচা কেন, রায়সাহেব?"

"তা হলে তো আপনাকে ইউরোপিয়ানদের আদি দারিদ্র্য নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। তখন শীতের আগে সায়েবদের নানা দুর্ভোগ হতো। শীতের সময় কোথায় পাওয়া যাবে পশুদের খাদ্য? তাই শীত আসবার ঠিক আগেই সমস্ত পশু হত্যা করে মাংস স্টক করা হতো। সেযুগে তো ডিপ ফ্রিজ নেই—ভরসা কেবল নুন এবং মরিচ। তাই মরিচের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠতো সমস্ত ইউরোপীয় মহাদেশ। মরিচের সেই মায়ামোহ

থেকে আজও মুক্তি মেলেনি পশ্চিমের, যদিও চার মাসের মাংস এখন ফ্রিজবিহীন অবস্থায় স্টক করে রাখার প্রয়োজন হয় না।"

আমার চিন্তা, ব্যান্ডোদা অতো সহজে সন্তুষ্ট হবেন না। জিজ্ঞেস করবেন, এতো মরিচের দাম গরিব সায়েবরা ভারতবর্ষকে কোথা থেকে দিতেন? ধরে নিচ্ছি, মরিচের পুরো দাম আমাদের হাতে আসতো না, মোটা অর্থ মেরে দিতো এই মাঝপথের দালালরা যাদের বোম্বেটে ছাড়া অন্য কিছুই বলা চলে না।

"এ আর এমন কী কথা? যে কোনও হিস্ট্রি বই খুললেই খবরটা পেয়ে যাবেন। মধ্যযুগের ইউরোপ আমাদের কাছ থেকে নিয়মিত নিতো মশলা, গয়নাগাটি আর মিহি কাপড়। পরিবর্তে ইংরেজরা পাঠাতো গরম জামাকাপড়, ওলন্দাজরা নোনা হেরিং মাছ, আর স্প্যানিশ ও ফরাসিরা স্রেফ লবণ। বিদেশের বাজার থেকে ভারতবর্ষ আরও কিনতো তামা ও পার্সিয়ান কার্পেট। সুদৃশ্য গালিচার দিকে ধনী ভারতীয়দের নজর বহুদিন ধরে।"

জরুরি তলব পেয়ে আবার নতমস্তকে তাজ বেঙ্গলে ব্যান্ডোদা দর্শনে হাজির হয়েছি। তাঁর সুইটে প্রবেশ করে ঘরে দেখি এক বিচিত্র দৃশ্য।

ছোট ছোট পুরিয়ায় ব্যান্ডোদার বিছানার ওপর ও কার্পেটের ওপর অসংখ্য মশলার পুরিয়া ছড়ানো রয়েছে। মেঝেতে হাফ প্যান্ট পরে বসে ব্যান্ডোদা প্রত্যেক পুরিয়ায় মার্কার কলম দিয়ে নম্বর লিখছেন এবং একটা খুদে খাতায় কীসব নাম লিখে রাখছেন।

"একি করছেন, ব্যান্ডোদা? আপনি যে তাজ বেঙ্গলকে বড়বাজারের বেনে মশলার দোকানে রূপান্তরিত করলেন।"

"উপায় নেই রে, এই পিপুল তো বাবার জন্মে দেখিনি। কালো মরিচের মায়ের পেটের ভাই শাদা মরিচের যে এতো রকম ভ্যারাইটি এসব নিজের চোখে না দেখলে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতো না। আর সায়েবি নামের সঙ্গে দিশি নামের গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আজকাল সায়েবরা আমাদের লজ্জা দিতে চায়, ব্ল্যাক পেপার না বলে কালা মরিচ বলতে চায়। শুনে রাখ, পিকিং যদি বেজিং হয়ে যায়, মাদ্রাজ যদি চেন্নাই হয়ে যায়, বোম্বাই যদি

মুম্বাই হয়ে থাকে, এমনকি ক্যালকাটা যদি কোলকাতা হয়ে যায় তা হলে সায়েবদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তোমার ছাগল তুমি যেদিক থেকে ইচ্ছে কাটো, তবে ডলার অথবা পাউন্ডে নগদ দামটা দিয়ে দিও।"

ব্যান্ডোদা এবার আমার হাতে দু'খানা অভিধান ধরিয়ে দিলেন—বাংলা থেকে ইংরিজি এবং ইংরিজি থেকে বাংলা। বললেন, "ঝটপট বলে যা আর আমি ল্যাপটপ কম্পুটারে ঢুকিয়ে নিই।"

"টারমেরিক হলো হরিদ্রা—এটা আবার সংস্কৃত শব্দ নয়, আদি মুণ্ডা ভাষা থেকে এসেছে। করিয়ান্ডার হচ্ছে ধনে অথবা ধন্যকা। তুলসীর ইংরিজিটা যেন কী?"

"সেকরেড্ ব্যাসিল—বহু রকমের তুলসী আছে, বেঙ্গল ক্লাবের স্টুয়ার্ট দত্তসাহেব একদিন আমাকে ট্রেনিং দেবার চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। ক্যাটাচু হচ্ছে খয়ের অথবা খদির।"

"জিঞ্জারের আদা ছাড়া আর কোনও নাম আছে?" জিজ্ঞেস করলেন উৎসাহী ব্যান্ডোদা।

"বইতে আদ্রক লেখা আছে। আপনাকে মনিয়ার উইলিয়মসের সংস্কৃত-ইংরিজি অভিধানও কিনতে হবে। স্বয়ং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গাঁটের টাকা খরচ করে বিরাট এই বই ছাপিয়েছিলেন, এখনও মানুষের কাজে লাগছে। আমার মা প্রায়ই বলতেন, পচা আদায় পোড়ে গাল।"

"ওটা আর চাউর করিস না, প্রচণ্ড ঝাল আছে শুনলে বিলেতের সায়েবরা এখনই আদা পচিয়ে, পেটেন্ট নিয়ে বাজারে বিক্রির জন্যে পাঠাবে। স্রেফ ঝালের জন্যে একটা জাত হঠাৎ এমন পাগল হয়ে উঠবে তা ভাবা যায় না।"

পরের প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, "ব্যান্ডোদা, আই অ্যাম স্যরি, পানের সংস্কৃত নাম হিসেবে যে তাম্বুল শব্দটি চালাতাম ওটা আর্যদের নয়, ওঁরা ওটা মেরে দিয়েছেন মুণ্ডাদের কাছ থেকে।"

"পিপুলী ব্যাপারটা সায়েবরা এখনও বোঝে না, বৈজ্ঞানিক বইতে খুঁজে পাবে লং পেপার বলে। কিন্তু ঝাল আছে শুনলেই, সায়েবরা কয়েক টন পিপুলী ইমপোর্ট করে নেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। সবচেয়ে মজার

"তুই বলছিস ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস এটসেটরা এই পাঞ্চেই মজে থাকতেন?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "নেবেন একটা বিলিতি পাঞ্চের রেসিপি? অতি প্রাচীন ফর্মুলা। দু' বোতল আরকে প্রথমে তিরিশটা লেবু ভিজিয়ে দিন—মজুক ১২ ঘণ্টা ধরে—এবার ওই দু' বোতল আরক ফেলে দিয়ে লেবুগুলো চুবিয়ে দিন ১০ বোতল আরকে। তাতে ঢালুন ৬ বোতল ব্রান্ডি অথবা রাম। এবার এতে ঢালুন আড়াই বোতল লাইম জুস, ১২ পাউন্ড ভিজে চিনি এবং ৮ কোয়ার্ট ফুটন্ত দুধ। এবার একের পর এক চোদ্দ বোতল ফুটন্ত জল ঢালতে থাকুন। এইবার পানীয়কে ঠাণ্ডা হতে দিন। ঠাণ্ডা অবস্থায় ফিলটার করুন। স্বর্গসুখের পানীয় তৈরি। ইন্ডিয়া প্রত্যাগত বিলিতি সায়েবদের নেশা মেটাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদামশাই প্রিন্স দ্বারকানাথ বিদেশে এই রাম এক্সপোর্ট করে টু পাইস কামিয়েছিলেন।"

মশলা প্যাকিং পর্ব শেষ করে ব্যান্ডোদা হোটেলের মার্সেডিজটা ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লেন গড়িয়াহাটার উদ্দেশে।

ব্যান্ডোদা জিজ্ঞেস করলেন, "কাঁচালঙ্কার বিভিন্ন ভ্যারাইটি কোথায় পাবো? এমন জায়গায় চল যেখানে পূর্ববঙ্গের বাঙালদের বসবাস একটু বেশি।"

"ব্যান্ডোদা, আপনাকে আমি যাদবপুর, সন্তোষপুর থেকে আরম্ভ করে মধ্যমগ্রাম পর্যন্ত সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু বাঙালরা ঝালের মাস্টার এই ভুল আপনার ভাঙুক। বেঁচে থাক বাঁকুড়া, বেঁচে থাক মেদিনীপুর, ওসব জায়গায় লঙ্কা নয় তো যেন সাপের ছোবল! আর ঝালের কতো যে ভ্যারাইটি কী বলবো!

"আপনি ভাষাতত্ত্ববিদ ভক্তিভূষণ মল্লিকের সঙ্গে কথা বলুন—লঙ্কা কথাটা স্ল্যাং এবং অপরাধ জগতেও ঢুকে গিয়েছে। ধানি লঙ্কা মানে একটু ছোট হাইটের মেয়ে যার কথাবার্তায় গায়ে জ্বালা ধরে যায়।"

বাজারে হাজির হয়ে ব্যান্ডোদা যতোরকমের সম্ভব লঙ্কা সংগ্রহ করতে লাগলেন। মানুষের মতন লঙ্কাও নাকি দু' রকমের—দেখলে মনে হয় নিরীহ,

কিন্তু এমন ঝাল যে ব্রহ্মতালু ঘেমে ওঠে ; আর এক শ্রেণী দেখলে মনে হয় ভীষণ ঝাল, কিন্তু আসলে নির্বিষ। কলকাতাতেও যে প্রচুর পরিমাণে ক্যাপসিকাম পাওয়া যায় তা দেখে ব্যাণ্ডোদা খুব অবাক হয়ে গেলেন।

"এসব এ অঞ্চলে নতুন এসেছে। আমাদের ছোটবেলায় নিউ মার্কেট ও দার্জিলিং ছাড়া কোথাও ক্যাপসিকাম পাওয়া যেতো না, কিনতেন মেমসায়েবরা!"

একটু ভেবে ব্যাণ্ডোদা বললেন, "এখন প্রত্যেক মধ্যবিত্ত বঙ্গবধূই তো মেমসায়েব, আমার খেয়াল থাকে না।"

আমি বললাম, "অবাক কাণ্ড! ঘোমটার আড়ালে বাংলার বধূ থেকে বিলেতের মেমসায়েব পর্যন্ত সবাই এখন ঝাল লঙ্কার খপ্পরে পড়ে গিয়েছে।"

"অনেকের ধারণা, খেটে খাওয়া মানুষরা, যাদের একসময় আমাদের বাবুরা ছোটলোক বলতেন, কেবল তারাই লঙ্কার ভক্ত। ভদ্রলোকরা কেবল মণ্ডামিঠাই লুচিপরোটায় মজে থাকেন।" কিন্তু ব্যাণ্ডোদা এবার বিলেতে গিয়ে এই বাংলার উল্টো রামায়ণ দেখেছেন। "যে সায়েব কলেক্টর এদেশে লঙ্কার গন্ধ নাকে গেলে রেগে আগে ১৪৪ ধারা জারি করতেন তাঁর বংশধর এখন নিজের দেশে চেটে পুটে লঙ্কা খাচ্ছে এবং প্রয়োজনে হাপুস নয়নে চোখের জল ফেলছে।"

ব্যাণ্ডোদা ও সর্বদমন রায়কে আমি বলে ফেলেছি, "এবার মনস্তাত্ত্বিকদের দ্বারস্থ হতে হবে আমাদের। এই যে ঝাল খেতে-খেতে কষ্ট পাওয়া এবং কষ্ট পেতে-পেতে ঝাল খাওয়ার প্রবণতা এ তো আত্মনিগ্রহের আর এক অপরিচিত রূপ। একালের সম্পন্ন মানুষ কোন্ অবদমিত কামনার প্রভাবে এইভাবে নিজেকে জর্জরিত করবার জন্যে ঝালের পিছনে ছুটছে কে জানে?"

গড়িয়াহাট বাজারে বালতি কড়াইয়ের দর করলেন ব্যাণ্ডোদা। তারপর ক্যালকুলেটর দিয়ে অঙ্ক কষে বললেন, "সবচেয়ে কম সময়ে যদি কোটিপতি হবার বাসনা থাকে, তা হলে হাওড়া থেকে বালতি এবং কড়াই

হিথরোতে এক্সপোর্ট শুরু কর। সায়েবরা শুধু আমাদের ঝাল কারিকে আপন করে নেননি, চাইছেন সেই ঝাল-ঝাল কারি খুদে বালতি থেকে পরিবেশিত হোক। যে পিতলের বালতিতে কিছুদিন আগেও কাজের বাড়িতে তরকারি পরিবেশন হতো সে সব মিউজিয়ম পিস দু'দিন পরে সদবিতে নিলাম হবে এবং তা কেনবার জন্যে সায়েবরা লাফালাফি করবেন, তুই দেখে নিস।"

"হোয়াট নেক্‌সট্?" বালতির পরে কিসের ঢেউ আসতে পারে? বাজারের ফুটপাতে দাঁড়িয়েই ভাবছেন ব্যান্ডোদা।

"আমি বললাম কারি বিপ্লব তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন লর্ড কার্জনের বংশধররা কাঁটা চামচ ছেড়ে পাণিপাদং প্রক্ষালয়, ডানহাত দিয়ে ডালভাত খাওয়া শুরু করবেন।"

"আঃ, তোদের চিন্তাধারাটা বড়ই নেগেটিভ! ছুরি কাঁটার বাজারটা ঝপাং করে পড়ে যাবে এইটাই ভাবতে পারছিস, কিন্তু কোথায় বাংলার বাজারটা বাড়তে পারে তা আন্দাজ করতে পারছিস না। এই মানসিকতার জন্যে ক্যালকাটা থেকে তোরা কিছুই এক্সপোর্ট করতে পারছিস না।"

ফুটপাতের ওপর একজন ফেরিওয়ালাকে দেখে ব্যান্ডোদা সানন্দে প্রায় ইউরেকা বলে উঠলেন। নতুন কোনও আইডিয়া তিনি পেয়ে গিয়েছেন। বললেন, "লন্ডনের ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় প্রধান সমস্যা ন্যাপকিন—তেল লঙ্কা হলুদ মাখা কারি খেয়ে ঠোঁট মুছবার জন্যে সায়েবী ন্যাপকিনের জন্ম হয়নি—আর ধোপার বাড়িতে ন্যাপকিন পাঠিয়ে তার দাগ তোলা বেশ কঠিন ব্যাপার।"

এরপরেই ব্যান্ডোদার ব্রেন ওয়েভ। "এখান থেকে আমরা এখনই প্রতি সপ্তাহে বিলেতে বিশ লাখ ডিসপোজেব্‌ল ন্যাপকিন সাপ্লাই করতে পারি যাঁরা সিলেটি দোকানে কারি খেতে যাবেন তাঁদের জন্যে।"

"গামছা কথাটা সায়েবরা উচ্চারণ করতে পারবে?" আমার আশঙ্কা ব্যান্ডোদার কাছে চেপে রাখলাম না।

"যতো ঝাল, যতো শক্ত উচ্চারণ, তাতে ততো আকর্ষণ বোধ করছেন একালের সায়েবরা। তবে প্রয়োজন হলে একটা আকর্ষণীয় নাম ট্রেডমার্ক হিসেবে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিতে হবে।"

"হোয়াট অ্যাবাউট 'গামকিন'?" আমি ভয়ে ভয়ে প্রস্তাব পেশ করলাম।

"সাধু প্রচেষ্টা! গামছার গাম + ন্যাপকিনের কিন = গামকিন। সিলেটি রেস্তোরাঁয় খাওয়ার পরে সায়েব-মেম এই গামকিন বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন অ্যাজ এ সুভেনির।"

ফেরার পথে ইঙ্গিত করলাম, অদূরেই মিঠাই-এর প্রখ্যাত দোকান রয়েছে, এখানে অতি উপাদেয় সন্দেশ পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যান্ডোদা উৎসাহিত হলেন না। "এখন আমরা ঝালপর্বে রয়েছি, কোনওরকমে ঝালচচ্চড়ি পর্যন্ত এগোতে পারি ; কিংবা ঝালমুড়ি। সায়েবদের বাড়িতে যখন দই-সন্দেশ ঢোকানো সম্ভব হবে তখন আমরাও বিপুল পরিমাণে মিঠাই-এর মিষ্টি খাবো। লন্ডনে শ্রাবণী বসুর কাছে শুনলাম, পলাশির যুদ্ধের পরেই ক্লাইভ কী খানা খেয়েছিলেন সে নিয়ে বিবিসি রিসার্চ করেছে। ক্লাইভ সায়েব খেয়েছিলেন—চিকেন দোপিয়াজা, মালাই চিংড়ি এবং বিরিয়ানি। সন্দেশ রসগোল্লার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না, সুতরাং মিষ্টিতে সায়েবদের উৎসাহী করতে আর একটু সময় লাগবে।"

আজ সকালে এক সাউথ ইন্ডিয়ান টিফিন হাউসে ব্যান্ডোদা আমাদের দু'জনকে নিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যেই সবচেয়ে ঝাল রসম্ আমাদের সামনে পরিবেশিত হয়েছে উইথ ইডলি।

রসমে অকাতরে চিলি পাউডার ছড়াচ্ছেন আমাদের ব্যান্ডোদা।

"ব্যান্ডোদা! রিসার্চ ডান। কিন্তু সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকা বড় প্রয়োজন রয়েছে।"

প্রফেসর সর্বদমন রায় কিন্তু আমাকে সমর্থন করলেন না। তিনি বললেন, "বেশি লঙ্কা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এমন কোনও ঘটনার উল্লেখ লাস্ট দুশো বছরে কোথাও নেই। শরীরে ও মনে একটু ধাক্কা দেয়

এই পর্যন্ত, কিন্তু আক্রমণটা গান্ধিয়ান—একেবারে ননভায়োলেন্ট!"

আনন্দে ডগমগ হয়ে ব্যান্ডোদা করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "প্রফেসর রায়, আপনি এই অধম এন-আর-আই-এর হার্দিক অভিনন্দন নিন।"

সর্বদমন রায় জানালেন, "দশ হাজার বছর ধরে ইন্ডিয়ানরা ফরেনে যাচ্ছে। এন-আর-আই, অনাবাসী এসব নাম ঠিক জমে না। প্রাচীনকালে যাঁরা কাজের জন্যে দূরদেশে যেতেন তাঁদের বলা হতো গন্ধহারিণ!"

"সোর্স?" আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর সর্বদমন রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাই।

"আনন্দমূর্তি প্রভাতরঞ্জনের দু'একখানা বাংলা বই পড়ে নিন চটপট!"

"ওই গামকিন না কি একটা শব্দ আপনারা হাঁস-জারু স্টাইলে তৈরি করছেন। সংস্কৃতে ওর নাম : মুখমার্জনি। রেস্তোরাঁ সংক্রান্ত কয়েকটা শব্দ আপনাদের জন্যে সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি। টেবিল হচ্ছে কাষ্ঠকোষ। পিঁড়ি : পিণ্ডিক। ফর্ক্ : কণ্টকপত্র। খাবার টেবিলের ছুরি : কোষশায়িকা। আর চায়ের চামচকে বলা হতো ডিম্বকা। আমাদের সব ছিল, এখনও সব আছে—কেবল ধৈর্য ধরে একটু খুঁজে নিতে হবে, ব্যান্ডোবাবু।"

সর্বদমনের উদ্দেশে ব্যান্ডোদার প্রশ্ন : "ব্রহ্মচর্য পালন করলে শাস্ত্রে ঝাল খাওয়া বারণ কেন?"

প্রফেসর রায় : "বেদে তো ঝাল লঙ্কার উল্লেখ পেলাম না। বোধ হয়, প্রাচীন ভারতে ধারণা ছিল, অতিমাত্রায় ঝাল আমাদের সিস্টেমটা গরম করে দেয়।"

ব্যান্ডোদার মন্তব্য : "তা হলে বোঝা যাচ্ছে, যারা বলে সম্রাট শাজাহানের আমলে লঙ্কা এদেশে এলো, তার আগে লঙ্কার ল আমাদের জানা ছিল না, তারা মিথ্যে বলে না।"

সর্বদমন রায় প্রতিবাদ করলেন না। "যদিও আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না উইদাউট লঙ্কা আমরা কীভাবে পাঁচ ছ'হাজার বছর এমন সুখে থাকলাম? পর্তুগিজরা যখন এদেশে লঙ্কা নিয়ে এলো তখন লঙ্কার নাম হলো গাছ মরিচ। উড়িষ্যায় এখনও লঙ্কার নাম সোপারিয়া।"

"ওঃ! আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুরা যা দেখেন তাকেই পান-সুপুরি মনে

করেন!"

"মুখুজ্যে, যা জানিস না তা নিয়ে মতামত দিস না। আমার ওড়িয়া ডাক্তার বন্ধু বলেছে, কথাটা—হলো সাগর পারিয়া—যা বিদেশ থেকে এসেছে, তার থেকে সোপারিয়া—সোপরে!"

প্রফেসর রায় বললেন, "গাছ মরিচ থেকে লঙ্কার নাম আমাদের অনেক জেলায় স্রেফ মরিচ হয়ে গেলো। আবার কোথাও লঙ্কা মরিচ।"

"ওইটাই তো আমার সন্দেহ, ব্যান্ডোদা। হাতের গোড়ায় রামায়ণের লঙ্কা এবং এখনকার শ্রীলঙ্কা রয়েছে। সুতরাং লঙ্কা কোথা থেকে এসেছে তা তো নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।"

সর্বদমন রায়ের মুখের দিকে তাকাতে তিনি ব্যাপারটা আরও জটিল করে তুললেন। বললেন, "দয়া করে মনে রাখবেন, প্রাচীন ভারতে জলবেষ্টিত যে কোনও ভূখণ্ডকেই লঙ্কা বলা হতো। লঙ্কার অর্থ বিদেশ।"

"ব্যান্ডোদা, এসব ব্যাপারে আমি মাতৃনির্ভর। আমার মা বলতেন, অতি দর্পে হত লঙ্কা। দর্প—মানেই তো ঝাঁঝ। অর্থাৎ লঙ্কা।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "তুই আর সমস্যা সৃষ্টি করিস না। টিমের মেম্বার হয়ে নীরবে খেলে যা, প্রফেসর রায়কে হেল্প কর। আমাদের সামনে এখন দুটো কাজ। এক : লঙ্কার ভিতরের ব্যাপারটা একটু ভালভাবে জেনে রাখা। দ্বিতীয় কাজ : অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ কী করে লঙ্কাকে নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গ করে নিলো এবং কোন্ দুর্লভ সমন্বয়প্রতিভায় ঝাল তরকারির মাধ্যমে ইংরেজের রসনাকে আমরা জয় করতে সক্ষম হলাম তা অনুসন্ধান করা।"

সর্বদমন রায় গম্ভীরভাবে বললেন, "আমি ফরেনে যাইনি ; কিন্তু বেদ-বেদান্ত পাঠ করে বলতে পারি, রস ও রসনার সমন্বয় সাধনায় ব্যাপারে আমরা ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর।"

"একটু পেল্লায় ক্লেম হয়ে যাচ্ছে না, ব্যান্ডোদা?" এই অধমের বিনীত নিবেদন।

সর্বদমন : "আপনারা সায়েবদের ফিজিওলজির বই খুলে দেখুন—চার রকম টেস্টের বেশি উল্লেখ নেই। ওদের স্বীকৃত চারটি স্বাদ হলো—সুইট,

সাওয়ার, সল্ট ও বিটার। আমাদের সত্যদর্শী ঋষিরা শুরু করেছেন ছ'টি স্বাদ বা রস দিয়ে—অম্ল, মধুর, লবণ ও তিক্ত রস ছাড়াও রয়েছে কটু রস। ঝাল অর্থাৎ আলুমরিচ, ঝালঝোল কারি সব এই কটু বিভাগে।”

“ষষ্ঠ রসটা বাদ দিচ্ছেন কেন?” আমি আস্তে আস্তে সর্বদমনকে মনে করিয়ে দিই।

সর্বদমন বললেন, “ষষ্ঠ রস হল কষায়—যেমন ডুমুর, মোচা, থোড়। আর মনে রাখবেন এই ছ'টি অরিজিন্যাল রস ছাড়াও অন্তত তেষট্টিটা মিশ্র স্বাদের বর্ণনা করে গিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। আরও জেনে রাখবেন, আর্যখাদ্যের যেসব খামতি ছিল তা মিটে গেলো আরবপারস্যর মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে—এর ফলে পোস্ট-মোগল রস ও রসনার লা জবাব, অর্থাৎ যার কোনও তুলনা নেই। এই অপরাজেয় ইনভিনসিব্‌ল আর্মাডা নিয়ে আমরা ইউরোপের নোলাকে বহুমুখী আক্রমণে পরাভূত করতে চলেছি।”

আমার সবিনয় প্রশ্ন : “ব্যান্ডোদা, খণ্ডনুন, মরিচ আর পিপুলী দিয়ে আমরা কি ইউরোপকে এইভাবে কব্জা করতে পারতাম?”

ব্যান্ডোদার উত্তর, “যথার্থ প্রশ্ন। সায়েবদের নিয়ে আসা লঙ্কা দিয়েই আমরা সায়েবদের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযান চালালাম। তবে সায়েবরাও আদিকালে একই কাণ্ড করেছে। যে তিনটে আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে তারা এশিয়াকে পদানত করেছিল সেগুলো হলো বারুদ, দিগদর্শন যন্ত্র এবং হুণ্ডি সিস্টেম। প্রথম দুটির আবিষ্কার চীনে এবং তৃতীয়টির এই ভারতে।”

টেনিসভক্ত ব্যান্ডোদা বললেন, “বিশ্বের দরবারে রসনা নিয়ে যেন সারাক্ষণ উইম্বলডন খেলা চলেছে। প্রথম সেটে ইন্ডিয়ার মহামূল্যবান মরিচ। সেই মরিচের স্বাদে পাগল হয়ে সস্তায় মরিচ কেনার প্রয়োজনে ইউরোপ আমাদের দু'শো বছর দাস করে রাখলো। থার্ড সেটে, পর্তুগিজদের আনা লঙ্কার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে আমরা পাঁচ হাজার বছরের পিপুলীকে কবিরাজের জারে বন্দি করে নতুন পথের পথিক হলাম। আমাদের সাবেকী খাবারগুলো নতুন ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো এবং সেই ঝালকে বুদ্ধিমানের মতন ব্যবহার করে আমরা হেলায় ইংল্যান্ড জয় করলাম।”

"প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল সেট এখনও বাকি আছে, ব্যান্ডোদা। এবার সায়েবরা উচ্ছেপলতার শুকতো, মহাপ্রভুর ল্যাপড়া এবং পায়সমের প্রেমে পড়বেন। এবং সেই সঙ্গে হয়তো পানসুপুরি।"

সর্বদমন রায় দুঃখ করলেন, "শেষ আইটেমটার মধ্যে সায়েবরা এখনও ঢুকলেন না। নিকোলাস মানুচি সপ্তদশ শতাব্দীতে সুপুরি মুখে দিয়ে অত্যন্ত খারাপ বর্ণনা দিয়েছেন। —আমার মাথা এমন ঘুরতে লাগলো যে মনে হলো যে মরণ আমার শিওরে এসে গিয়েছে! আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, ভাগ্যে সেই সময় একজন ইংরেজ বন্ধু দ্রুতগতিতে আমার মুখে কিছুটা নুন ঢেলে দিলেন, অবশেষে আমার জ্ঞান ফিরে এলো, আমি সে যাত্রায় বেঁচে গেলাম।"

"এসব পড়লে, কোন্ সায়েব আর শখ করে সুপুরি পানপরাগ চিবোবেন?" দুঃখ করলেন আমাদের ব্যান্ডোদা।

"মুশকিল হলো, সায়েববাড়ির বাবুর্চিরা কখনও পানের ভক্ত ছিল না। অথচ বিলিতি মেমসায়েব এবং দেশি বাবুর্চির নিঃশব্দ সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান থেকেই গড়ে উঠেছিল ফিউশন ফুড, যার বাংলা করতে পারেন মিশ্রমিলন। এইভাবেই কলকাতার সায়েবদের প্রিয় মেনু হয়ে উঠেছিল উইন্ডসর স্যুপ, পাটনা রাইস, ব্রথ অব ডল (স্রেফ ডাল), বার্ডওয়ান স্টু, ক্যাব্‌ব্‌স, ফিশ মোলে (মলয় কথাটাই মোলে হয়েছে), কারি, চাটনি এবং বাইকুল্লা সুফলে।"

"এগুলোকে 'ফিউশন' না বলে, 'কনফিউশন' বলতে পারো, যার বাংলা টার্ম জগাখিচুড়ি!"

চার দিনের জন্যে প্রফেশনের জরুরি কাজে ব্যান্ডোদা হঠাৎ নিউইয়র্কে চলে গেলেন। যাবার আগে আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেলেন, ইন্ডিয়া থেকে পশ্চিমে লঙ্কাকে জনপ্রিয় করতে কোন্ কোন্ মহাপুরুষ সক্রিয় হয়েছিলেন তা খোঁজখবর করে রাখ।

আমাদের আরও বললেন, "লঙ্কার ওপর গুরুত্ব দিতে লজ্জা পাসনি। জেনে রাখ একজন হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী লঙ্কার ওপর গবেষণা করেই

নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তাঁর নাম অ্যালবার্ট সেন্ট-জর্জ।”

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যান্ডোদার ভাষ্য, “তোরা ভাবছিস অসম্ভব ব্যাপার—তা হলে তো হাজার দশেক সিলেটিকে সুইডেন থেকে নোবেল প্রাইজ দিতে হয়! শোন, এই হাঙ্গেরিয়ান সায়েব, ভিটামিন সি সম্পর্কে গভীর গবেষণা করছিলেন, কিন্তু কিছুতেই হালে পানি পাচ্ছিলেন না। কাজের চাপে বাড়ি এসে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ। তারপর একদিন বৈজ্ঞানিকের ওয়াইফ স্বহস্তে প্যাপারিকা ফুড রান্না করে স্বামীর ল্যাবে পাঠালেন। সেই ঝাল রান্না মুখে দিয়েই বৈজ্ঞানিকের মাথায় আইডিয়া এসে গেলো। পরের দিন বস্তাবস্তা প্যাপারিকা অর্থাৎ লঙ্কা কিনে এনে ক'দিনের মধ্যে অ্যালবার্ট সেন্ট-জর্জ তাঁর পরীক্ষাগারে হাফ লিটার ভিটামিন সি তৈরি করে ফেললেন। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে হই হই পড়ে গেলো—এঁকে নোবেল পুরস্কার না দিয়ে উপায় রইলো না। অনেক লোকে কিন্তু এখনও জানে না যে কমলালেবু থেকে তিনগুণ ভিটামিন সি বা অ্যাস্করবিক অ্যাসিড এই লঙ্কায় আছে। এই হাঙ্গেরিয়ান সায়েব লঙ্কানির্ভর এক নতুন ওষুধও বাজারে ছেড়ে ছিলেন, ভিটামিন স্টাইলে নাম দিয়েছিলেন—প্রিটামিন।”

আমরা ব্যান্ডোদার কথা শুনে কিছুটা সাহস পেলাম। লঙ্কার প্রথম যুগে যেসব অনুসন্ধানের কাজ এদেশে নিঃশব্দে হয়েছে তা আমরা খুঁজে বার করবই।

পাঁচ দিনের মাথায় ব্যান্ডোদা ব্যাক টু বেঙ্গল অর্থাৎ তাজ বেঙ্গল। তাঁর গলার স্বরে প্রচণ্ড একসাইটমেন্ট। টেলিফোনেই আমাকে বললেন, “আসবার সময় এক হাঁড়ি জেনুইন রসগোল্লা চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে কিনে আনিস। আমার সঙ্গে আছে প্রচণ্ড বিষধর...”

“সাপ নাকি?” আমি আঁতকে উঠলাম। “সঙ্গে সাপ রাখার জন্যে তাজ বেঙ্গলের পারমিশন নিয়েছেন তো?”

“পুরো ব্যাপারটা জানলে হোটেলের কোনও পারমিশনই পাওয়া যাবে না। অতি গোপনে অনেক কাজ আমাদের সারতে হবে। তুই কিন্তু চিত্তরঞ্জনটা ভুলিসনি।”

হাঁড়ি হাতে আমি ও একব্যাগ বই হাতে সর্বদমনবাবু একই সঙ্গে তাজ বেঙ্গলে ঢুকছি—লিফটের সামনে দু'জনের ঠোকাঠুকি হয়ে গেলো। বইছাড়াও সর্বদমনবাবু সঙ্গে এনেছেন এক তাল পাকা তেঁতুল, ব্যাস্তোদার স্পেশাল নির্দেশে।

আমাদের প্রিয় ব্যাস্তোদা আজ আনন্দে টগবগ করে ফুটছেন। বললেন, "তুই বিলেতের সিলেটি কারিওয়ালাদের নিয়ে নাচানাচি করছিস কর, কিন্তু এবার আরও মাত্রা বাড়িয়ে দে। তুই অ্যানাউন্স করতে পারিস, এই দুনিয়ায় লঙ্কা সম্বন্ধে বাঙালিদের থেকে বেশি কেউ জানে না। লঙ্কা সম্বন্ধে সেরা বই বহু গবেষণা করে প্রকাশিত হয়েছে, এখন বেস্ট সেলারও হয়েছে, এই বই সায়েবদের হাতে হাতে ঘুরছে—ফ্রম স্পেনের রাজা টু কুইন এলিজাবেথ টু জুবিন মেটা! লেখক একজন নির্ভেজাল বঙ্গসন্তান, নিবাস মার্কিন দেশ।"

"ব্যাস্তোদা, আপনি ভুল করছেন, লেখক বাঙালি নন, তাঁর নাম অমল নাজ্!"

"তোদের ব্যাস্তোদা অত সহজে ভুল করে না, মুখুজ্যে। ওই বঙ্গসন্তানের সঙ্গে খোদ ম্যানহাটানের কফিশপে বসে পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আলাপ করে এলাম। সোনার টুকরো ছেলে, আসল টাইটেল নাগ, প্রবাসে উচ্চারণ বিভ্রাটে এবং পাকে পড়ে নাজ হয়ে গিয়েছে। ছেলেটির জন্ম এই ভারতে, শিক্ষা আয়ারল্যান্ডে, পেশা সাংবাদিকতা, বর্তমান সাকিন আমেরিকা। কর্মক্ষেত্র ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।"

ব্যাস্তোদা চোখ বন্ধ করে উচ্চারণ করলেন, "শিবশম্ভু, শিবশম্ভু! পৃথিবীর সবচেয়ে বিষধরকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। শিব যদি নীলকণ্ঠ হতে পারেন তা হলে তোদের ব্যাস্তোদাও পারবে না কেন? মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন!"

কথা বাড়াতে চাইছেন না ব্যাস্তোদা। আমাদের সাবধান করে দিয়ে তিনি বললেন, "আমার ভাগ্যে শেষপর্যন্ত কী আছে তা আমিই জানি না। আমার শেষ বক্তব্য হিসেবে কয়েকটা খবর বুলেট ফর্মে ঝটপট টুকে রাখ। অনেক কষ্টে দেশওয়ালি ভাই নাগ মশায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনেছি।"

ফার্স্ট : ছোট্ট এই পৃথিবীতে অন্তত ১৬০০ রকম লঙ্কা আছে। লঙ্কা সম্বন্ধে যিনি সবচেয়ে বেশি জানেন সেই অধ্যাপক আমেরিকার মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোটানি পড়ান। তাঁর সংগ্রহে ইতিমধ্যে কিন্তু ২২৫০ রকম লঙ্কাবীজ আছে।

সেকেন্ড : দুনিয়ার লোকেরা স্বীকার করছেন, লঙ্কার আদিভূমি বলিভিয়া। মাতৃলঙ্কাটির নাম উলুপিকা। কিন্তু একজন জগদ্বিখ্যাত ডাচ বিজ্ঞানী জোরের সঙ্গে বলে দিয়েছেন লঙ্কার জন্ম ভারতে—এই কথা তিনি বলেছেন দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে আসার পরে। তাঁর ধারণা এদেশ থেকে লঙ্কা প্রথমে যায় ইউরোপে, সেখান থেকে আমেরিকায়।

কিন্তু প্রমাণাভাবে বলিভিয়াকে এই সম্মান দিতে হবে। কলম্বাস এই লঙ্কা ইউরোপে নিয়ে আসেন, কিন্তু তা কারও নেক নজরে পড়লো না। এরপর পর্তুগিজরা পশ্চিম ব্রাজিল থেকে লঙ্কাকে প্রথমে পশ্চিম আফ্রিকায় এবং পরে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে গোয়ায় নিয়ে আসেন। সেখান থেকেই লঙ্কায় সর্বভারতবিজয়। পারনামবুফো থেকে এসেছিল বলে এর প্রথম নাম হয় পারনামবুফো পেপার।

থার্ড : কোয়ার্টার ইঞ্চি লম্বা থেকে সাড়ে তেরো ইঞ্চি লম্বা লঙ্কা পৃথিবীর মানুষ মনের সুখে উপভোগ করছে। লঙ্কার সাইজ দেখে কিন্তু ঝালের মাত্রা বোঝা যায় না। এই লঙ্কা কেউ খায় গন্ধের জন্যে, কেউ স্রেফ ঝালের জন্যে। আমেরিকান প্রফেসর হার্ডি এসবোর মতে কাঁচা খাবার পক্ষে সেরা ঝাল পেরুর লোকোটো! দেখতে একটি খুদে সাইজ পেঁপের মতন। পৃথিবীর সেরা এই লঙ্কাবিশারদ নিজে কিন্তু লঙ্কা খান না!

দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা সাত হাজার বছর ধরে লঙ্কার স্বাদ উপভোগ করছে, কিন্তু ইন্ডিয়া মাত্র চারশো বছরে ভেল্কি দেখিয়ে ছেড়েছে।

"দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো থেকে আমি বিষ আনিয়েছি, ভায়া ইউ এস এ," এবার সদর্পে ঘোষণা করলেন আমাদের ব্যান্ডোদা।

"অমন কথা মুখে আনবেন না। প্লিজ" ব্যান্ডোদার কাছে আমাদের কাতর অনুরোধ।

ব্যান্ডোদা কিন্তু ততোক্ষণে আপনমনে গান ধরেছেন : "আমি জেনেশুনে বিষ করিব পান।"

ফোর্থ : ব্যান্ডোদা বললেন, "ঝামেলা না বাড়িয়ে ঝটপট লিখে নে, তাজ বেঙ্গলে আমাদের আজকের এক্সপেরিমেন্টের পরে কী ঘটবে কিছুই ঠিক নেই। স্বদেশে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে এ দেহ আকাশ থেকে নাহি খেদ তায়।"

"প্লিজ, ব্যান্ডোদা, এই সব অমঙ্গুলে কথা মুখে আনবেন না। লঙ্কার পরেও আপনার অনেক রিসার্চ বাকি থাকবে। রহস্যময় অম্লরসের ওপরে সুদীর্ঘ কাজ করতে হবে আমাদের।"

ফোর্থ : রসিক লঙ্কাপ্রেমীরা এক এক পদে এক এক রকম লঙ্কা ব্যবহার করেন। যেমন ব্রেকফাস্টের ওমলেটে কারগো পেপার। পাস্তায় কাইন পেপার। মাংসের স্যান্ডউইচে চিপোট্‌লে, স্যালাডে সারভানো। কেবল আইসক্রিমে এখনও পর্যন্ত লঙ্কা মেশানো হয় না।

পাঁচ নম্বর : জ্বর মাপার থার্মোমিটারের মতন লঙ্কার ঝাল মাপার নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রয়েছে—এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন পার্ক ডেভিস কোম্পানির উইনবার স্কোভিল। এদেশে আমরা সাধারণত যেসব লঙ্কাকে প্রচণ্ড ঝাল বলি সেগুলির স্কোভিল ৩০০/৩৫০। বেল পেপার-এর স্কোভিল শূন্য। বিখ্যাত ঝাল লঙ্কা জালাপেলো— স্কোভিল ৩৫০০। জাপানি লঙ্কার ঝালও জগদ্বিখ্যাত : কুসাটাকা (১,৫০,০০০ স্কোভিল), বেজায় ঝালের জাপানি লঙ্কা সনটাকা ও হনটাকা। আর বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল লঙ্কা জ্যাভানোরা—জন্মস্থান মেক্সিকো। শুনে রাখ এই লঙ্কার ঝাল ৩,৫০,০০০ স্কোভিল!"

"সে তো কেউটে সাপ, ব্যান্ডোদা!" সাড়ে তিন লাখ স্কোভিল শুনে আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার অবস্থা।

আমার মন্তব্যে ব্যান্ডোদা কান দিলেন না। তিনি বললেন, "তোরা শুনে খুশি হবি জার্মানরা এখনও লঙ্কাকে ইন্ডিয়ান পেপার বলে। গুরু গোবিন্দ সিং রসিক সাধক, ঝগড়ুটে মেয়েকে ঝাল লঙ্কা বলতেন, কিন্তু আজকাল সুন্দরী আকর্ষিকা পাঞ্জাবিনীকেও আড়ালে আদর করে ঝাল লঙ্কা বলা

হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় লঙ্কা থেকে মদ তৈরি করা হয়। সর্বদমনবাবু হয়তো একেই ‘ঝালসা’ বলবেন।”

সিক্সথ্ : পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মাথাপিছু ঝাল খায় তাইল্যান্ডের লোকরা, ইন্ডিয়ার ডবল—আমরা গড়ে খাই দিনে পাঁচ গ্রাম। অর্থাৎ বছরে ১·৮ কেজি! কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদে মাথাপিছু লঙ্কা লাগে বছরে সাড়ে ছ’ কেজি। এই প্রদেশের গুণ্টুরকেই লঙ্কার বিশ্ব রাজধানী বলা হয়—কত লঙ্কা যে গুণ্টুর থেকে সারা ভারতে এবং সারা বিশ্বে চালান যায় তার ঠিক নেই। ইন্ডিয়ার সবচেয়ে ঝাল লঙ্কার নাম বার্ড আই। এই পক্ষিচক্ষুর স্কোভিল মাত্র একলাখ, অতএব সাবধান।

সেভেন্থ : ইন্ডিয়াই একমাত্র দেশ যেখানে একই পদে তিনবার লঙ্কা দেবার দুঃসাহস দেখানো হয়—প্রথমে শুকনো লঙ্কা তেলে ভেজে ; তার পর বাটা লঙ্কা এবং নামাবার সময় শেষপর্যন্ত কাঁচা লঙ্কা। তবে ইন্ডিয়ানদের বদনাম তারা লঙ্কার সুগন্ধ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। ইন্ডিয়ান খোঁজে ঝাল, আরও ঝাল।

অষ্টম : পৃথিবীর বহু বিখ্যাত লোক এখন লঙ্কায় আসক্ত হয়েছেন। যেমন গ্রেগরি পেক, স্পেনের রাজা জুয়ান কার্লো এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কিংবদন্তি পুরুষ জুবিন মেটা। জুবিন যেখানেই যান সেখানেই পকেটে লঙ্কা নিয়ে যান। তেল আভিভে এক কনসার্টের সময় আমাদের অমল নাজ মশাই ওঁকে পাকড়াও করলে জুবিন স্বীকার করলেন, তাঁর দেশলাই বাক্সে তখনও দুটো লাল লঙ্কা রয়েছে। “লঙ্কা ছাড়া মনে হয় যেন হাসপাতালে শুয়ে রোগীর পথ্য খাচ্ছি।” ওঁর ফেভারিট রেস্তোরাঁতেও যখন তিনি যান, নিজের ম্যাচবক্সটি চুপিচুপি এগিয়ে দেন, ওয়েটার সেটি নিয়ে ছোটে কিচেনে, সেখানে চিফ শেফ নিজেই জুবিন মেটার খাবারে লঙ্কা ঢেলে দেন!

জুবিনের বাগানে তিন রকম লঙ্কা গাছের চাষ হয়—জালাপেলো, টাবাস্কো এবং হাঙ্গেরিয়ান চেরি। ওঁর দেখাদেখি চিত্রতারকা গ্রেগরি পেক তাঁর বাগানে লঙ্কা লাগিয়েছেন। জুবিন মেটা বেজায় খুশি—“ভালই হয়েছে। এতো দিন সব ভোজসভায় গ্রেগরি আমার লঙ্কায় ভাগ বসাতো।” ইংলন্ডের রানি একবার জুবিন মেটাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন। সেখানে

জুবিনের সোনার ছোট্ট বক্স থেকে লঙ্কা বেরিয়ে এলো। ভদ্রতাবশত জুবিন তাঁর লঙ্কার কৌটো রানির দিকে এগিয়ে দিলেন। রানি অবশ্য লঙ্কা নিলেন না, কিন্তু জুবিনের কৌটোটা অন্য অতিথিদের দিকে এগিয়ে দিলেন। স্পেনের রাজা কার্লো তো একবার জুবিনের বাড়িতে ডিনার খেতে এসে তাঁর লঙ্কা বাগান দেখতে চাইলেন এবং সেখানে গিয়ে পটপট করে লঙ্কা তুলে নিয়ে পকেটে ফেলতে লাগলেন স্পেনে নিয়ে যাবার জন্যে।

নাইন্‌থ : ব্যান্ডোদা জানালেন, 'ন' নম্বরটা তোদের বলতে হবে। বলিভিয়ার লঙ্কা ইন্ডিয়ায় ব্রেকজার্নি করে শেষপর্যন্ত কীভাবে কারির দৌলতে ইংলন্ডের হৃদয়সিংহাসনে আরোহণ করলো!"

"ব্যান্ডোদা, আমাদের রিসার্চ কমপ্লিট। এর পিছনে ইন্ডিয়া ফেরত ইংরেজ সায়েবদের তেমন কোনও অবদান নেই। ক্লাইভ তো লর্ড হয়ে কবে বিলেতে ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু সায়েবরা তখনও তো ঝাল তরকারির দিকে তেমন নজর দেননি। লঙ্কার প্রচারে সবচেয়ে বড় বড় কাজগুলো হয়েছে টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরিতে। কিন্তু তার আগে পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করেছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ।"

বিস্তারিত খোঁজ-খবরের জন্যে আমি ছুটেছিলাম বিবেকানন্দ বিশারদ শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয়ের কাছে। ওলাবিবিতলা লেনের বসু নিবাসে বসে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "বিবেকানন্দের আগে লঙ্কা এবং ভারতীয় রান্নাকে বিদেশে প্রচারের দুঃসাহস কেউ দেখাননি। ইচ্ছে করলে পথ দেখাতে পারতেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিন্তু তিনি যে ঝালানুরাগী ছিলেন এমন কোনও উল্লেখ কোথাও নেই।"

কথা না বাড়িয়ে শঙ্করীবাবু আমাকে ঠেললেন উদ্বোধনের সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের কাছে। ওইখানেই সব খবর চমৎকারভাবে পাওয়া গেলো, যদিও শঙ্কর মহারাজ একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ঠাকুর স্বামীজি সম্বন্ধে এতো সাবজেক্ট থাকতে রাঁধুনি বিবেকানন্দ কেন? আমাকে বোঝাতে হলো, পাইওনিয়ার হিসেবে এই বিষয়েও তাঁর স্বীকৃতি প্রয়োজন। বীরস্বামী বিলেতে পৌঁছবার অনেক আগেই স্বয়ং বিবেকানন্দ যে বিদেশে লঙ্কার পথ খুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন ভক্তমণ্ডলীর তা

জানার অধিকার আছে।

নির্ধারিত সময়ে ব্যান্ডোদার সুইটে তাজ বেঙ্গলের চা এলো। আমি দুধ না দিয়েই চা খাচ্ছি দেখে ব্যান্ডোদা জিজ্ঞেস করলেন, "তোর কী হলো?"

"কিছুই হয়নি। শঙ্কর মহারাজ বলে দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ পরামর্শ দিয়েছেন, দুধ দিয়ে চা খাওয়া ঠিক নয়, ওতে পেটের গোলমাল হয়। উনি ছিলেন লেবু-চায়ের সমর্থক।"

তারপর আমার সবিনয় নিবেদন : "ব্যান্ডোদা, বিবেকানন্দ যখন ইংলন্ডে হাজির হয়েছেন তখন পোলাও এবং কারি তো দূরের কথা, সায়েবরা ভাত রাঁধতেও জানতো না। হাঁড়িতে জল দিয়ে তা ফুটিয়ে কাপড়ে চাল বেঁধে ছেড়ে দিতো, তারপর সেদ্ধ হলে পুঁটুলি তুলে নিতো।"

"প্রমাণ?" ব্যান্ডোদার কথায় অবিশ্বাসের সুর।

"নিশ্চয় প্রমাণ আছে, না হলে শঙ্কর মহারাজ আমাকে কিছুতেই বলতেন না।"

বিবেকানন্দর বাবা বিশ্বনাথ দত্ত পোলাও ও মাংস ভাল রাঁধতেন। স্বামীজির রান্নার প্রবৃত্তি ও নিপুণতা দুই ছিল। কমবয়সেও তিনি উঠতি পেটুকদের সংগঠন 'গ্রিডি ক্লাব' গড়েছিলেন দফায় দফায় রান্না করার জন্যে। এই পর্যায়ে নরেন্দ্রনাথ দত্তর স্পেশাল আবিষ্কার খিচুড়ি—হাঁসের ডিম ফেটিয়ে চালে মাখিয়ে সেই চাল, কড়াইশুঁটি ও আলু দিয়ে খিচুড়ি। তাঁর মেজোভাই মহিমবাবু লিখে গিয়েছেন, নরেন্দ্রনাথ লঙ্কা খেতে ভীষণ ভালবাসতেন, তীব্র ঝাল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মিষ্টান্ন একেবারে পছন্দ করতেন না ; তবে পরবর্তী জীবনে স্বদেশে ও বিদেশে তাঁকে আইসক্রিমে আসক্ত হতে দেখা গিয়েছে।

এই লঙ্কাপ্রীতি প্রচণ্ড অভাবের সময় বিবেকানন্দকে শক্তি দিয়েছে। রামকৃষ্ণর মৃত্যুর পরে বরানগরে সাধনভজনের সময় প্রবল অনটন। দারিদ্র্য এমনই যে মুষ্টিভিক্ষা করে এনে তাই ফুটিয়ে একটা কাপড়ের ওপর ঢেলে দেওয়া হতো। একটা বাটিতে থাকতো লবণ ও লঙ্কার জল। একটু ঝালজল মুখে দিয়ে এক এক গ্রাস ভাত উদরস্থ করা হতো।

অনেকদিন পরে প্রয়াগধামে গুরুজি অমূল্য নামে এক বাঙালি সাধুর

সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দর পরিচয় হয়েছিল। একদিন সকলে আহারে বসেছেন। বিবেকানন্দ একটি লঙ্কা চেয়ে নিলেন, অমূল্য তখন দুটি লঙ্কা খেলেন। বিবেকানন্দ হটবার পাত্র নন, তিনি তিনটি লঙ্কা খেলেন। লঙ্কা ভক্ষণ প্রতিযোগিতায় বিবেকানন্দ যে অপরাজেয় তা প্রমাণ করে তবে তিনি ক্ষান্ত হলেন।

বড্ড ঝালের মুখ। একবার হৃষীকেশে এসে তপস্যা ও নিরন্তর অল্পাহারে বিবেকানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। জ্বর কমলে বিবেকানন্দ খিচুড়ি খেতে চাইলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে খিচুড়ি রাঁধলেন তাতে একটু মিছরি দিয়েছিলেন। খেতে বসেই ব্যাপারটা ধরে ফেললেন লঙ্কাভক্ত বিবেকানন্দ। মিষ্টিতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। প্রিয় গুরুভাইকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "শালা, তোর একটু আক্কেল নেই।"

একবার এক ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, "স্বামীজি, আপনি এতো লঙ্কা খান কেন?"

বিবেকানন্দর উত্তর লঙ্কাপ্রেমীদের জেনে রাখা ভাল : "মশাই, চিরজীবন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর বুড়ো আঙুলের টাকনা দিয়ে ভাত খেয়েছি। লঙ্কাই তো তখন একমাত্র সম্বল ছিল ; ওই লঙ্কাই তো আমার পুরনো বন্ধু ও মিত্র।"

বিদেশে শুধু বেদান্ত নয়, ইন্ডিয়ান রান্না প্রচারের ব্রত যে ছিল তার প্রমাণ বোম্বাই থেকে আমেরিকার জাহাজে চড়বার আগে বিবেকানন্দ চোদ্দ টাকা খরচ করে স্বহস্তে পোলাও রান্না করে সবাইকে খাওয়ালেন, কিন্তু নিজে কিছু খেলেন না। যাঁরা পোলাওয়ের ব্যাপারটা বোঝেন তাঁরা জানেন মাস্টার রাঁধুনি না হলে পোলাও ম্যানেজ করা যায় না।

আমেরিকায় দেখা যাচ্ছে খ্যাতির মধ্যগগনে পৌঁছেও ভারতীয় রান্না থেকে স্বামীজি দূরে থাকতে পারছেন না। সুযোগ পেলেই নিমন্ত্রিত অতিথি হয়েও গৃহস্বামীর অনুমতি নিয়ে তিনি রান্নায় মেতে উঠছেন। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর পকেট থেকে বেরিয়ে আসছে নানা ধরনের মশলা। সেইসব মশলা বাটবার জন্যে শিল নোড়া পর্যন্ত তিনি জোগাড় করছেন। ভক্তরা মোহিত, কিন্তু লঙ্কার ধাক্কা তাঁরা সবসময় সামাল দিতে পারছেন না।

বেদান্ত ও বিরিয়ানি একই সঙ্গে প্রচার করে চলেছেন বিবেকানন্দ। সেই সঙ্গে বলছেন ভারতের বিচিত্র খাদ্যভাণ্ডারের কথা। রোমের একজন সম্রাট রান্নায় সারাক্ষণ মেতে থাকতেন, তাঁর খাবারের জন্যে আসাম থেকে টিয়া পাখি এবং উত্তর ভারত থেকে ময়ূর পাঠানো হতো। এই পাখির ঘিলু দুধে সেদ্ধ করে তিনি নাকি নিজের প্রিয় ডিশ তৈরি করতেন।

শুনুন এরপর ইংলন্ডপর্ব। স্বামীজি এ জন্মে একশো বছর বাঁচবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ৩৯ বছরেই সব শেষ হয়ে গেলো।

১৮৯৬ সালে ইংলন্ডে ভারতীয় রান্নার কী অবস্থা তা শুনুন। ভাতের কথা তো আগেই বলেছি। কারি রান্না হতো হাড় বাদ দিয়ে মাংসের টুকরো ফুটন্ত জলে ফেলে দিয়ে। খুব ফুটোনোর পরে ওরই মধ্যে কারি পাউডার ও লবণ দেওয়া হতো। ঝোল ঘন করবার জন্যে ময়দা গুলে জলে ঢেলে দেওয়া হতো। এই আনাড়ি দৃশ্য স্বামীজির পক্ষে সহ্য করা খুবই কঠিন ছিল, তাই বক্তৃতার মাঝে-মাঝে তিনি সোৎসাহে রান্নার রহস্যময় জগতে প্রবেশ করেছেন।

লঙ্কার বেজায় অভাব তখন লন্ডনে। স্বামীজি সুযোগ পেলেই বলতেন, "চ, রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধি গে, বেশ ঝাল ঝাল আলুচচ্চড়ি বা আলুর দম।" এক সহযোগী বহু কষ্টে উইলিয়াম হোয়াইটের দোকান থেকে তিনটি কাঁচালঙ্কা কিনে আনলেন। একশো বছর আগে সেই ১৮৯৬ সালে সায়েবদের দেশে তিনটে কাঁচালঙ্কার দাম তিন শিলিং যা তখনকার তিন টাকার মতন। বিবেকানন্দ লঙ্কার মোহমায়া সামলাতে পারেন না, সবকটা লঙ্কা খেয়ে ফেললেন।

লন্ডনে একদিন কচুরি ও আলুচচ্চড়ি রেঁধেছিলেন বিবেকানন্দ। কাজের মেয়েটি ভাগ না পেলে রেগে যেতো, বলতো, "ইউ কুকিং সোয়ামি, কেবল খেয়ে খেয়ে মোটা হবে আর আমার জন্যে কিছু রাখবে না।" এবার ওর জন্যে দু'খানা কচুরি ও কিছু চচ্চড়ি রাখা হয়েছে। খুব খুশি হয়ে মেমসায়েব জানতে চাইলো, কি দিয়ে খেতে হয়—চিনি? না নুন? শরৎ মহারাজ স্বামী সারদানন্দ নুনের পরামর্শ দিলেন। এবার চামচে দিয়ে আলুচচ্চড়ি মুখে নিয়ে মিস কেমিরন লাফাতে লাগলেন। প্রবল ঝাল

সামলাতে দুই হাতে দুই গাল চড়াতে লাগলেন এবং সন্ন্যাসীদের গাল পাড়তে লাগলেন। "ও ইট্'স পয়জন, ও ইট্'স পয়জন!" একশো বছর আগের সেই ইংরেজ এখন অন্য মানুষ, সে এখন ঝাল কম হলে চটে যায়, কারিতে ঝাল আরও ঝাল এই হলো এ যুগের স্লোগান এবং এই পরিবর্তনে বিবেকানন্দর ভূমিকা অবহেলার যোগ্য নয়।

প্রবাসে বিবেকানন্দর সঙ্গে আমতেলও থাকতো। তা মুখে দিয়ে পরম ভক্ত গুডউইন একবার মুখ বিকৃত করে যা-তা মন্তব্য করতে থাকেন। প্রিয়ভক্ত সান্যালমশাই আমেরিকাতেই বিবেকানন্দকে বেদের সঙ্গে আচার, আমতেল, ডাল, বড়ি ইত্যাদি পাঠিয়েছিলেন। এইসব বিবেকানন্দ অতি সন্তর্পণে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেন। গুডউইন ঝাল ও হিং দেওয়া বড়ি খেয়ে মহারেগে বলতেন, "এরকম বদ্ গন্ধওয়ালা জিনিস ভারতের লোকরা খায়!" সায়েবী নাকের এই গন্ধ যে এতো অল্পসময়ে এইভাবে ঘুচে যাবে তা কে জানতো?

এই যে অদম্য উৎসাহে রান্নার প্রচারব্রত তা বিবেকানন্দকেই মানায়। রান্না কখনও মনের মতন না হলে নিজেই বলতেন : "আসলের নকলও ভাল।"

অনেক সময় কেটে গিয়েছে। ব্যান্ডোদা এবার বললেন, "জেনে রাখ, লন্ডনে ১৬১টি ভাষায় কথা বলার লোক আছে। এরই মধ্যে বঙ্গভাষীরা যে রান্নায় সায়েবদের বন্দি করতে পারলো, হিউম্যান হিস্ট্রিতে সে এক মস্ত ঘটনা। এর আদিতেও বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ রয়েছেন জানলে এ যুগের বাঙালি ছেলেমেয়েরা একটু ভরসা পাবে।"

ঘড়ির দিতে তাকিয়ে ব্যান্ডোদা সগর্বে ঘোষণা করলেন, এবার দশ নম্বর আইটেম।

ব্যান্ডোদা ইন্টারনেটে আমেরিকার গবেষণাগার থেকে লঙ্কার বিভিন্ন গুণাবলি সংগ্রহ করেছেন। তিনি ঝটপট বলে গেলেন, সায়েবরা সাউথ আমেরিকা থেকে লঙ্কা নিয়ে এলেন, কিন্তু নিজেরা ওর ভিতরে ঢুকতে সাহস পেলেন না একমাত্র হাঙ্গেরিয়ানরা ছাড়া। অবজ্ঞাভরে লঙ্কাকে ওঁরা

আমাদের ঘাড়ে ডাম্প করলেন, ওঁরা ভাবতেই পারেননি এই লঙ্কা নিয়ে আমরা নতুন এক কাণ্ড করবো। আমাদের দেশে যখন সবে লঙ্কা চাষ শুরু হয়েছে, তখন নিকোলাস কালপেপার বলে এক ভেষজবিজ্ঞানী তাঁর দেশের লোকদের সাবধান করে দিচ্ছেন, "খুব সাবধান। প্রাণধারণের পক্ষে লঙ্কা অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে।"

যাঁরা লঙ্কাকে সন্দেহ করেন ব্যান্ডোদা তাঁদের নাম দিয়েছেন মিট-পটাটো সোসাইটি। এঁরা বললেন, লঙ্কা খেলেই স্টমাকের বারোটা বাজবে, আলসার অনিবার্য। এই এতোদিনে মার্কিন ডাক্তাররা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ফতোয়া দিয়েছেন, মশলাযুক্ত খাবার খাওয়ার সঙ্গে হজম সংক্রান্ত রোগের কোনও যোগাযোগ নেই। বরং দেখা যাচ্ছে লঙ্কার মধ্যে ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার এমন অদৃশ্য শক্তি রয়েছে যা পেটের গোলমালে কাজ দেয়। এখন আমেরিকান গৃহচিকিৎসার বইতে লেখা হচ্ছে, হজমি হিসেবে এবং হার্ট অ্যাটাক আটকাবার জন্যে গরম জলে ১/৪ চামচ লঙ্কা মিশিয়ে খাবার পরে নিত্য সেবন করুন। ৬৫ বছরের সিনিয়র সিটিজেন, যাঁরা সহজবোধ্য কারণে জিভে স্বাদ পাচ্ছেন না, যাঁদের জীবন একঘেয়ে হয়ে উঠছে তাঁরা লঙ্কাভোজনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন।

আমেরিকান ডাক্তাররা খুব চালাক লোক। আমেরিকান সরকার বলছে, লঙ্কা নিরাপদ। কিন্তু এঁরা বলছেন, নিরাপদ তবে চিকিৎসার কাজে ব্যবহারের আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

"আরে বাবা, জীবের মঙ্গলের জন্যে ভগবান অনেক ভেবে-চিন্তে এই লঙ্কাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—আহারকে আহার, ওষুধকে ওষুধ। গরিবের যতো আজেবাজে খাবার আছে তাকে মুহূর্তে মাতিয়ে দিয়ে ভোজনযোগ্য করবার জন্যেই মর্তভূমিতে লঙ্কার শুভ আবির্ভাব। এবং লঙ্কার বহুমুখী ব্যবহারে আমরা ইন্ডিয়ানরা এই মুহূর্তে সবার আগে।"

এগারো নম্বর পয়েন্ট : মনে রাখতে হবে, অ্যান্টি লঙ্কা লবি এখনও প্রবল উদ্যমে বিশ্বের সর্বত্র ওভারটাইম খেটে চলেছে।

ব্যান্ডোদা বললেন, সাত হাজার বছর ধরে অ্যাপ্রেনটিসশিপ করার পরেও দুনিয়ার সিকিভাগ লোকমাত্র লঙ্কার স্বাদ গ্রহণে উৎসাহী হয়েছে।

অর্থাৎ বেদান্ত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঝালের কীর্তন আমাদের চালিয়ে যেতে হবে পূর্ণ উদ্যমে দেশে দেশান্তরে। ঝালের মধ্য দিয়েই আমাদের সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ হবে। বিবেকানন্দ সোজাসুজি এই কথাটা কেন যে কোথাও লিখে গেলেন না! তা হলে স্বয়ং রামকৃষ্ণ মিশন মানবমঙ্গলের জন্য এই কাজটা সরাসরি গ্রহণ করতে পারতেন।

এবার দ্বাদশ পয়েন্ট এবং এইটাই আমাদের ঝালকাহিনীর শেষ পর্ব। অনেক কষ্টে, বহু চেষ্টায় ব্যান্ডোদা নাকি আইটেমটা সংগ্রহ করেছেন। “এবার বন্ধুরা বলেছে, সাক্ষাৎ বিষ, ওই জিনিসটা মেক্সিকো থেকে আনিও না। কিন্তু বঙ্গসন্তান অমল নাগ মশায়ের বিশ্ববিজয়ী ইংরিজি বই পড়ে লঙ্কার হাড়হদ্দ আমার জানা হয়ে গিয়েছে। বিষ আনাতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি।”

ব্যান্ডোদার কথাবার্তায় আমি বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছি। “বিষ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবেন না, ব্যান্ডোদা। তার আগে পুলিশের লাইসেন্স প্রয়োজন। বিশেষ করে মনে রাখবেন আপনি ফরেন সিটিজেন।”

ব্যান্ডোদা আমার কথা শুনলেন না। বললেন, “একজন বাঙালি লেখকই তো নতুনভাবে দুনিয়াকে জানিয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল লঙ্কার কথা।”

এবার অতি যত্নে ব্যাগের মধ্য থেকে একটি সোনার বাক্স বার করলেন ব্যান্ডোদা। বললেন, “স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে অনেক কষ্টে তিনটি কাঁচালঙ্কা সংগ্রহ করেছিলেন, তার স্কোভিল কত ছিল তা আমরা জানি না, জানবার উপায়ও ছিল না, কারণ তখনও স্কোভিল আবিষ্কার হয়নি। আজও আমাদের তিনজনের জন্যে মাত্র তিনটি লঙ্কা। আমার এক জাপানি বন্ধু বলেছিল এক লাখ স্কোভিলের কুসাটাকা লঙ্কা তার বাড়িতেই আছে। আমি জন্মসূত্রে ইন্ডিয়ান, আমার নজর এখন সারা বিশ্বে প্রসারিত করতে হবে, আমি সেরাটাই চাই, অর্থাৎ চাই মেক্সিকোর জ্যাভানোরা লঙ্কা যার স্কোভিল অন্তত সাড়ে তিন লাখ।”

“সাড়ে তিন লাখ স্কোভিল! সে তো গোখরো সাপের বিষ, ব্যান্ডোদা।”

স্বর্ণপেটিকা খুলবার আগে শান্তভাবে ব্যান্ডোদা বললেন, “গত রাতে আমি নিজেই এই জ্যাভানোরার স্কেচ এঁকেছি। যদি শরীর চলে যায় তা

হলে এই ছবিটা অন্তত থেকে যাবে।”

ব্যান্ডোদার আঁকা ভেজিটেব্‌ল গোখরোর ছবিটা আমরা দেখলাম। জ্যাভানোরা লঙ্কা স্লিম নয়, বরং একটু নাদুসনুদুসই বলা চলতে পারে।

এবার রহস্যময় স্বর্ণপেটিকা উন্মোচিত হলো। তিনটি জ্যাভানোরা যেন বিষধর সাপের চোখ নিয়ে আমাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে আছে!

প্রফেসর রায় বললেন, “ঈশ্বরের সৃষ্টি! বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, যতক্ষণ না সংস্পর্শে আসা যায়।”

ব্যান্ডোদা জানিয়ে ছিলেন, “আমার এই টেবিলে ভিনিগার রয়েছে এবং রসগোল্লার মোটা রসও রয়েছে। চিত্তরঞ্জনের স্পঞ্জ রসগোল্লা কয়েকটা খেয়ে নিয়ে আমরা স্টমাকের জমি তৈরি করে নিতে পারি।”

রসগোল্লা কয়েকটা খাওয়া হলো। ব্যান্ডোদা এবার মরিয়া হয়ে উঠছেন। কিন্তু আমাদের তিনজনের কোনও উইল নেই। হঠাৎ কিছু ঘটলে বিধবারা অথৈ জলে পড়বেন। তাজ বেঙ্গলের কর্তৃপক্ষও অকারণে বিপদে পড়ে যাবেন, যদি না আমরা তিনজনেই তাজ বেঙ্গলের প্যাডে লিখে যাই—আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে।

কিন্তু এ তো আত্মহত্যা নয়। কোন্ দুঃখে সুইসাইড নোট রেখে বংশের বদনাম করে যাবো? আমরা তো গবেষণার অংশ হিসেবে জ্যাভানোরা আস্বাদ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গনে উৎসাহী হয়েছি। আমাদের তো ব্যক্তিগত কোনও দুঃখ নেই।

জ্যাভানোরা তিনটি যেন হাসছে। পরম স্নেহময়ী ধরিত্রী—একই মাটিতে পাশাপাশি আমও হচ্ছে জ্যাভানোরাও জন্ম নিচ্ছে। ধন্য তুমি বিশ্বপ্রকৃতি।

আমি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষ উৎসাহী। কিন্তু আমি এখনও বাঁচতে চাই। প্রফেসর রায়ও কিছুদিন বাঁচতে চান। শুধু দলনেতা ব্যান্ডোদা বেঁকে বসেছেন।

অবশেষে প্রফেসর সর্বদমন রায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে রুমাল দিয়ে একটি জ্যাভানোরা তুলে নিলেন। বললেন, “সবাই আপনারা জ্যাভানোরা তুলে নিন। এবার প্রথমে কপালে ঠেকান, বলুন শিবশম্ভু, শিবশম্ভু। ইনিই

তো আমাদের সবরকম বিষের দেবতা। সাপুড়েরা সর্পদংশনে আত্মাহুতি দেবার আগে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে।"

তারপর হঠাৎ সর্বদমন জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার ব্যাডো, মিস্টার মুখুজ্যে, আপনারা স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন কি? না?"

"স্বামীজি লঙ্কা ভালবাসতেন, সারা বিশ্বে তিনি লঙ্কা প্রচার করেছেন, কিন্তু গুণ্টুরের বার্ড আই লঙ্কার বেশি তিনি উঠতে পারেননি। জাস্ট ভাবুন, এই জ্যাভানোরা হাতের গোড়ায় পেলে তিনি কত খুশি হতেন। এক্ষেত্রে একশো বছর পরে তাঁর ভক্ত হিসেবে আমাদের কর্তব্য কী?"

ফাঁপরে পড়ে গেলেন ব্যাডোদা। মুখে ফেলবার আগে তিনি নিজেও সর্বদমনবাবুর প্রদর্শিত পথে প্রথমে জ্যাভানোরাকে কপালে ঠেকিয়েছিলেন।

সর্বদমন এবার আমাদের ভর্ৎসনা করলেন, "মুখুজ্যেমশাই, বসে আছেন কী! দুষ্প্রাপ্য ফল প্রথমেই পরম পূজনীয়কে নিবেদন করতে হয়, আপনি জানেন না?"

ঈশ্বরের দয়ায় এবং সর্বদমনের উপস্থিত বুদ্ধি নিতে এ-যাত্রায় প্রাণ বাঁচলো। জ্যাভানোরাকে চোখে দেখে কপালে ঠেকালেও শেষপর্যন্ত আস্বাদ করতে হলো না।

আমাদের অবস্থা দেখে ব্যাডোদা বললেন, "জ্যাভানোরা আমি বেভারলি হিল্স-এই আস্বাদ করবো, এখন বরং বেরিয়ে পড়া যাক। তিনটে লঙ্কা আমরা বিবেকানন্দর জন্মভিটে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির এবং বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ সমাধিতে নিবেদন করে আসি। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে, এই লঙ্কা যে স্বামী বিবেকানন্দর ঝালে ঝোলে অম্বলেও স্থান পেতো সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

অম্লরসমঞ্জরী

শুধু অমর্ত্য সেন নন, ইদানীং আমাদের এন আর আই ব্যান্ডোদাও চান্স পেলে শান্তিনিকেতন পাড়ি জমাচ্ছেন।

"আমাদের মধ্যে অনেক তফাত আছে," বললেন ব্যান্ডোদা। খোদ কিউবা থেকে সংগ্রহ করা হাভানা চুরুটের ধূম উদ্গীরণ করতে করতে তিনি নিবেদন করলেন, "অমর্ত্যর হচ্ছে বিত্তসন্ধান ও বিশ্লেষণ, আর আমার হলো রসসন্ধান ও রসোপভোগ।"

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ফ্লাইটে দমদম বিমানবন্দরে অবতরণ করে ব্যান্ডোদা সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে এসেছেন এবং সেখান থেকে শান্তিনিকেতন। ওখান থেকেই আমাকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন : অ্যাটেন্ড নিমাইসাধন এক্সপ্রেস।

ভোগান্তি হয়েছে। কারণ স্টেশনের এনকোয়ারি বিভাগ জানিয়ে দিয়েছে ওই নামে কোনও ট্রেন নেই। তারপর লাস্ট মোমেন্টে একজন খবর দিলো ওটা শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের ডাক নাম—ভাইস চ্যান্সেলর নিমাইসাধন বসু এককালে বহু সাধ্যসাধনা করে ওই ট্রেন চালু করেছিলেন বলে সাধারণ যাত্রীদের সকৃতজ্ঞ স্বীকারোক্তি।

হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ব্যান্ডোদার একটা হাতব্যাগ তুলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "বার্কিং আপ দ্য রং ট্রি, ব্যান্ডোদা। রান্নাবান্নার ব্যাপারে রিসার্চ করতে শান্তিনিকেতনে যাওয়া যায় না। ওখানে মানুষ যায় কবিতা, সঙ্গীত, চারুকলা ও মোক্ষের সন্ধানে।"

"বস্তাপচা আইডিয়াগুলো ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দে। কীসব খাবার-দাবারের জোরে ঠাকুরবাড়িতে একের পর এক এমন সৃষ্টির মহোৎসব সম্ভব হলো তা জানতে সারা বিশ্ব এখন আগ্রহী। জেনে রাখ, সমস্ত সৃষ্টির উৎসমুখে চলে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছে দুনিয়া।"

এবার শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদন থেকে ব্যান্ডোদা বেশ কিছু খবর সংগ্রহ করে এনেছেন।

"রবীন্দ্রনাথের বাবা নাইনটিন হানড্রেড ফাইভ পর্যন্ত বিরাট জামবাটিতে ক্ষীরের গন্ধওয়ালা দুধ খেতেন। এই দুধ হওয়া চাই খুব মিষ্টি। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ব্যাপারটাই আলাদা! দুধে গুড় দিয়ে মিষ্টি করা নয়, গোরুদের প্রচুর মিষ্টি খাইয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুধ মিষ্টি করা হতো।"

স্টেশনের বাইরে প্রিপেড ট্যাক্সির জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে ব্যান্ডোদা বললেন. "শুধু সাহিত্যে পাইওনিয়ার নয়। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীই বাংলা ভাষায় প্রথম রান্নার মহাভারত লিখেছিলেন সেই কোন্‌কালে। ওই বইয়ের নতুন এডিশন বেরিয়েছে, কিন্তু আমি গিয়েছিলাম অরিজিন্যাল ফার্স্ট এডিশনের খোঁজ করতে। ওঁর স্বামী লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে কবিগুরুর তর্কাতর্কি হয়েছে, কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্রনাথকে একটা সৌজন্য কপি পাঠাতেন না তা হতে পারে না।"

"ব্যান্ডোদা, ঠাকুরবাড়ির রান্না মানে তো সবকিছুতে মিষ্টি ঢেলে দেওয়া, ঝালঠুঁটো খাঁটি বাঙালিরা তা সহ্য করবে কেন?"

"তোদের ওই নেতি নেতি ভাবটা ছাড়! ঝালে ঝোলে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা মিষ্টি না ঢাললে আমরা রবি ঠাকুর, অবন ঠাকুর, গগন ঠাকুর কাউকেই হয়তো পেতাম না। প্রজ্ঞাসুন্দরী বেঁচে থাকলে তাঁকে দিয়ে একটা বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নেওয়া যেতো।"

আরও একটি বিষয়ে ব্যান্ডোদা উত্তেজিত। "প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যার যা খুশি বদনাম ছড়িয়ে যাচ্ছে এখনও—অকৃতজ্ঞ বাঙালি জাত! শোন্‌, দুর্মুখ কাঙালি বাঙালি বলে বেড়াচ্ছে, দ্বারকানাথ কুখাদ্য ভোজনে এবং মদ্যপানে বেপরোয়া ছিলেন। অথচ এবার যা দেখে এলাম, মাথা ঘুরিয়ে দিলো। স্বয়ং ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে গিয়েছেন, দ্বারকানাথ মোটেই ওই ধরনের মানুষ ছিলেন না। একই সঙ্গে সাত্ত্বিক এবং সংসারী মানুষ এই প্রিন্স। তাঁহার প্রদত্ত ভোজে মদ্যের স্রোত বহিয়া যাইতো, অথচ তিনি নিজে কি স্বদেশে কি বিলাতে, কোথাও মদ্য স্পর্শ করেন নাই। বুঝলি।"

"ব্যান্ডোদা, তা হলে যে গান লেখা হয়েছিল :

বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝনঝনি
খানাখাওয়ার কত মজা, আমরা তার কি জানি?
জানেন ঠাকুর কোম্পানি।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "এর থেকে প্রমাণ হয় না যে প্রিন্স দ্বারকানাথ নিজে নিষিদ্ধ খানাপিনায় মত্ত ছিলেন। অমন যে অমন রাজা রামমোহন রায় তাঁর খাওয়াদাওয়া সম্পর্কেও তোরা তো একসময় জঘন্য গুজব ছড়িয়েছিস।"

"হ্যাঁ ব্যান্ডোদা, রাজা রামমোহন শুধু মস্ত বড় সমাজসংস্কারক ছিলেন তা নয়, বড় খাইয়েও ছিলেন। শোনা যায় একটা পাঁঠার মাংস একাসনে খাবার হিম্মত রাখতেন।"

ব্যান্ডোদা উত্তর, "পাঁঠার মাংস খাওয়া নিয়ে তাঁর বদনাম নেই, অপপ্রচার গোমাংস ভোজন সম্বন্ধে। এবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে খোদ মহর্ষির উদ্ধৃতি পেলাম। রাজা এঁকে খুব ভালবাসতেন এবং ব্রাদার অর্থাৎ 'বেরাদর' বলে ডাকতেন। রাজার প্রিয় আইটেম ছিল মধু দিয়ে রুটি। একবার তাঁর ঘরে গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেখেন, রামমোহন মধু সহযোগে রুটি খাচ্ছেন। তরুণ দেবেন্দ্রনাথকে কাছে ডেকে তিনি বললেন, বেরাদর, আমি মধু দিয়া রুটি খাইতেছি, কিন্তু লোকে বলে আমি গোমাংস ভোজন করিয়া থাকি।"

আমাকে মৃদু হাসতে দেখে ব্যান্ডোদা বললেন, "এই কথাটা বিশ্বাস করতে মডার্ন বাঙালিদের বেশ অসুবিধে হচ্ছে ; কিন্তু জেনে রাখ, এই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করছেন, একসময় তিনি নিজে নিয়মিত সুরাপান করতেন।"

ব্যান্ডোদার অনুরোধ : "মাত্র দেড়শো বছর আগেকার কথা, কিন্তু এরই মধ্যে সব ঘটনা কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তুই আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট না করে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনটা খুঁটিয়ে দেখে নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট তৈরি কর। আমার কাছে খবর, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে সায়েবদের খানাপিনার আয়োজন করতেন, প্রথম দিকে তিনি কিন্তু খাবার টেবিলে বসতেন না। সায়েবদের খানার শেষে

গঙ্গাজল স্পর্শ করে এবং বস্ত্র পরিবর্তন করে শুদ্ধ হতেন। আরও জানা যাচ্ছে, দেবেন্দ্রনাথের বাল্যকালে ঠাকুরবাড়ির ত্রিসীমানায় মাংস আসতো না, মদ তো দূরের কথা।"

আমাদের প্রিপেড ট্যাক্সি আলিপুরে তাজ বেঙ্গলের চত্বরে প্রবেশ করলো। ব্যান্ডোদার সুইট ওইখানেই বুক করা রয়েছে।

নিজের প্রিয় ঘরে ঢুকে ব্যান্ডোদা সায়েবী জামাকাপড় দ্রুত ছেড়ে লুঙি পরলেন। বললেন, "যেখানেই যাই, ফিরভি দিল হ্যায় হিন্দুস্থানী তার প্রমাণ এই লুঙি। শরীরে লুঙি না জড়ানো পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাই না। সায়েবরা এখনও এই লুঙি এবং পাশবালিশের স্বাদ পেলো না। তাজ বেঙ্গলের উচিত বিদেশী অতিথিদের কমপ্লিমেন্টারি পাশবালিশ দেওয়া—এমন নেশা ধরে যাবে যে মান্টিকার্লো বা কাঁতে গিয়েও সুখ পাবে না।"

চুপি চুপি বলে রাখি, ব্যান্ডোদার বেভারলি হিল্স-এর প্রাসাদে যে একডজন পাশবালিশ সংরক্ষিত আছে তা তিনি কখনও গোপন করেন না।

টেলিফোনে ভেজিটেব্ল পকৌড়ার অর্ডার দিলেন ব্যান্ডোদা। আমাকে বললেন, "আজ একটু কষ্ট কর, কাল তোকে মির্জাপুরের কালিকা থেকে গরম বেগুনি আনিয়ে দেবো। জেনে রাখিস, ওয়ার্লডের শ্রেষ্ঠ অয়েল-ফ্রাই অর্থাৎ তেলেভাজা এখনও এই কলকাতায় পাওয়া যায়। সিলেটিরা এই তেলেভাজার ব্যাপারটা তেমন জানে না, ফলে ইংলন্ডে এখনও এটা চালু করতে পারেনি। হাওড়া ও বাঁকুড়ার অয়েল টেকনলজিস্টরা একটু সাহস দেখিয়ে ফরেনে হাজির হলেই কাজটা হয়ে যায়। তখন মুড়ি বেগুনি অ্যান্ড ফুলুরি ছাড়া সায়েবদের শ্রীমুখে আর কিছু রুচবে না।"

তাজ বেঙ্গলের ভেজিটেব্ল পকৌড়া কম মুখরোচক নয়, কিন্তু কোথায় যেন একটা 'কিক'-এর অভাব। বহুকাল ধরে কড়ায় সরষের তেল পরিপক্ক না হলে বোধ হয় তেলেভাজার আদি অকৃত্রিম অ্যারোমা বেরিয়ে আসে না।

ব্যান্ডোদা বললেন, "তেলেভাজার দুনিয়ায় শিবপুরের বোমাই বোধ হয় সবচেয়ে আকর্ষণীয়।"

দাদার আচরণ ভাল মনে হচ্ছে না। "ব্যান্ডোদা, এবার আপনি কি

তেলেভাজার ইতিহাস উদঘাটনে অভিযান চালাবেন?”

“না ব্রাদার, অপারেশন অয়েল ফ্রাই এবারের প্রোগ্রামে নেই। আমরা তিনজনে ইতিমধ্যেই ঝাল, লবণ ও মিষ্টির হিসেব নিকেশ করেছি। এবার আমাদের লক্ষ্য টক। সংস্কৃতে যাকে বলা হয়েছে অম্লরস। কিন্তু হোয়ার ইজ প্রফেসর সর্বদমন রায়? তাঁকে ছাড়া এই কঠিন কাজে আমরা এগবো কী করে?”

সর্বদমনবাবুর বাড়ির টেলিফোন খারাপ। কিন্তু ব্যান্ডোদার মাথায় নানা বুদ্ধি প্রয়োজনের সময় খেলে যায়। নিজের সেলুলার যন্ত্রটি হোটেলের ড্রাইভার মারফত সর্বদমন রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ওখান থেকে একটু পরেই কথা বললেন সর্বদমন রায়।

ব্যান্ডোদা এবার জানালেন, “সায়েবদের অভিমত, আমাদের মূল স্বাদ চারটি—তেতো, নোনতা, মিষ্টি এবং টক। আমরা কিন্তু এই সাবজেক্টে অনেক এগিয়ে আছি, তাই ঝাল এবং কষায়কে বাদ দিতে পারিনি। ঝালের স্বাদকে বলা হতো কটু।”

জিভের এক এক অংশে এক স্বাদের উৎপত্তি, এই কথাটা আমার ভাল লাগলো না।

ব্যান্ডোদা জানালেন, “সায়ান্সের বইতে সেরকমই বলছে। জিভের ওপর যে গুঁড়ি গুঁড়ি কুঁড়ি দেখা যায় তাদেরই বলে স্বাদকুঁড়ি বা টেস্টবাড্—তোর জিভে এইরকম দশ হাজার কুঁড়ি রয়েছে—গোরুরা অনেক এগিয়ে, ওদের জিভে পঁচিশ হাজার। এলাইনে স্বাদসম্রাট হচ্ছেন মাগুর মাছ—ওদের জিভে অন্তত একলাখ স্বাদকুঁড়ি।”

দুঃসংবাদ! যতো বয়স বাড়ে ততো স্বাদকুঁড়ির সংখ্যা কমতে থাকে। বুড়োবয়সে সাধে কি আর মানুষের অরুচি হয়, কোনও রান্নাতেই বৃদ্ধরা আগেকার স্বাদ খুঁজে পান না।

এবার আমাকে মা কালীর মতন জিভ বার করতে নির্দেশ দিলেন ব্যান্ডোদা। জিভের কোন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ তা বুঝিয়ে দেবেন। “তোরা দুনিয়ার এতো খবরাখবর রাখিস, অথচ নিজের শরীরের খবরগুলোও জানিস না। শোন্, মিষ্টি স্বাদের জায়গা হলো জিভের ডগায়।

তেতো স্বাদের জায়গা হলো জিভের পিছন দিকে।"

"হোয়াট অ্যাবাউট নোনতা, ব্যান্ডোদা?"

"জিভের দু'ধারে আসর জাঁকিয়ে রয়েছেন নোনতা অ্যান্ড টক। জিভের সামনের দুই ধারে নোনতা এবং পিছনের দুই ধারে টক।"

"জিভের মধ্যিখানে কীসের স্বাদ, ব্যান্ডোদা?"

"ওরে বাছা, ফিজিওলজিটা একটু ঘাঁটাঘাঁটি কর, শুধু ফিলজফি আওড়ালে কেমন করে গল্প লিখবি এই যুগে? জিভের মধ্যিখানটায় কোনও স্বাদকেন্দ্র নেই, সবসময় এটা মনে রেখে মুখে খাবার পুরবি।"

ব্যাপারটা হজম করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি। ব্যান্ডোদা উপদেশ দিলেন, "সবার মাথায় সব সাবজেক্ট ঢুকতে চায় না। আমি স্বাদের সঙ্গে ঘ্রাণের জটিলতা মেশাতে চাই না। সাধারণ মানুষের ঘ্রাণশক্তি পঁচিশ হাজার গুণ বেশি তার স্বাদশক্তি থেকে—তাই নাকে একবার দুর্গন্ধ লাগলে সে খাবার মানুষকে খাওয়ানো কঠিন হয়ে পড়ে।"

"চায়ের বিজ্ঞাপনে বলে থাকে, স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়!"

ব্যান্ডোদা বললেন, "এই গন্ধের ব্যাপারে ইন্ডিয়ায় অনেক রিসার্চ হয়েছে, কিন্তু সেসব তোরা ভুলে গিয়েছিস। এখন শুধু আমরা জানি, খাবারে গন্ধ আনে মশলা। তার আগে কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ খাবারকে পুড়িয়ে সুগন্ধ করেছে।"

"ব্যান্ডোদা, এতো সব পয়েন্ট মাথায় রাখতে হলে ভোজনের আনন্দটাই নষ্ট হয়ে যাবে।"

সহানুভূতি দেখালেন ব্যান্ডোদা, সেই সঙ্গে বললেন, "ইংরিজিতে 'ফ্লেবার' বলে একটা কথা আছে, যার সঠিক বাংলা হয় না। এর অর্থ শুধু গন্ধ নয়—স্বাদ এবং গন্ধ দুটো মিলিয়ে ফ্লেবার। এসব জানতে হবে ব্রাদার। মনে রেখো, এই মানবজন্মে প্রত্যেক জীবকে অন্তত তিরিশ টন খাবার সারাজীবনে উদরস্থ করতে হবে, সুতরাং অবহেলা বাড়বার উপায় নেই।"

আমি এবার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আশ্রয়ভিক্ষা করে তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিলাম : "বাপ পিতামহের মতন শাক-মাছ আম-দুধ পেটপুরে খাও—তা হলেই নেচেকুঁদে বেড়াতে পারবে।"

"ইয়েস," ঠোঁট বেঁকালেন ব্যান্ডোদা। "কিন্তু রিসার্চ থেকে আমরা জানতে পারছি, আচার্যদেব সারাজীবন সিরিয়াস পেটের গোলমালে ভুগেছেন। ঐ একটি ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দও মুক্ত ছিলেন না।"

"পেটরোগা মানুষরা বোধ হয় দিলদরিয়া হয়, ব্যান্ডোদা। শুনেছি, নোবেল প্রাইজের নোবেল সায়েব একটা সিদ্ধ ডিমও হজম করতে পারতেন না!"

অধ্যাপক সর্বদমন রায় সম্প্রতি চরকসংহিতার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে গভীর গবেষণায় ডুবে রয়েছেন। প্যারিসের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী বছর তাঁকে একটি নিবন্ধ পাঠ করতে হবে।

ব্যান্ডোদা বললেন, "ওসব আপনি করুন। কিন্তু আমাকেও উদ্ধার করতে হবে। কটুরস সম্পর্কে আপনার সাহায্য কিছুতেই ভুলতে পারবো না।" এবার যে অম্লরস সম্বন্ধে তিনি আগ্রহী তা ব্যান্ডোদা সরলভাবে জানিয়ে দিলেন।

সর্বদমনবাবুও শিশুর মতন উৎসাহী হয়ে উঠলেন। "এই অম্লরস সুর ও অসুর উভয়েরই প্রিয়—একথা আমি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে বলে এসেছি।"

"মানবীয় ব্যাপারে আবার অসুর কেন?"

সর্বদমন বললেন, "যাদের মধ্যে সুরা অথবা সুধা নেই তারাই তো অসুর! আরও খুঁটিয়ে দেখলে দম্ভ, দর্প ও অজ্ঞানতা যারই আছে সেই অসুর।"

"তার মানে বঙ্গভঙ্গের নায়ক লর্ড কার্জনকেও আমরা অসুর বলতে পারি?"

"অবশ্যই। অ্যাকর্ডিং টু গীতা, অজ্ঞ ব্যক্তিই অসুর—যারা ভোগসুখে মত্ত তারাও অসুর।"

"তা হলে তো বিশ্বায়নের স্রোতে গোটা দেশটাই অসুরভূমি হয়ে উঠেছে, সর্বদমনবাবু।"

আমার কথা শুনে সর্বদমনের উত্তর : "টীকা নিষ্প্রয়োজন! দেশটা

কাদের হাতে চলে গিয়েছে তা ট্রামে বাসের যাত্রীদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "ষড়রসের সন্ধানে আমাদের যৌথ প্রচেষ্টা থেকে যদি কোনও বই কখনও লেখা হয় তা হলে তার একটা জুতসই নাম ঠিক করে দেবেন, প্রফেসর রায়।"

সর্বদমন সবিনয়ে জানালেন, "সিরিয়াস বই হলে নাম দিতে পারেন রসকল্পদ্রুম। আর লাইট লেখা হলে—রসমাধুরী। চরক তো বলেই দিয়েছেন, রসনা সংমিলনে দ্রব্য সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ হয় তার নামই রস। রস উপযোগে ভোজনের শেষে যেসব লক্ষণ দেখা দেয় তাকে বিপাক বলে।"

ব্যান্ডোদা আমাকে ওয়ার্নিং দিলেন, "কথাগুলো শুধু শুনলে হবে না, একটু পরেই ভুলে যাবি। হয় টেপ রেকর্ডিং কর, না হয় লিখে নে।"

"হাজার দুয়েক পাতা কণ্ঠস্থ হতে আর কতো সময় লাগবে?" সর্বদমনের কাছে ওসব ডাল ভাত।

ব্যান্ডোদার অনুরোধে এবার এক একটা রসের ভিতরের খবর দিতে লাগলেন সর্বদমন।

"সোমরসের আধিক্য থেকে মধুর রসের উদ্ভব। এই রস মেদ, অস্থি, মজ্জা, ওজ ইত্যাদি বর্ধনকর। এই রস প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা সম্পন্নকারী।"

মিষ্টান্নপ্রেমী ব্যান্ডোদা সানন্দে বলে উঠলেন, "আহা!"

সর্বদমন ব্যাখ্যা করলেন, "মধুর রসের অনুভূতি—স্নিগ্ধতা, প্রীতি, আহ্লাদ এবং মৃদুতা। তবে অধিক ব্যবহারে দেহের স্থূলতা, আলস্য, অতিনিদ্রা, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি পীড়ার আবির্ভাব!"

"মিষ্টি সম্বন্ধে আর লেখাবেন না, ব্যান্ডোদা। বিনা পাবলিসিটিতেই বাঙালিরা প্রতিদিন ময়রার দোকান উজাড় করে দিচ্ছে।"

ব্যান্ডোদা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে এবার নোনতা সম্বন্ধে সর্বদমনবাবুর নবলব্ধ জ্ঞানের ইঙ্গিত চাইলেন।

সর্বদমন বললেন, "জল ও অগ্নিগুণ প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকলে

লবণ রসের উদ্ভব হয়। নোনতার নানা গুণ—পাচক, অগ্নি উদ্দীপক, বাতহর এবং কাঠিন্যবিনাশক। তবে অতিরিক্ত সেবনে পিত্তকোপ বৃদ্ধি হয়, পিপাসা জন্মায়, সেই সঙ্গে গাত্রদাহ, অকালে চর্মের শিথিলতা এবং মাথায় টাক উৎপাদন করে।"

"পেয়েছি, পেয়েছি—আমার মাথার টাকের কারণটা এতোদিনে জানা গেলো," বলে উঠলেন ব্যান্ডোদা।

"যে ক'টি চুল এখনও হেড অফিসে আছে তা রক্ষে করতে হলে আপনাকে নোনতা খাওয়া কমাতে হবে, ব্যান্ডোদা।"

"আর দুশ্চিন্তা বাড়াসনি, মুখুজ্যে। মিষ্টি খেলে স্থূলতা আর নোনতা খেলে টাক—কোনদিক সামলাবে পৃথিবীর মানুষ?"

"আরও চারটে রস ভগবান আমাদের জিভের ডগায় দিয়েছেন, ব্যান্ডোদা। যেমন ঝাল, যার ডাকনাম কটুরস।"

সর্বদমন শান্তভাবে বললেন, "চরকের মতে কটুরস অগ্নি উদ্দীপক, অলসক, স্নেহ, স্বাদ ও ক্লেদনাশক।"

"ব্যান্ডোদা, অসমীয়া ভাষায় লঙ্কার নাম হলো 'ভোজনঠেলিয়া'—অর্থাৎ অন্য খাবারকে যে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।"

সর্বদমন বললেন, "অত্যধিক সেবনে দেহকে অবসন্ন করে, কৃশ করে, বল হ্রাস হয় এবং পিপাসা জন্মায়, হস্তপদ পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বায়ুজনিত রোগ উৎপাদন করে।"

"উঃ, কোন সাহসে বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভাইরা কচকচ করে লঙ্কা চিবোতেন তা ঠাকুরই জানেন। দেখা যাচ্ছে, কোনও কিছুই ভোজন করে শান্তি পাবার উপায় নেই।"

"আছে, তবে পরিমিত সেবনে," সংশোধনী পেশ করলেন অধ্যাপক সর্বদমন রায়। বিশ্বসংসারে এই পরিমিতিবোধটাই দীর্ঘায়ু হবার চাবিকাঠি, না হলে এইটুকু শরীরে সারাজীবনে তিরিশ টন খাবার ঢুকবে কী করে?"

ব্যান্ডোদা এবার সোজাসুজি টকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তাঁর ধারণা টকই রসকাব্যের উপেক্ষিতা।

এ-ব্যাপারে সর্বদমনবাবুর প্রবল উৎসাহ রয়েছে। চরকের উদ্ধৃতি দিয়ে

তিনি বললেন, "অম্লরসের গুণের শেষ নেই। এর দ্বারা অগ্নি উদ্দীপিত হয়, চিত্তের চৈতন্য জন্মায়, শরীর তেজস্বী হয়। লঘু ও স্নিগ্ধ টক হৃদয়ের তৃপ্তি-জনক দেহেরও তৃপ্তি-বিধায়ক।"

"টকের খারাপ সাইডও নিশ্চয় আছে," মন্তব্য করলেন ব্যান্ডোদা।

সর্বদমন বললেন, "অধিক সেবনে দন্তহর্ষ, লোমহর্ষ, মাংস-দাহ। এছাড়া কণ্ঠ, বক্ষ ও হৃদয়ে জ্বালা জন্মায়। অম্লরস হয়েছে জানবার উপায় মুখ থেকে জল-ক্ষরণ, ঘাম, মুখ ও কণ্ঠের জ্বালা ও দন্তহর্ষ।"

"দাঁত আবার হাসে কখন?" আমার এই প্রশ্নে ব্যান্ডোদা হেসে ফেললেন।

"তোর সংস্কৃতজ্ঞান আমার থেকেও খারাপ। শুনে রাখ, দাঁত শিরশির করাকে চিকিৎসকরা দন্তহর্ষ বলেন।"

"দন্তসাধ বলেও একটা কথা আছে," জানালেন সর্বদমন। "এর অর্থ কামরাঙ্গা। এই কামরাঙ্গা, লেবু, করঞ্জা, চালতা, কদবেল, তেঁতুল, আমড়া, এটসেটরার সঙ্গে দুগ্ধপান নিষিদ্ধ।"

আমি এবার আমড়া নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। উদ্বোধনের সম্পাদক স্বামী পূর্ণানন্দ একবার বলেছিলেন, এই আমড়ার প্রতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বোধহয় বিশেষ টান ছিল। কথামৃতে অন্তত চারবার আমড়ার উল্লেখ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসার যেন দিশী আমড়া, ভিতরে আঁটি ও বাইরে চামড়া। ঠাকুর বলছেন, সংসারে সুখ তো দেখছ? যেমন আমড়া—কেবল আঁটি আর চামড়া—খেলে অম্লশূল হয়।

তবু আমড়ার প্রতি অনন্তকালের টান যায় না মানুষের। শুনুন ঠাকুরের মুখে—চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে, তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে? তারা বললে, যদি বাবুরা খেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে খেয়ে গিয়েছেন সেকালে ভালই হয়েছে।

কিন্তু টোকো আমড়াকে শ্রীরামকৃষ্ণ মোটেই প্রশ্রয় দেননি। ঠাকুর বলছেন, তিনি অর্থাৎ ঈশ্বর মিষ্টি আমগাছও করেছেন, আবার টক আমড়া গাছও করেছেন।

সর্বদমন বললেন, "প্রাচীন শাস্ত্রে কিন্তু টক ফলের প্রশস্তি যথেষ্ট জায়গায় রয়েছে। যেমন বদর। মহাভারতে বদরিকা তীর্থের প্রবল প্রশংসা, শ্রেষ্ঠ দেবস্থান বদরিনাথ। ফলরূপী এই বদরের লোকায়ত নাম কুল। এই কুল কাঁচা থাকলে কফ ও পিত্ত বৃদ্ধি করে, কিন্তু পাকা হলে পিত্ত ও বায়ুর বিকার নষ্ট করে। আগেকারদিনে খাই খাই রোগ হতো মানুষের, এর চিকিৎসা হতো কুলের ভস্মকাগ্নি দিয়ে!'

বিশিষ্ট অতিথির জন্যে আবার ভেজিটেব্‌ল পকোড়ার অর্ডার দিয়েছেন ব্যান্ডোদা। রুম সার্ভিস থেকে পাঠানো প্লেটের দিকে তাকিয়ে সর্বদমন জানালেন, "প্রাচীন ভারতের প্রিয় খাবার। তখন নাম ছিল পক্ক বড়া, তার থেকেই পকোড়া। একমাত্র গুজরাতেই সেকালে উনিশরকম বড়া জনপ্রিয় ছিল।"

যারা বড়া ভাজতো তাদেরও বিশেষ নাম ছিল শুনে ব্যান্ডোদা তাঁর ডায়রি খুললেন। সর্বদমন জানালেন, "সনাতন ভারতে রাঁধুনির নানা নাম—সূপকার, ওদনিক, ভোজন দত্র! যারা মশলা নিয়ন্ত্রণ করতো তাদের বলা হতো অবলিক। যারা বেকিং করতো তাদের নাম অপুপিক। আর ভাজাভুজির বিশেষজ্ঞদের বলা হতো কণ্ডবিক।"

ব্যান্ডোদা বিমোহিত। "ত্যাগ ও ভোগ দুটোতেই প্রাচীন ভারত হায়েস্ট লেভেলে উঠেছিল। তোরা ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামালি না একটুও—ফলে ভারতবর্ষ এখনও পৃথিবীর মানুষের কাছে অজানা রয়ে গেলো।"

"স্বদেশের ভাবমূর্তি কীভাবে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তা আমরা জানি না, ব্যান্ডোদা। ব্যাপারটা বেশ শক্ত।"

ব্যান্ডোদা একমত হতে চাইলেন না। "শক্ত মোটেই নয়। কোনও সায়েব বিষয়টা হাতে নিলে বিষয়টা ডালভাত হয়ে যাবে। এই দ্যাখ না মহাত্মা গান্ধীর বিষয়টা—দুনিয়ার সর্বত্র আজ তিনি হিরো, কেউ কেউ বলছেন দ্বিতীয় সহস্রকের সেরা মানুষ। এর পিছনে কিন্তু রয়েছে এটেনবরো সায়েবের চলচ্চিত্র। আমরা এসব সাবজেক্ট ভাবতে পারি না কেন?"

রুম সার্ভিসের ছেলেটি পকোড়া নিয়ে এলো। ডালা তুলে ব্যান্ডোদা

সসগুলি দেখে নিলেন, তারপর বললেন, "আপনারা তেঁতুল রাখেন না?" অবশ্যই তাজ বেঙ্গলের স্টকে সবকিছু আছে। সে দ্রুতবেগে ট্যামারিন্ড সসের বোতল নিয়ে এলো।

তেঁতুল সসের রসস্বাদন করতে করতে ব্যান্ডোদা বললেন, "আমার ধারণা, লঙ্কার পরে ইন্ডিয়ার এই তেঁতুলই একদিন দুনিয়া জয় করবে। কোথায় ভিনিগার আর কোথায় তেঁতুল! ভগবান দুনিয়ার ওঁচা জিনিসগুলোই সায়েবদের উপহার দিয়েছেন।"

সর্বদমনবাবু তেঁতুল বিশেষজ্ঞ। বললেন, "প্রভাতরঞ্জন সরকার মহাশয়ের লেখায় তেঁতুলের গল্প পড়েছি। ইন্ডিয়ার একেবারে নিজস্ব জিনিস, একবার কীভাবে ইরানে চলে গেলো। সরল ইরানীরা ভাবলো এইটাই বুঝি ইন্ডিয়ার আম। তাই নাম দিলো তামার-ই-হিন্দ। বিবর্তিত হয়ে বিলেতে গিয়ে ট্যামারিন্ড রূপ নিলো।"

"কিন্তু তেঁতুল শব্দটা কোথা থেকে এলো?" জানতে চাইছেন আমাদের প্রিয় ব্যান্ডোদা।

আমি আন্দাজ করলাম, তিন্তিড়ি থেকে বাংলায় তেঁতুল।

সর্বদমন বললেন, "এসব বিষয়ে প্রভাতরঞ্জন রচনাবলী পাঠ করে সুখ অনেক। সরকার বলছেন, তেঁতুলের আর এক নাম ইমলী, সংস্কৃতে আমলিক থেকে এসেছে আমলী শব্দ—এর থেকে ইমলী।"

এই আমলিক থেকেই কি আম এসেছে?

মাথা চুলকোতে লাগলেন সর্বদমন রায়। তাঁর সবিনয় নিবেদন, তামিলে 'মাঙ্গা' বলে একটি শব্দ আছে, ওটা চুরি করে সায়েবরা পেয়েছে 'ম্যাংগো'। "জেনে রাখা ভাল, ফিলিপাইনসেও আমকে মাঙ্গা বলে। আমরা অবশ্য আমের দাম বাড়লে মাঙ্গা বলি!"

সর্বদমন বললেন, "ফিলিপাইনসের কথা যখন উঠলো তখন জেনে রাখুন, প্রাচীন ভারতে এই দেশের নাম ছিল মহার্লিকা, যার অর্থ আকারে ছোট, কিন্তু গুণে বড়!"

"ব্যান্ডোদা, আমার সন্দেহ হচ্ছে, হর্লিকস্ নামটা সায়েবরা এই সূত্র থেকেই পেয়েছে। আকারে ছোট এবং গুণে বড়, এই আইডিয়াটা জনগণকে

বোঝাতে চেয়েছে।”

সর্বদমন খুশি হলেন না। সিরিয়াস আলোচনার সময় ফচকেমি তিনি পছন্দ করেন না। যদি হর্লিক্স-এর উল্লেখ কোথাও থাকতো তা হলে প্রভাতরঞ্জন সরকার তা চেপে যেতেন না। মস্ত রসিক এই মানুষটি, কতো বিষয়ে কতো জ্ঞান যে ছিল তার পুরো হিসেব এখনও পাওয়া যায়নি।

ব্যান্ডোদা মনের সুখে তেঁতুল সসে পকোড়া নিমজ্জিত করে অম্লরস উপভোগ করছেন। অথচ আমাদের ধারণা ছিল, তিনি কেবল মিষ্টি ও ঝালের ভক্ত। ব্যান্ডোদা বললেন, “ঈশ্বর যখন ষড়রসের সৃষ্টি করেছেন তখন টক অথবা তেতোকে ছোট করার আমি কে? আমি দেখছি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সব রকম রসের টান আছে, শুধু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নেওয়া।”

“মিঠাই, নোনতা ও ঝাল, এই তিন রসেরই আদর জনগণের নোলায়, কেবল টকের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার বহু যুগ ধরে চালানো হচ্ছে।”

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যান্ডোদা বললেন, “কখনও ‘ভেগু’ অর্থাৎ অস্পষ্ট অভিযোগ করবি না। সবসময় উদাহরণ রেডি করে রাখাটাই সভ্য সমাজের রীতি।”

“আমি প্রস্তুত, ব্যান্ডোদা। হাতের গোড়াতেই প্রফেসর সর্বদমন রায় রয়েছেন। খাবারের ব্যাপারে ঐতিহাসিক দিকটা তিনি তুলে ধরতে পারবেন।”

“উনি হচ্ছেন ভারততত্ত্ববিদ, তোর মতন ভোজনতত্ত্ববিদ হবার কোনও ইচ্ছে তাঁর নেই,” বকুনি লাগালেন ব্যান্ডোদা।

“প্রাচীন ভারতে টক (এবং টাকার) জনপ্রিয়তা কমাবার বহু চেষ্টা হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, ব্যান্ডোদা। স্বয়ং শিবকালী ভট্টাচার্য মশাই একবার আমাকে বলেছিলেন, তেঁতুলের আর একটি নাম ‘যমদূতিকা’। এই নাম শোনবার পরেও যে তেঁতুলের স্থান হয়েছে রান্নাঘরে এইটাই আশ্চর্য। শুধু সংস্কৃত নয়, বাংলাতেও বলে, তাল তেঁতুল কুল—তিন করে বংশ নির্মূল।”

ব্যান্ডোদা যে অস্বস্তিবোধ করছেন তা এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। একটু নরম সুরে তিনি বললেন, “প্রাচীন ভারতের বৈদ্যরা নিশ্চয় এদের মধ্যে

কোনও খারাপ লক্ষণ খুঁজে পেয়েছিলেন, বংশলোপ বলে কথা।”

সহাস্য সর্বদমন এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন। বললেন, “গেরস্তর বংশলোপের কোনও আশঙ্কাই নেই। এর অর্থ তাল, তেঁতুল এবং কুলগাছের তলায় কোনও গাছ হতে চায় না। শুনুন, শিবকালীবাবু, যাঁর স্নেহপ্রশ্রয়ে শংকরবাবু লালিতপালিত হয়েছেন, তিনিই তেঁতুলকে প্রাণদা বলেছেন, অর্থাৎ তেঁতুল শরীরে বল প্রদান করে। সাধে কি আর মাদ্রাজীরা টন টন তেঁতুল হাসতে হাসতে উড়িয়ে দেয়। এছাড়া তেঁতুলের অঞ্চন শক্তি আছে।”

“সে জিনিসটি কী?” আমি বুঝতে পারছি না।

“সংস্কৃত একটুও না পড়ে এ-লাইনে আসার অর্থ হয় না।” বিরক্তি প্রকাশ করলেন সর্বদমন রায়। “ভাল বাংলায় অঞ্চনশক্তি মানে শরীরে মেদ বৃদ্ধি হয় না। সাধে কি আর বুনো রামনাথ স্রেফ তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়ে জীবনধারণ করতেন!”

আমার মনে পড়ে গেলো, চৌধুরীবাগানে বুড়ো ঠাকুরমশাই বলতেন, পাঁচটি আইটেম পুরনো হলেও বাতিল হয়ে যায় না। অর্থাৎ বৃদ্ধ হলেও খাতির বাড়ে— তেঁতুল, কুল, ঘি, চাকর এবং চাল।

সর্বদমন বললেন, “সর্ব অর্থে সুরসিক ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। অথর্ববেদে এই তেঁতুলকে বলা হয়েছে চিম্বা-চিং অর্থাৎ ভোজন কালে চক্-চক্ টক্-টক্ শব্দ হয়।”

এবার সর্বদমনবাবু আমাকে সাপোর্ট করলেন। “মধুর রসের তুলনায় অম্লরসকে অবহেলার অনেক উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। এখন যেমন আদা ও রসুনের ওপর ট্যাক্সো চাপানোর জন্যে আমাদের মন্ত্রীরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন তেমন প্রাচীনকালে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী আটটা অম্লরসাত্মক ফলের ওপর কর বসানো হয়েছিল। এর একটির নামও দেওয়া হয়েছিল করমর্দক, বাকিগুলি তেঁতুল, আম, দাড়িম, ফলসা, কুল, আমলকী ও নেবু।”

করমর্দক কোন্ ফল? আমি সঠিক উত্তর দিতে পারলাম না।

সর্বদমন রায়মহাশয় মৃদু হেসে জানালেন, “আরে মশাই, যাকে

আপনারা করমচা বলেন।”

ব্যান্ডোদো তখন ভাবছেন আমের ওপর ট্যাক্সো চাপানোর খবরটা একবার রাইটার্স বিলডিংয়ে পৌঁছলে আর রক্ষা নেই। ফিনান্স সেক্রেটারি ও ফিনান্স মিনিস্টার দু'জনেই হুমড়ি খেয়ে পড়বেন। দূরদর্শনকে ডেকে জানিয়ে দেবেন, প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যে বাধ্য হয়ে তাঁরা আমের ওপর কর বসাচ্ছেন।

কিন্তু করের তালিকায় আমড়ার উল্লেখ নেই কেন?

কঠিন প্রশ্ন। আমি মাথা চুলকে উত্তর দিলাম, “হয়তো অতি নিকৃষ্ট খাদ্য বলে। গরিবদের হয়তো আমড়া ছাড়া কিছু জুটতো না। দেখছেন না, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কীভাবে আমড়াকে বারবার আক্রমণ করেছেন।”

এবারেও আমার হার। সর্বদমন বললেন, “সত্যি কথাটা হলো, কৌটিল্যের আমলে আমড়া আদৌ এদেশের সিটিজেন হয়নি। অন্তত বিলিতি আমড়া যে বহিরাগত এবং তার আগমন যে ফিজি থেকে তা আমি শিবকালিবাবুর কাছ থেকেই শুনেছি। আর আমড়ার যতো নিন্দে হোক, জেনে রাখুন একসময় আমাদের পূর্বপুরুষরা পরমানন্দে আমড়া থেকে তৈরি মদ্য পান করতেন, নাম ছিল কপীতন। জেনে রাখবেন কপীকুল অর্থাৎ বানরদের সবচেয়ে প্রিয় এই আমড়া গাছ, আমড়া গাছ থাকলেই নাকি কপীকুলের বংশবৃদ্ধি হয়।”

সর্বদমন আরও খবর দিলেন, “অরুচিতে আমড়ার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে—দুধ ও চিনি দিয়ে গাঁয়ের লোকেরা পাকা আমড়া খেতেন। গাঁয়ে গেলে এখনও ছড়া শুনতে পাবেন :

গায়ে নেই ছাল চামড়া
দুধ দিয়ে যায় পাকা আমড়া।”

এবার নেবুর কথা উঠলো। ব্যান্ডোদার ঘরে বিশিষ্ট অতিথিকে সুস্বাগতম জানাবার জন্যে হোটেল ম্যানেজার বিনামূল্যে এক পাত্র ফল পাঠিয়েছিলেন— বেশিরভাগই নেবু। একটা নেবু তুলে নিয়ে সর্বদমনের দিকে এগিয়ে দিলেন ব্যান্ডোদা। তিনি জানেন, এই ফলে আমার তেমন আগ্রহ নেই।

সর্বদমন বললেন, "অম্ল রসচর্চা যখন শুরু হয়ছে তখন বলে রাখা ভাল, লেবু থেকে নেবু নয়। আদি সংস্কৃত শব্দটা হল নিম্বু। স্বাদে অম্ল ও স্বভাবে উষ্ণ ক্ষুধাবর্ধক পাতিনেবুর বাসস্থান এই ভারতবর্ষ। লোকগাথায় এর খুব আদর ছিল:

নুন টুকটুকি নেবুর রস
গেঁড়া ভাতার মাগের বশ,

এই উদ্ধৃতি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেও পাবেন।"

কতোরকমের নেবুর যে উল্লেখ রয়েছে প্রাচীন শাস্ত্রে তার শেষ নেই। "যেমন ধরুন মুসুম্বী—আদি নাম মধুজম্বীর—স্বাদে মধুর, স্বভাবে গুরু, বাত-পিত্তনাশক। ভারতীয় সিটিজেন! আর কমলানেবুর আদিভূমি কেউ বলেন চীন, কেউ ভারত। এই ফলটিরও গুণের শেষ নেই—হৃদয়ের তৃপ্তিকর, বাতঘ্ন এবং গুরুপাক।"

"আর বাতাবি নেবু?"

ব্যান্ডোদা : "নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে বাটাভিয়া থেকে এসেছে!"

সর্বদমনের সংযোগ : "একেই বলা হতো মহানেবু অথবা মহাকর্কটি। স্বাদে মধুর, স্বভাবে শীতল, ত্রিদোষহর এবং রুচিকর, তবে হজমে বেশ দেরি হয়।"

এবার পাতিনেবু ও কাগজী নেবু নিয়ে মজাদার আলোচনা শুরু হলো। ব্যান্ডোদা নিজেই বললেন, "বিস্তারিত অনুসন্ধান করতে হবে। মুখুজ্যে, পরের মুখে টক খেয়ে এই রিসার্চ শেষ করা যাবে না, কারণ বাঙালির অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই কাগজী নেবুর একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ব্রাজিলে গিয়ে আনন্দমার্গের এক সাধুর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন, প্রভাতরঞ্জন সরকার কোনও লেখায় বলেছেন, এই নেবু হুগলি জেলার কাগজী মুসলমানরা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বাংলায় নিয়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজ আমলের শুরুতে এঁরা দেশীয় পদ্ধতিতে কাগজ তৈরি করতেন, তারপর হুগলিতে কলের কাগজ তৈরি শুরু হওয়ায় এঁরা জীবিকাচ্যুত হয়ে কর্মসন্ধানে দক্ষিণ আমেরিকায় পাড়ি দেন। সাহস থাকলে এঁদের সম্বন্ধে খোঁজখবর কর, চলে যা দক্ষিণ আমেরিকায়, লিখে ফেল এমন একটা বই

যা নতুন যুগের বাঙালিদের বুকে বল দেবে। অনেক দেশ চষে বেড়িয়েছিলেন আনন্দমূর্তি প্রভাতরঞ্জন, ওঁর পক্ষেই এরকম খবর সরবরাহ করা সম্ভব।"

এবার কঠিন প্রশ্ন তুললেন ব্যান্ডোদা। "দ্যাখ, আমাদের এই অনুসন্ধানে শুধু অতীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে চলবে না। মানুষের পক্ষে যেসব জ্ঞান এখনও প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে হবে। সুতরাং একটা প্রশ্নের উত্তর চাই: টক খেলে কি বুদ্ধি বাড়ে?"

সর্বদমনবাবুর সংযত উত্তর : "শ্রীরামকৃষ্ণ তো তেঁতুল আমড়া ইত্যাদির গুণ তেমন দেখতে পেতেন না। সংসারী জীবকে বিকারের রোগীর সঙ্গে তুলনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন তারই ঘরে জলের জালা এবং আচার তেঁতুল। বিষয়ভোগ তৃষ্ণা হলো জলতৃষ্ণা। আর তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে, কাছে আনতে হয় না। আর একবার একজন চিকিৎসক গর্ব করে ঠাকুরকে বলছেন তাঁর রোগনির্ণয় ক্ষমতা। সাতমাসের মেয়ের ঘুঙড়ি কাশি, কিছুতেই রোগনির্ণয় হচ্ছে না। দূরদর্শী ডাক্তার এসে বলে দিলেন, যে-গাধার দুধ মেয়েটিকে খাওয়ানো হয় সে নিশ্চয় জলে ভিজেছে। সুরসিক শ্রীরামকৃষ্ণও ছাড়বার পাত্র নন, তাঁর উত্তর: কি বলো গো! তেঁতুল তলায় আমার গাড়ি গিয়েছিল, তাই আমার অম্বল হয়েছে!"

আমি বললাম, "হাওড়ায় যেখানে আমার বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছে সেখানে অনেক মাদ্রাজীদের বসবাস ছিল। এদের দৌলতে কালীবাবুর বাজারে প্রচুর তেঁতুল বিক্রি হতো। তেঁতুলপ্রেমীদের আদর করে লোকে তেঁতুল বলে ডাকতো—মাদ্রাজীরা যে বুদ্ধিমান তা অস্বীকার করবে কে?"

"ইয়েস! ইন্ডিয়ার যতো উন্নতি সব এখন সাউথে। টক তেঁতুলের জোরেই যে কমপিউটারে এতো মাথা তা হয়তো প্রমাণ করা যেতে পারে।"

এবার. আম সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করছেন ব্যান্ডোদা। সর্বদমন বললেন, "আম তো মহাসাগর—ফিফটি ভল্যুম লেখা হলেও তো এর উপক্রমণিকা শেষ হবে না। ওই সাবজেক্ট একজীবনে কভার করা যাবে না। আমের মধ্যে অম্ল রস ও মধুর রসের মহামিলন ঘটেছে।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "ইস্কুলে এই আমের জন্যেই মার খেয়েছিলাম। কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তবে মিছে সহকার শাখা, তবে মিছে মঙ্গলকলস। এই সহকার মানে যে আম তা আমার জানা ছিল না। মার খেয়ে মনের দুঃখে পুরো একটা সিজন আম খাইনি। তারপর ব্রাজিলে গিয়ে এবার এক সন্ন্যাসীর কাছে শুনলাম, খ্রিস্টের জন্মের হাজার বছর আগে বৃহদারণ্যক উপনিষদে সহকার-এর উল্লেখ রয়েছে।"

সর্বদমন : "তা হলে তিন হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ আমের জয়গানে মুখরিত। এদেশে অন্তত হাজার রকমের আমগাছ আছে। আগে কলম করা নিষিদ্ধ ছিল, তারপর পর্তুগিজরা ঐ কাজে হাত দিলো, উৎসাহ জোগালেন মোগলরা। শুনে রাখুন, চণ্ডীগড়ের কাছে একটা গাছে সতেরো হাজার কেজি আম হয়! ঠিকমতন যত্ন পেলে আমগাছ তিনশো বছর বাঁচতে পারে মানুষের রসনা নিবৃত্তির জন্যে।"

"আজকাল ভাল আম ভেট পাঠিয়ে বড় ব্যবসায়ীরা অনেকের মন জয় করেন," বললাম আমি।

"স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এই কাজ করতেন। আম খাইয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতেন, তাই আমের অন্য নাম কেশবায়ুধ," জানালেন সর্বদমন রায়।

তাই শুনে ব্যান্ডোদার মন্তব্য : "বহু ক্ষমতা রাখতেন কৃষ্ণ বাসুদেব। সাধে কি আর সারা দেশ এতো যুগ পরেও কৃষ্ণনামে মেতে রয়েছে!"

সর্বদমন বললেন, "আমের একটি প্রিয়সংস্করণ আম্রপেষী!"

"আমসত্ত্ব শুনেছি—রবীন্দ্রকাব্যের উৎসমূলেই রয়েছে—আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলি দলি।"

"আম্রপেষীও শুনেছেন, ঠিক নজর করেননি। ঘরোয়া বাংলায় আপনারা যাকে আমসী বলেন। সেই সঙ্গে জেনে রাখুন, কোনও কোনও তেঁতুল মধুর চেয়ে মিষ্টি হয়, এর নাম মধুতেঁতুল।"

অম্লরসের সন্ধান করতে গিয়ে অনেক সময় ব্যয় হয়েছে। সর্বদমনকে ব্যান্ডোদা অনুরোধ করলেন, ফলের বাইরে অম্লরসের প্রভাব সম্পর্কে একটা সহজবোধ্য নোট তৈরি করতে। খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন

সর্বদমন, কারণ তাঁর ধারণা, দই ও ছানা থেকে উৎকৃষ্ট খাদ্য মানুষ এখনও উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়নি।

সর্বদমন ছুটলেন তাঁর এক কবিরাজ বন্ধুর বাড়ির দিকে—এই কবিরাজরা ষড়রসের সবকটি রসকে গুলে খেয়েছে। আর ওঁকে বিদায় জানিয়ে, আমরা দু'জনে রওনা দিলাম রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ঘোষের বাড়ির দিকে।

অধ্যাপক ঘোষ আমাদের মতিগতি লক্ষ্য করে মানসিক আঘাত পেলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যের কোনও বিশেষ দিক নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবো। কিন্তু ব্যান্ডোদা প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন: "আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যের মূলে প্রবেশ করে দেখতে চাই সেখানে অম্লরসের প্রভাব কতটুকু। তাঁর প্রথম লেখার প্রথম শব্দটিই তো অম্লরসাত্মক—আমসত্ত্ব দুধে ফেলি।"

নিতান্ত অখুশি হয়েও মুক্তি পেলেন না এই প্রবীন ও প্রাজ্ঞ অধ্যাপক। তিনি বললেন, "আপনি তো জানেন, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখে গিয়েছেন—মহর্ষির খাবার সময় কোনও ত্রুটি হবার উপায় ছিল না। ডাল তরকারি সব রান্নাতেই পর্যাপ্ত পরিমাণ চিনি থাকা চাই। ঠাকুরবাড়ির রান্না মিষ্টি—লোকের এই ধারণা সম্ভবত এর থেকেই এসেছে।"

আমাদের সমস্ত লক্ষ্য এখন টকের দিকে বুঝতে পেরে অধ্যাপক ঘোষ বললেন, "রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে যে মেনু অনুসরণ করেছেন তা কমপিউটরে ঢুকিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখবেন, তাঁর প্রিয় আইটেম দই ও আম। ভাল আমের প্রতি ঠাকুরবাড়ির ঠাকুরদের চিরকাল ভীষণ দুর্বলতা। আমার সন্দেহ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হালুয়া অর্থাৎ মোহনভোগেরও সমঝদার ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে খুঁটিয়ে দেখে জানতে পারছি, অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে গিয়ে কীভাবে সেখানে কড়াভোগ বিতরণ হচ্ছে তার মনোগ্রাহী বর্ণনা করেছেন।"

অধ্যাপক ঘোষ এবার অনেক রেফারেন্স বই ঘাঁটলেন। আমাদের রবীন্দ্রানুসন্ধানের পরিধি তাঁকে হতাশ করলেও, তিনি কাউকে নিরুৎসাহ

করতে চাইলেন না।

অধ্যাপক ঘোষ : "ঠাকুরবাড়িতে শেষপাতে দই-এর কথা বলেছি, কিন্তু যা চেপে গিয়েছি, সেই সঙ্গে দুটো সন্দেশ থাকতোই!"

আমরা বেশ উৎসাহ বোধ করছি, কারণ সন্দেশ শুধুমাত্র মিষ্টান্ন নয়, এর পিছনে রয়েছে অম্লসিক্ত দুধ অর্থাৎ ছানার বিশেষ ভূমিকা।

অধ্যাপক ঘোষ দুঃখ করলেন, "বাঙালিদের অনেক ব্যাপার আমি বুঝতে পারি না। অমন যে অমন ছানা, তার নাম দেওয়া হয়েছে দুগ্ধবিকার। বিকার কথাটা মাথায় ঢুকলে কে মশাই আনন্দ করে সন্দেশ উপভোগ করবে?"

অধ্যাপক ঘোষ ঠাকুরবাড়ির রান্নার অনেক খবরাখবর রাখেন। প্রজ্ঞাসুন্দরী বেজবড়ুয়ার ঐতিহাসিক কাজ সম্বন্ধেও তাঁর স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। তিনি বললেন, "লিখে নিন। ঠাকুরবাড়ির প্রিয় অম্লরসাত্মক কিছুপদের নাম শুনুন : কমলালেবুর কালিয়া এবং কিমার দইবড়া।"

বাড়ির সবাই আম ভালবাসতেন বলে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী প্রায়ই পাকা আমের মিঠাই তৈরি করতেন। শুনে রাখুন, এই পদটির পরম ভক্ত ছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিরও নতুন নতুন নাম দিতেন। একবার এক মিষ্টি খেয়ে জানলেন, নাম এলোঝেলো। পছন্দ হলো না, সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে করে দিলেন— পরিবন্ধ।

এবার কয়েকটা পপুলার ঠাকুরবাড়ি চাটনি হুড়হুড় করে উল্লেখ করলেন অধ্যাপক ঘোষ—"পাকা আম ভাতে। পাকা পটলের কুরকুরে অম্বল। কচিকাঁচা তেঁতুলের ফটকিরি ঝোল, বেগুন দিয়ে কাঁচা কুলের অম্বল, তিলবাটা দিয়ে কচি আমড়ার অম্বল, এমনকি পাকা পেঁপের অম্বল।"

অধ্যাপক ঘোষ এবার যে পদগুলির উল্লেখ করলেন তা ব্যান্ডোদাকেও উৎসাহিত করলো না—ইঁচড়ের দইবড়া, দেশী আমড়ার জ্যাম ও কাঁচা আমের পায়েস।

প্রফেসর ঘোষ সাবধান করে দিলেন, "ঠাকুরবাড়ির খ্যাতনামাদের ভোজনবীর বলে ডাকবেন না। ওঁরা ছিলেন প্রকৃত ভোজনরসিক। ওঁদের কিচেন রান্নাঘর নয়, শিল্পমন্দির!"

প্রফেসর ঘোষ যে স্বল্পভোজী তা তাঁর মেদমুক্ত ঝরঝরে শরীর

দেখলেই আন্দাজ করা যায়। তিনি বললেন, "ভোজনবীরদের দেখা যেতো সেকালের উৎসবের আসরে। এঁদের কথা বিস্তারিত জানতে গেলে আপনাকে যেতে হবে সঙ্গীতজ্ঞ রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। বুকপকেট পিঠে ওঠা না পর্যন্ত কলকাতার ভোজনবীররা খেয়ে চলতেন। গোবর গুহর কুস্তির আখড়ায় নামী খাইয়ে ছিলেন ত্রৈলোক্য বসাক। পংক্তিভোজনে বসে সেবার ত্রৈলোক্যবাবু বললেন, শরীর ভাল নয়, বেশি খাবো না, শুধু দই দিয়ে লুচি খাবো। লুচির বিরাট ধামা তাঁর সামনে বসিয়ে দেওয়া হলো, সেই সঙ্গে দুটো বড় হাঁড়ি দই। কয়েক মিনিটে দেড়শো লুচি ও দু'হাঁড়ি দই শেষ হয়ে গেলো।"

অধ্যাপক ঘোষ শুনেছেন, কলকাতার এক জমিদার বাড়িতে পুজোর সময় অন্তত ত্রিশটা বাটি সাজিয়ে দেওয়া হতো, সেই সঙ্গে দেওয়া হতো একটা হরিণের শিঙের ছড়ি— পিঠ চুলকোবার জন্যে নয়, বাটি টেনে আনবার জন্যে।

অধ্যাপক ঘোষ বললেন, বাঙালিদের মধ্যে মেনুকার্ড বোধ হয় ঠাকুরবাড়ির কর্তারাই চালু করেন। প্রজ্ঞাসুন্দরীদেবী এই কার্ড ছাপতেন না, সুন্দর করে হাতে লিখে দিতেন। নাম দিয়েছিলেন ক্রমণী।

পরের দিন অধ্যাপক সর্বদমন রায় বেশকিছু কাগজপত্তর নিয়ে যথাসময়ে তাজ বেঙ্গলে হাজির। তিনি জানালেন, "তেঁতুলের জয়গানে পাঠান-মোগলরাও যোগ দিয়েছিলেন। আপনি ইবন বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে দেখুন। মাদুরায় এসে এই পরিব্রাজক সাংঘাতিক জ্বরে পড়লেন। স্থানীয় লোকদের উপদেশ মতন ভদ্রলোক খেলেন আধসেরের মতন তেঁতুল। ছুটলো পেট—এবং তার ফলে জ্বরের কবল থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন ইবন বতুতা।"

বোঝা যাচ্ছে, সারারাত ধরে রিসার্চ চালিয়েছেন অধ্যাপক সর্বদমন রায়। সগর্বে তিনি বললেন, "শুনুন, তিন রকম অম্লাত্মক ফলের রসের সঙ্গে মধু ও জল মিশিয়ে প্রাচীন ভারতীয়রা তৈরি করতেন পালক বা পানা। ফলের রস ফুটিয়ে যা তৈরি হতো তার নাম 'জুস'—অর্থাৎ ইংরিজি জুস শব্দটি

মোটেই ইংরিজি নয়। ফলের রসের সঙ্গে তেঁতুল, জাম, ফলসা, নেবু, মিছরি এবং মরিচ মিশিয়ে তৈরি হতো 'রাগ'। আম সেদ্ধ করে যে পানীয় তৈরি হতো তার নাম রাগসাধ্ব!"

"দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ভারতীয়রা ফলের রস নিয়ে মাতোয়ারা থাকতেন। মাংস রান্নাতেও এঁরা ফলের রস ব্যবহার করতেন।"

"চরক তাঁর রচনায় ৬১ রকম ফলের উল্লেখ করেছেন। এই লিস্টি অনেক বেড়ে গেলো সুলতানী এবং মোগল আমলে। দিল্লির অনেক জাঁহাপনার নজর মাছ-মাংস থেকে এই ফলের দিকে যেতে আরম্ভ করেছিল।"

সর্বদমন বললেন, "দুধের ব্যাপারেও ভারতবর্ষের প্রতিভা অবিশ্বাস্য বিকশিত হয়েছিল। পাশেই রয়েছে মহাচীন—কিন্তু ওখানে দুধ নিয়ে কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেই। দুষ্টজনরা বলছেন, সায়েবদের আগে গোপালন ব্যাপারে চীনারা প্রায় কিছুই জানতেন না। অথচ এই গোশালা নিয়ে এদেশের রাজন্যবর্গ প্রভূত সময় ও অর্থ ব্যয় করতেন। মোগল আমলেও সম্রাটদের এই শখ কমেনি। স্বয়ং আবুল ফজল দাবি করছেন, আকবরের গোশালার মতন উন্নত ও বৃহৎ গোশালা পৃথিবীর কোনও নরপতির ছিল না। দুধ এবং ফল দুটোই বড় প্রিয় আইটেম ছিল বাদশা আকবরের। নিজেই বলে গিয়েছেন, আমি ধীরে ধীরে মাংস ত্যাগ করিতেছি!"

সর্বদমনবাবু আজ তৈরি হয়ে এসেছেন। তাই ঝটপট অনেক খবর দিয়ে দিলেন। দুগ্ধজাত খাবারের এতো রকম নাম যে ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও জাত দিতে পারেনি তাও সবিনয়ে উল্লেখ করলেন সর্বদমন। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে বলছে, গোরুর দুধই জীবনীয় দ্রব্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই সঙ্গে জরা ও ব্যাধিনাশক।

"তার মানে দুধের ওপর নির্ভর করলে অসুখও হবে না, বয়সও বাড়বে না! মাদার ডেয়ারির কর্তারা জানতে পারলে খুব খুশি হবেন।"

সর্বদমন আমাকে বললেন, "রসিকতা করবেন না। চরকসংহিতায় বলা হচ্ছে গব্য দুগ্ধের দশটি গুণ—স্বাদু, শীতবীর্য, মৃদু, স্নিগ্ধ, বহল, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, গুরু, মন্দ ও প্রসন্নতাকারক।"

"এবার শুনুন দধির গুণ—রুচিজনক, অগ্ন্যুদ্দীপক, স্নিগ্ধকারক, বলবর্ধকও বাতনাশক। কিন্তু মন্দকদধি শরীরের উপযোগী নয়। মন্দক শব্দের অর্থ বুঝলেন তো? যে দই জমেনি। আরও মনে রাখতে হবে, দধির যতোই গুণ থাক, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে দই খাওয়া উচিত নয়।"

"কী বলছেন, অধ্যাপকমশাই। গ্রীষ্মকালে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে গিয়ে শর্মার দোকানে বসে একটু দইয়ের লস্যি খাবো না? তা হলে বেঁচে থেকে লাভ কী? আহা স্পেশাল সাইজের ভাঁড়ের ওপর মালাই ভাসবে!"

ব্যান্ডোদার কথা শুনে সর্বদমন মুখচেপে হাসলেন। বললেন, "প্রাচীন ভারতে ওই মালাইকে বলা হতো দধিকুর্চি!"

ব্যান্ডোদার দুঃখ : "ভয় শুধু ফ্যাট নামক বস্তুর! সায়েবরা যে কীসব আবিষ্কার করে চলেছে—কোলেস্টরল এটসেটরা।"

"সায়েবরা যখন গাছে চড়ছে তখন এই স্নেহসমস্যার সমাধান করে ভারতীয়রা অসারদধি বা স্কিম্‌ড্ দধির উদ্ভাবন করেছেন। শুনুন আরও কয়েকটা জনপ্রিয় আইটেমের নাম—অম্লরসের ইতিহাসে এরা অমর হয়ে আছে। তক্র অথবা ঘোল—উদররোগে, অরুচিতে এবং স্নেহজাত ব্যাপারে এর তুলনা নেই। আর একটি ঘোলের নাম রসলা বা মর্জিকা। তিন ভাগ দইয়ের সঙ্গে একভাগ শর্করা ও সেই সঙ্গে শুকনো আদা এবং সৈন্ধব লবণ। দেবভোগ্য পানীয়। আর এক আইটেমের নাম সত্তক—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গল্পে যেন এর উল্লেখ দেখেছি। দইয়ের সঙ্গে লবঙ্গ, ডালিম এবং কর্পূর মিশিয়ে এই জনপ্রিয় পানীয় প্রস্তুত হতো। রাজা সোমেশ্বর যে রান্নার প্রামাণ্য বই লিখেছিলেন তা তো আজকালকার ইন্ডিয়ানরা ভুলে গিয়েছে—তারা বিবিসির মেমসাহেবদের কাছ থেকে ভারতীয় রান্না শিখছে! সোমেশ্বর এক হজমী পানীয়র রেসিপি রেখে গিয়েছেন, এর নাম প্রতিপাল। দুধ ফুটিয়ে তার মধ্যে ফলের রস ছেড়ে দাও, তারপর ছেঁকে নিয়ে শর্করা এবং এলাচ মেশাও, আবার ছাঁকো। এবার এতে ছড়িয়ে দাও বালিতে ভাজা তেঁতুলবিচির গুঁড়ো। সাউথ ইন্ডিয়ান রাজা তো! সশরীরে স্বর্গে যাবার সুযোগ পেলে সঙ্গে অবশ্যই তেঁতুল নিয়ে যাবেন! এই রাজা সোমেশ্বরই বোধ হয় প্রথম পুরনো দই দিয়ে ছানা

কাটানোর উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। যদিও ছানা ব্যাপারটা এদেশে বিকশিত হলো জার্মান ও ডাচ রাঁধুনিদের সাধনায়।"

ব্যান্ডোদা স্বীকার করলেন, দুধের এই সহস্রনাম সম্বন্ধে সায়েবরা এখনও একখানা বই লিখতে সফল হননি। তাঁদের মন খারাপ, আইসক্রিম আবিষ্কারের ক্রেডিটও চীনারা কেড়ে নিতে চলেছে।

সর্বদমন বললেন, দুগ্ধজাত দ্রব্যের হাজার হাজার বর্ণনা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। মোদ্দা কথাটা হলো, দুধ মেরে ক্ষীর হয়। দুধ মন্থন করলে নবনী পাওয়া যায়, আর দুধকে অম্লসিক্ত করলে দধি ও ঘোল পাওয়া যায়।

ব্যান্ডোদা এরপর অধৈর্য হয়ে উঠলেন। কলকাতার গোটা আষ্টেক মিষ্টির দোকানের নাম ও ঠিকানা তিনি লিখে নিলেন। তারপর আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দধিমঙ্গল অভিযানে।

"শুধু সন্দেশ-রসগোল্লা নয়, বিশ্বসভায় বাঙালির আর এক অবিস্মরণীয় দান এই মিষ্টি দই।"

সর্বদমন একটু আপত্তি জানালেন। "অম্লরসের প্রাধান্যই দধির ধর্ম। সুতরাং মিষ্টি দই অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতন!"

দক্ষিণ কলকাতায় যাদব দাসের দোকানে সাদা মিষ্টি দই আস্বাদন করতে করতে ব্যান্ডোদা বললেন, "সমন্বয়ের সাধনাতেই তো বাঙালির সাফল্য। একবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভেবে দ্যাখ। সাধনমার্গে শ্রীরামকৃষ্ণ যা করতে চেয়েছেন ভোজনমার্গে যাদবচন্দ্র তাই করবার স্বপ্ন দেখেছেন। সাধে কি আর ঠাকুর এই ময়রাকে পছন্দ করতেন! শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যে এই যাদবচন্দ্রকে পাবেন যদু ময়রা হিসেবে।"

গাঙ্গুরাম, অমৃতম, দ্বারিক কোনও দোকানেই আমরা একশো গ্রামের বেশি দইয়ের অর্ডার দিচ্ছি না। শোফারচালিত মার্সেডিজ গাড়িতে দধি-মঙ্গলের চরিত্র হিসেবে আমরা কলকাতা চষে বেড়াচ্ছি। সায়েবরা হলে হয়তো এই অভিযানের নাম দিতেন—কার্ড ক্যালকাটা।

ব্যান্ডোদা কয়েকটি দোকানের হালচাল দেখে একটু চিন্তিত হয়ে উঠলেন। "হ্যাঁরে, বাঙালিরা নাকি ইদানীং দই পছন্দ করছে না? বিয়ে

বাড়িতে দই ঢুকছে না? তোদের কি মাথা খারাপ হলো?"

"মধুর রস ও অম্লরস দুই থেকেই আমরা সরে আসতে আগ্রহী হয়ে উঠছি, আমাদের মন এখন ভুজিয়া এবং ফাস্টফুডের দিকে।"

"হে ঈশ্বর, এরা জানে না এরা কি হারাতে চলেছে! এদের সুমতি দাও।" চোখ বন্ধ করে, করজোড়ে প্রার্থনা করলেন ব্যান্ডোদা।

দই আস্বাদন করতে করতে আমরা উত্তর কলকাতা চষে ফেলেছি, তারপর আবার ভায়া মানিকতলা ফিরে এসেছি জগুবাজারে বলরাম মল্লিকের সুবিখ্যাত দোকানে। গোপনসূত্রে ব্যান্ডোদা খবর পেয়েছেন এখানে ভাপাদই পাওয়া যায়। বলরাম মল্লিক ভাপাদই সরবরাহ করেন, কিন্তু অগ্রিম অর্ডারের ভিত্তিতে।

ব্যান্ডোদা অর্ডার প্লেস করলেন। তারপর বললেন, দুগ্ধপণ্য প্রস্তুতকারকদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ডবিক্রমে প্রচারের প্রয়োজন অনন্য এই দধির পক্ষে। কেকের দোকান খুলে সময় নষ্ট না করে এখানকার পাঁচতারা হোটেলগুলোর উচিত স্পেশাল দধিকেন্দ্র খোলা, যেখানে অন্তত দেড়শো রকমের দধিপণ্য একই কাউন্টার থেকে বিক্রি হবে। কলকাতা দইতে ক্লান্ত হয়ে উঠছে, আর ফ্রান্সের বিখ্যাত দইওয়ালা দানোনে সারাবিশ্ব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এই দানোনে ময়রা এদেশের ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানির অংশীদার হয়েছে, কোনদিন ইউরোপের ইয়োগার্ট ইন্ডিয়া জয় করবে।

ফেরার পথে আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। "ব্যান্ডোদা, আমার সন্দেহ হচ্ছে ইউরোপের ইয়োগার্ট কোনওসময়ে এদেশ থেকেই রপ্তানি হয়েছিল।"

আমার বিস্তারিত বক্তব্য শুনে লফিয়ে উঠলেন ব্যান্ডোদা। বললেন, "অম্লরস সম্বন্ধে যেসব তথ্য আমার সংগ্রহ করেছি তাতে এখনকার মতন কাজ চলে যাবে। তুই ও সর্বদমন অন্যসব কাজকর্ম ছেড়ে, গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করে দে, ইন্ডিয়ান ইয়োগা (অর্থাৎ যোগ) এবং আর্ট কিংবা হার্ট মিলেই পশ্চিমের ইয়োগার্ট সৃষ্টি হয়েছে।"

ব্যান্ডোদার শেষ কথা, "কুঁড়েমি ত্যাগ করে, আদাজল খেয়ে লেগে যা, যাতে একদিন স্টকহোমে গিয়ে নোবেল প্রাইজটা তুলে নিয়ে আসতে পারিস।"

নিম নিসিন্দে যেথা

"কোনওদিন মদ্যপান করেছিস?" সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন ব্যান্ডোদা।

পুরনো দিনের ঘটনাটা স্বীকার করলাম। স্থান ক্যালকাটা ক্লাব। কাল : ১৯৫২। পাত্র : কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার নোয়েল ফ্রেডরিক বারওয়েল মহোদয়, যাঁর স্নেহপ্রশ্রয়ে এই অধমের সাহিত্যযাত্রার শুরু। বারওয়েল সায়েব ক্লাবের পূর্বদিকে একতলায় যে সুইটে বসবাস করতেন সেইখানে আমিও অনেক সময় কাটাতাম কাজ উপলক্ষে। সায়েব আগেই নোটিশ দিয়ে রেখেছিলেন, আজ অ্যাডভেঞ্চার হবে। শনিবার দুপুরে মধ্যাহ্নভোজের পূর্বে অ্যাডভেঞ্চার শুরু হলো। সায়েব আমাকে বীয়র সেবনের দীক্ষাদানে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। বেয়ারা দুটি বিরাট আকারের ট্যাংকার্ড আমাদের সামনে রাখলো। তারপর নানা প্রক্রিয়ায় বারওয়েল সায়েব ট্যাংকার্ডে বীয়র ঢাললেন। আনুষ্ঠানিকভাবে দুটি কাচের আধারে ঠোকাঠুকি হলো, তারপর ঐ পানীয় মুখে ঠেকিয়ে আমার গা বমিবমি করে উঠলো।

সায়েব উপদেশ দিলেন, ধৈর্য ধরে সেবন করো, প্রাথমিক বাধা কেটে যাবে। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টাতেও আমি ঐ তিক্তপানীয় গলাধঃকরণে সফল হলাম না। তখন সায়েব আইসক্রিম সোডা আনালেন এবং সেই মিষ্টি জলের অনেকখানি বীয়রে মিশ্রিত করলেন। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য সেই বীয়রও গলা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইলো না। এরপরে আর কখনও মদ্যপানে উৎসাহ হয়নি। নৈতিক কোনও কারণে নয়, স্রেফ স্বাদকুঁড়ির অসহযোগিতায়।

ব্যান্ডোদা হেসে ফেললেন। তাঁরও একই অবস্থা। বীয়রের বোতল নিয়ে

বন্ধুদের সঙ্গে বসেছেন, অভিজ্ঞজনরা সাহস জুগিয়েছেন, ওরে গলায় ঢাল, এখনই তেতো ঘুচে যাবে, তখন দুঃখ করবি এতোদিন কেন এ রসে বঞ্চিত থেকেছি। "কিন্তু তেতো ঘোচেনি," স্বীকার করলেন সহজভাবে আমাদের ব্যান্ডোদা।

সেই ব্যান্ডোদা এখন তিক্তরসের উৎস ও পরিণতি সম্বন্ধে সিরিয়াসলি অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এর আগের বারে তো কড়াপাকের শুকনো রসগোল্লা অর্থাৎ দানাদার সম্বন্ধে রিসার্চ করতে জনাইতে গেলেন। তারপর রসগোল্লার চাটনির খোঁজ পেয়ে ব্যান্ডোদা সোজা কাঁথির রাজবাড়িতে হাজির হলেন। ওখানেই তিনি খবর পেলেন, মালপোয়া শুধু বৈষ্ণব মহলে নয়, খোদ জোড়াসাঁকোতেও বিপুলভাবে সমাদৃত হতো। রবীন্দ্রতনয়া মীরাদেবী পর্যন্ত এই মালপোয়া রচনায় সুদক্ষা ছিলেন। পুরো দু'দিন এরপর চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটে খবরাখবর নিয়েছিলেন ব্যান্ডোদা, কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃতের কোথাও মালপোয়ার উল্লেখ না পেয়ে হতাশ হলেন। ওঁর মন্তব্য : মালপোয়া কোনওক্রমেই বাঙালিদের অবদান নয়, এটি খুব সম্ভবত আমদানী হয়েছে বৃন্দাবন থেকে।

সেবারে ব্যান্ডোদা জিজ্ঞেস করলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের ফেভারিট আইটেম কী কী?"

উত্তর : "জিলিপি ও সন্দেশ।"

"২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪ সালে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন। সমাধি ভঙ্গ কালে তিনি কী বলেছিলেন?"

"আমি জিলিপি খাবো!" ব্যান্ডোদাকে মনে রাখতে হবে এই অধম পুরো সাতবছর বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে পড়েছে এবং প্রায় একবছর ওখানে মাস্টারি করেছে।

ব্যান্ডোদা সেবারই আমাকে ডিকটেশন দিয়েছিলেন, "ধর্মান্তরিত হলেও খাদ্যান্তরিত হওয়া যায় না। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর ভক্তিতে খিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। একবার অমৃতবাজার পত্রিকার মতিলাল ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, তিনি জানতে চাইলেন, বাগবাজারের ভোলা ময়রা বেঁচে আছে কি না। তা হলে ওঁর দোকান থেকে

আমার জন্যে কিছু সন্দেশ নিয়ে আসবেন।"

ব্যান্ডোদা আরও সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভালবাসতেন গরম সন্দেশ, আর রবীন্দ্রনাথের প্রিয় জ্যোতিদাদা ভালবাসতেন কেষ্টনগরের গঙ্গাজলী সন্দেশ। ব্যান্ডোদার রিসার্চ অনুযায়ী, বাংলা ১২৩০ সনে এদেশে একমণ সন্দেশের দাম ছিল ১৫, রসকরার মণ তখন ৯, ইংরিজি ১৮৫৩ সালে সন্দেশের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ১৬।

"অমূল্য সব তথ্য। লিখে রাখ। কলকাতায় যদি কোনওদিন ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন খুব কাজে লাগবে এই সব পরিসংখ্যান।"

চৈতন্যচরিতামৃত স্টাডির সময় ব্যান্ডোদা আরও আবিষ্কার করেছিলেন, ওই বইতে জিলিপির কোনও উল্লেখ নেই, অথচ অমৃতির খোঁজখবর ভালই পাওয়া যাচ্ছে।

মিষ্টি নিয়ে কুইজ কমপিটিশনের কথা ভেবেছেন ব্যান্ডোদা। কে সি দাস অথবা নকুড় এই প্রতিযোগিতা স্পনসর করতে পারেন। কঠিন সব প্রশ্নোত্তর সেবার ব্যান্ডোদার মাথায় এসে গিয়েছিল। যেমন : ছানার গজা ও ছানার মুড়কির তফাৎ কী? উত্তর : মুড়কির ছানা মাখতে হয় না, জাঁক দেওয়া ছানা ডুমোডুমো করে কাটতে হয়!

দ্বিতীয় কুইজ : মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সন্দেশের সম্পর্ক কি? উত্তর : অতি নিকট সম্পর্ক, কারণ কাঁচাগোল্লা নিয়ে কট্টর গান্ধীবাদীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। গান্ধীর প্রিয় চেলা সতীশ দাশগুপ্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাখনতোলা দুধ থেকে কমদামের কাঁচাগোল্লা বানিয়ে কলেজ স্ট্রিটের খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে বিক্রি করিয়েছেন। সেই দুর্মূল্যের বাজারেও দাম ছিল আট আনা সের!

তৃতীয় কুইজ : দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে কত সন্দেশ কেনা হয়েছিল? উত্তর : পাঁচশো মণ। তারিখ ১৮৫৫ সালের ৪ঠা জুন।

চতুর্থ কুইজ : মিষ্টান্নে প্রথম সরকারি রেজিস্টার্ড আইটেমের নাম কী? উত্তর : ভীম নাগের আশুভোগ, প্রেরণাদাতা স্বয়ং বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়!

পঞ্চম কুইজ : লেডিকেনি ছাড়া আর কোন্ রাজপুরুষের নামে মিষ্টান্ন তৈরি হয়েছিল? উত্তর : লর্ড রিপন সন্দেশ। দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন জনপ্রিয় হয়নি। লেডিকেনির কিন্তু এখনও রমরমা!

ষষ্ঠ কুইজ : কার সন্দেশ খেতে খেতে জনৈক সাহিত্যিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বলেছিলেন, মরতে যদি হয় তা হলে এই সন্দেশ মুখে দিয়ে মরাই শ্রেয়। উত্তর : নকুড়চন্দ্র নন্দীর কড়াপাক গুলি সন্দেশ!

ব্যান্ডোদা বহুদিন বাদে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছেন। শুধু মধুর রসে নিমগ্ন থাকলে রসের ব্যালান্স ঘটবে না। একসময় তিক্ততার ভয়ে বীয়র সেবন বন্ধ রাখলেও তিক্তরসের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা ব্যান্ডোদা বুঝতে পারছেন।

ব্যান্ডোদা এবার ওবেরয় গ্রান্ডে উঠেছেন। যা খাবরাখবর পেয়েছেন, তাতে তেতোর ব্যাপারেও ইন্ডিয়া অনেক এগিয়ে রয়েছে। ছোটবেলায় মায়ের হাতে রান্না যে নিমবেগুন ব্যান্ডোদা খেয়েছিলেন তা এখনও মুখে লেগে রয়েছে।

ওবেরয় গ্রান্ডে কে আর ব্যান্ডোদাকে সুখাসনে বসিয়ে নিমবেগুন বা সুক্তো রেঁধে খাওয়াবে?

ব্যান্ডোদা বললেন, "যেভাবে দিনকাল পাল্টাচ্ছে তাতে একদিন নিমঝোল নিয়েও বিদেশে মাতামাতি হতে পারে বিভিন্ন ফাইভস্টার হোটেলের মধ্যে।"

তারপর কুইজ বক্স খুললেন ব্যান্ডোদা। "কোন ফলের মধ্যে প্রায় সবরকম রসের মহাসমারোহ ঘটেছে?"

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। তখন ব্যান্ডোদা সাহায্য করলেন, "রসুন অর্থাৎ রস উন—রসুনে মাত্র একটি রসের (তিক্ত) অভাব।"

ফিজিওলজি বলছে, তিতোর স্বাদকুঁড়ি জিভের পিছন দিকে রয়েছে। তবু কেন যে তেতো গলাধঃকরণ এতো কঠিন কাজ তা অনুসন্ধানের বিষয়।

ব্যান্ডোদা দুঃখ করলেন, "কলকাতার কোনও নামী রেস্তোরাঁ কয়েকটা তিতো পদ রেঁধে দিতে সাহস পেলো না।"

শেষপর্যন্ত সাহস করে আমার গৃহিণী রাজি হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা,

বিদেশে থাকলে মানুষের হাজার রকম বদখেয়াল জন্মায়।

গৃহিণীকে বললাম, "বদ খেয়াল নয়, খেয়াল। তিক্ত রসকে বাদ দিলে আমাদের এই পাঁচ বছরের রস-অভিযান অপূর্ণ থেকে যাবে। প্রচণ্ড ব্যস্ত লোক ব্যান্ডোদা, তাঁর সময়ের মূল্যও অনেক, তবু রসের নেশা লেগে গিয়েছে—ষড়রসের উৎস সন্ধান করতে মাঝে মাঝে তিনি বিদেশ থেকে ছুটি নিয়ে চলে আসেন।"

অতএব পুরো এক সপ্তাহ ধরে স্থানে-অস্থানে নানারকম তিক্ত শাক-সবজির সন্ধান, একবার কিছু নটেশাক সংগ্রহ হলো। কবিরাজ শিবকালী ভট্টাচার্য বেঁচে থাকলে গৃহিণীকে অবশ্যই এতো কষ্ট পেতে হতো না। তাঁর স্নেহধন্যা বন্দনার জন্য তিনি বনবাদাড় থেকে দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া সংগ্রহ করে দিতেন। একবার তিনি আমাদের হাওড়ার বাড়িতে নটে শাকের গল্প শুরু করেছিলেন। এই নটে আহার্যও বটে ভেষজও বটে। কতোরকমের নটে পাওয়া যায় তা হিসেব করতে গেলে মাথা ঘুরে যায়—সাদা নটে, লাল নটে, টুনটুনি নটে, চির নটে, ঘেন্টি নটে, বাঁশপাতা নটে, গোবরা নটে, বন নটে, চাঁপা নটে।

"শুধু নেই কথানটে, বুঝলে মালক্ষ্মী," বলতেন শিবকালী। "ওই যে তোমার লেখকস্বামীর কথা ফুরোলে যে নটেগাছটি মুড়োয়, ওটা গল্পলেখকদের কল্পনা।"

এবার আমার বন্ডেল রোড বাসভবনেই ব্যান্ডোদার পদধূলি পড়েছে। সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক সর্বদমন রায়। আগাম নোটিশ পেয়ে তৈরি হয়ে এসেছেন তিনি। শুধু দুশ্চিন্তা আমার গৃহিণীর—সে কয়েক রকমের ভাজা, সেদ্ধ, শুকতো ও ভাতের ব্যবস্থা করেছে ব্যান্ডোদার লিখিত নির্দেশমতন। যদি রস বিপর্যয় ঘটে এই আশঙ্কায় গোপনে দু'একটি বাড়তি পদ রেঁধে সে ফ্রিজযন্ত্রে তুলে রেখেছে। ব্যান্ডোদা বই লিখছেন লিখুন, কিন্তু তিক্তরসের ওপর স্পেশাল নজর না দিলেই তাঁর রিসার্চ আরও জনপ্রিয় হতো।

বাড়িতে ঢুকেই ব্যান্ডোদা ঘোষণা বললেন, "খবর পেলাম, স্বয়ং কবি-গুরু একসময় বিপুল পরিমাণে নিমপাতা বাটা সাগ্রহে সেবন করতেন। সেই

নিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমে অনেক হাসাহাসি হয়েছে।"

গৃহিণী কিছুতেই বিশিষ্ট অতিথিদের নিমপাতা বাটা পরিবেশন করতে রাজি হননি। তার বদলে বন্দনা পরিবেশন করলেন পলতা পকোড়া। খুব খুশি হলেন ব্যান্ডোদা, তিরিশবছর আগে পিসিমা উত্তরপাড়ার বাড়িতে প্রাণ ভরে পলতা বড়া খাইয়েছিলেন ব্যান্ডোদাকে।

ব্যান্ডোদা বললেন, "প্যারিসে যদি পলতাবড়ার রেস্তোরাঁ খোলা যায় তা হলে কোটিপতি হতে মাত্র দেড়বছর লাগবে।"

"এখন প্রশ্ন, তিক্তরস কাকে বলে?"

ব্যান্ডোদার প্রশ্নে সর্বদমন রায় মোটেই ঘাবড়ালেন না। "চরকসংহিতা পড়া থাকলে রস ও রসনা সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই কঠিন মনে হবে না। ওখানে সোজা সংস্কৃতে বলা হচ্ছে, রসনা সংলগ্ন হওয়া মাত্র যে রস জিহ্বার রসবোধ শক্তি ধ্বংস করে এবং কিছুতেই আর রুচি থাকে না, তাকে তিক্তরস বলে।"

"বাবার জন্মে কোনও সায়েব বিটার টেস্টের এমন ডেফিনিশন দিতে পারবে না," তারিফ করলেন ব্যান্ডোদা।

সর্বদমন বললেন, "এটা সত্য যে প্রথম ধাক্কায় তিক্তরসে অরুচি হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত তিক্তরস অরুচিনাশক। এই রস শীতল ও লঘু—তৃষ্ণা প্রশমনকারী, জ্বরনাশক, জঠরাগ্নির উদ্দীপক এবং ক্লেদ ও মেদ উপশোষণ করে। জেনে রাখুন তিক্তরস অবশ্যই দেহকে কৃশ করে— অন্তত চরকের তাই ধারণা ছিল। অথচ সমস্ত রসের মধ্যে তিক্ত রসই সর্বাপেক্ষা লঘু।"

ব্যান্ডোদার মন্তব্য, "নিমপাতার জয়গানে সনাতন ভারত ছিল মুখরিত, এবার সারা বিশ্বের নজর ঐদিকে। নিমের নানা গুণ থেকে নানা পেটেন্টের আবেদন আসতে শুরু করেছে।"

সর্বদমন বললেন, "বসন্তকালে ভ্রমণ অথবা নিম্বভোজনম্। অথবা যুবতীভার্যা অথবা বহ্নিসেবনম্। মধুর ও অম্লরসের অত্যধিক সেবনে শরীরে যে রসধাতুর আধিক্য হয় তার প্রতিষেধক হলো এই তিক্তরস। তিক্তরসের শ্রেষ্ঠ আলয় এই নিম। অরুচিতে গ্রামের লোকরা এখনও সুজির হালুয়ার সঙ্গে নিমপাতা চূর্ণ সেবন করেন।"

আমি বললাম, "শ্মশানে দাহকার্য সেরে ফেরার পরে বাঙালিরা নিমের পাতা দাঁতে কাটে।"

সর্বদমন বললেন, "নিমকে কিন্তু অপয়া ভাববেন না। রাজস্থানের আচার-বিচার আমাদের ঠিক উল্টো। মাড়ওয়ারিদের বিয়েতে নিমের ডালকে বরানুগমন করতে হয়। স্বয়ং বর এটি ধরে রাখেন।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "বিবাহবাসর থেকে শ্মশান যে নিমের গতি সর্বত্র তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।"

আমার মনে এলো হিঞ্চেশাকের কথা। গৃহিণী অতিথিসেবার জন্য এই হিঞ্চেশাকও সংগ্রহ করেছেন অতি যত্নে।

"হিঞ্চে কি তিক্ত রসাশ্রিত!"

সর্বদমন ব্যাখ্যা করলেন, "তিক্তরসের প্রাধান্য, তবে তার অনুসঙ্গী ষষ্ঠ রস কষায়! কেউ কেউ আদর করে ডাকেন হিলমোচিকা। তিক্ত বলতে পারেন চিরতাকে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে বার করেছিলেন নানা রোগহর এসেন্স অফ চিরতা। এর আদিনাম ছিল কিরাততিক্তা। বৌদ্ধযুগে লোকমুখে কিরাত হয়ে গেলো চিরাত।"

"মানুষের মুখে মুখে শব্দগুলো অদ্ভুতভাবে পাল্টে যায়—ব্যাকরণ, অভিধান, পণ্ডিতমশাই কেউ এই পরিবর্তন আটকে রাখতে পারে না," বিস্ময়প্রকাশ করলেন ব্যান্ডোদা।

তিক্তরসের বিস্তারিত তালিকা চাইছেন ব্যান্ডোদা। আমি মাথা ঘামিয়ে বললাম, "আমাদের চৌধুরীবাগানে নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের বাড়িতে কালমেঘের গাছ ছিল। কতবার গৃহস্বামীর অনুমতি নিয়ে পাতা ছিঁড়ে এনেছি। আর মনে পড়ে নালতে শাকের কথা।"

সর্বদমন জানালেন, "কালমেঘ তিক্ত, জ্বরঘ্ন ও বলকারক। সংস্কৃতে এর নাম যবতিক্তা অথবা কল্পনাথ! তিক্ত নালতে শাকেরও বহুগুণ—স্নিগ্ধকারক, ক্ষুধাবর্ধক ও বিরেচক!"

ব্যান্ডোদা বললেন, "আমার পিসিমা ছড়া কাটতেন—ভাজে উচ্ছে বলে পটোল।"

"কোনও পরিবারকে অপছন্দ হলে বৃদ্ধরা বলতেন, এ যেন উচ্ছের

ঝাড়—অর্থাৎ এই বংশের মূল তিতো, পাতা তিতো এবং ফলও তিতো।"

সর্বদমন বললেন, "উচ্ছের পোশাকী নাম কটিল্লক এবং করলার কারবেল্লক।"

"কেরালা থেকে এসেছিল নাকি?" জানতে চান ব্যান্ডোদা।

"মনে হয় না," মন্তব্য করলেন সর্বদমন। "শব্দটির অর্থ যেটি নিশ্চিতরূপে লতিয়ে লতিয়ে যায়।"

এবার মজার কথা বললেন সর্বদমন, তাঁর উদ্ধৃতি শিবকালী গবেষণা থেকে। "অনেক ফল অপরিণত বয়সে যে রস আশ্রিত হয়ে থাকে, পরিণত বয়সে সে পাল্টে যায়, যেমন আম ও কলা।"

"মানুষও তাই। কমবয়সে একটু টক রস থাকে, পরে বয়সের গুণে মিষ্টি হয়ে যায়!"

"ব্যান্ডোদা, তিক্তরসের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন অদল-বদল নেই। আপনি নিম নিসিন্দে উচ্ছে, এমনকি গুলঞ্চ, ছাতিম, কালকাসুন্দের হিস্ট্রি খুঁটিয়ে দেখুন।"

সর্বদমন আরও যোগ করলেন, "শিবকালী ভট্টাচার্য ছড়া কাটতেন—নিম নিসিন্দে যেথা, রোগ কি থাকে সেথা?"

"হ্যাঁরে, আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই বিষয়ে নীরব কেন?" আমাকে উস্কে দিলেন ব্যান্ডোদা।

আমি অগতির গতি উদ্বোধন অফিসে মাননীয় সম্পাদকমশাইকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম।

"শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় কি বলে গিয়েছেন তার একটি বিষয়ভিত্তিক অভিধান প্রয়োজন।" স্বামী পূর্ণানন্দ অবশ্য নিজেই একটি অভিধান। তিনি বললেন, "বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে 'প্রহ্লাদ' নাটক দেখতে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। তখন ঠাকুর বলেছিলেন, জীবের অহংকার আছে বলে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। তবে বালকের আমিত্বে দোষ নেই, বরং উপকার আছে। শাক খেলে অসুখ হয়, কিন্তু হিঞ্চেশাক খেলে উপকার হয়। হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। যেমন মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়!"

নোট বই বার করে ব্যান্ডোদা বললেন, "নেবু বেশি নিংড়োলে তেতো হয়, কথাটার মানে কী?"

সর্বদমন বললেন, "অতিব্যবহারে দ্রব্য অনেকসময় স্বধর্মচ্যুত হয়।"

তিক্তরস সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হলো।

ষষ্ঠরস

"এবার যে রসের কথা আমরা তেমন শুনি না সেই কষায় রস সম্বন্ধে একটু খোঁজ নেওয়া যাক। অনেকে তিক্ত রস ও কষায় রসের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না।"

সোজাসুজি কবিরাজী ব্যাখ্যা শুনিয়ে দিলেন সর্বদমন। "দুটি রস অবশ্যই আলাদা, সায়েবরা স্বীকার করুন চাই না করুন। চরক বলছেন, যে রসদ্বারা রসনার বিষমতা, স্তব্ধতা ও জড়তা জন্মায়, যে রস কণ্ঠস্থানে বদ্ধতা উৎপন্ন করে তারই নাম কষায়। যতো রুক্ষগুণ সম্পন্ন রস আছে কষায় রস রুক্ষতম। কষায় রস শীতল এবং গুরু। ত্রিদোষ শান্তিকারক, রক্তপিত্ত প্রশমনকারক। কিন্তু অতিমাত্রায় ব্যবহারে মুখ শুকিয়ে যায়।"

কষায় রসের নমুনা খুঁজছেন ব্যাণ্ডোদা। সর্বদমন বললেন, "হরতুকি। সবরকম কবিরাজী ওযুধে এই হরিতুকির সন্ধান পাবেন। কবিরাজদের কাছে শুনবেন, পাঁচশো রকমের কষায় দ্রব্য আছে। এদের পাঁচটি শ্রেণীভেদ— মধুরকষায়, অম্লকষায়, তিক্তকষায় এবং কষায়কষায়।'

ব্যাণ্ডোদা বললেন, "ডুমুর, কাঁচাকলা, হরতুকি এসব বিষয়ে আমরাও কিছু জানি না, সায়েবরাও জানে না। আসলে ইণ্ডিয়ানরা মধুর, লবণ ও কটুরসের পিছনে যেভাবে ছুটেছে সে তুলনায় অবহেলিত হয়েছে এই কষায় রস।"

সর্বদমন রায় কানে কানে বললেন, "কষায় রসের সবচেয়ে প্রিয় নমুনা আমাদের চা। চা সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নিন, ব্যাণ্ডোবাবু খুব খুশি হবেন।"

আমি বললাম, "এসম্বন্ধে খোঁজখবর করবো, পরের বার যখন পায়ের ধুলো দেবেন তখন কোনও পয়েন্ট জানতে আপনার অসুবিধা হবে না।"

'মোদো' মাতাল বনাম 'চেয়ো' মাতাল

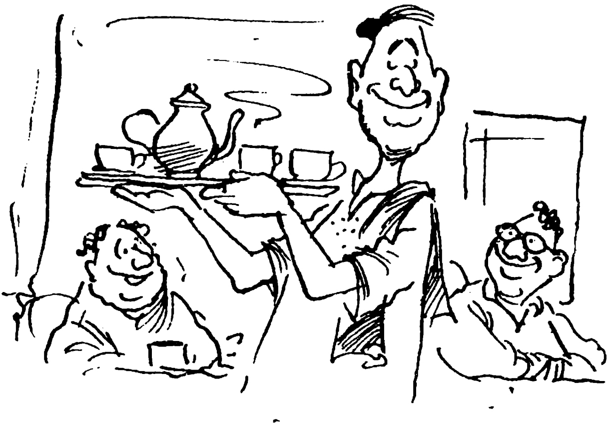

কষায় রস প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ব্যান্ডোদা আমাকে চায়ের ওপর কিছু তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন। মার্কিন মুলুক থেকে এক বিশেষ বার্তায় তিনি বলেছেন, "জীবনে তো পরিশ্রম কাকে বলে জানলি না। এবার একটু নড়ে চড়ে বোস।"

এই ধাক্কায় কাজ হয়েছে। নিচের লেখাটি তারই ফলশ্রুতি। কয়েকদিন উপাদান সংগ্রহ করে কুরিয়র মারফত খোদ আমেরিকায় ব্যান্ডোদাকে লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এখন পর্যন্ত এদেশে দু'রকম মাতালের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে—'মোদো' মাতাল এবং 'চেয়ো' মাতাল। 'চেয়ো শব্দটি আমার কল্পনাপ্রসূত নয়। এর স্রষ্টা বঙ্গরঙ্গমঞ্চের রাজাধিরাজ মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়।

গিরিশের গুরু পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে দু'রকম মাতালের খপ্পরেই পড়েছিলেন এবং দু'-পক্ষকেই তাঁর উদার স্নেহপ্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

মোদোমাতাল ভক্তপ্রবর সুরেন্দ্রনাথকে তিনি বলেছিলেন, "ও সুরেন্দর!

খাবি খা, বারণ করিনে, তবে পা না টলে, আর জগদম্বার পাদপদ্ম হতে মন না টলে।”

‘চেয়ো’ মাতালদের তিনি কী কী নির্দেশ দিয়েছিলেন তা আজও প্রকাশিত হয়নি; তবে তাঁরা যে বেশি প্রশ্রয় পেয়েছেন তার প্রমাণ এই, যে ত্যাগী সন্তানটির ওপর সব দায়দায়িত্ব অর্পণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ অকালে দেহরক্ষা করলেন সেই নরেন তো চা বলতে অজ্ঞান।

কামিনী-কাঞ্চনকে সাধনপথ থেকে অনায়াসে দূরে সরালেও, চায়ে আসক্ত না হওয়ার কোনও ফতোয়া বিবেকানন্দ জারি করেননি; বরং গুরুভাইদের অনেককে নিজের হাতে ‘চেয়ো’ মাতাল হিসেবে তৈরি করেছেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত অথবা স্বামী বিবেকানন্দ। সোজা কথায়, মোক্ষের সন্ধানে সংসার ত্যাগ করে পথে বেরিয়েছেন বলে গল্পবাজ আড্ডাবাজ রসিক মানুষটি চায়ের অমৃতসুধা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন কেন?

কষায় রসের প্রতীক চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে যারা আশপাশের মানুষকে ভালবাসতে পারলো না, মন খুলে পরিচিত জনদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারলো না, তারা আবার কী করে জগৎ উদ্ধার করবে?

মহামানবদের চা-প্রীতি সম্পর্কে কিছু কথা এই নিবন্ধে উঠবেই, কিন্তু তার আগে স্বীকার করে নিই, আমি বর্তমানে একজন নির্লজ্জ ‘চেয়ো’ মাতাল হলেও, বাল্যকালে এই দোষ থেকে মুক্ত ছিলাম।

হাওড়া চৌধুরীবাগানে যে-বাড়িতে শৈশবে আমরা উঠে এসেছিলাম তার ঠিক পাশেই থাকতেন আমাদের বাদলকাকু। প্রচণ্ড সায়েবভক্ত মানুষ কিন্তু চায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সন্দিহান।

বাদলকাকুর স্থির ধারণা, চা পান করলে মেধা নষ্ট হয়ে যায়, অকালবার্ধক্য আসে, সুনিদ্রায় গুরুতর বিঘ্ন ঘটে এবং হজমশক্তি চিরতরে নষ্ট হয়—অতএব, চা-পান না বিষপান? বাদলকাকু গড়ের মাঠে আমাদের মোহনবাগানের খেলা দেখতে নিয়ে যেতেন, প্রায় প্রতিদিন বাড়িতে দই-চিঁড়ে খাওয়াতেন, ডজন ডজন লজেন্স উপহার দিতেন, পরিবর্তে রফা করতে হয়েছিল তাঁর চা-বিরোধী লবিতে যোগ দিয়ে।

যথাসময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তীব্রতা বাড়লো, ইভাকুয়েশন বলে একটি

ইংরিজি শব্দ বাংলাভাষায় অতি সহজে ঢুকে গেলো, 'ব্ল্যাকআউট' নামক আর একটি ম্লেচ্ছ শব্দের হাত ধরে।

সেই সময় জাপানিদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমরা সপরিবারে জন্মভূমি বনগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। এই বনগ্রাম বাজারে সেই সময় আমার নিত্য যাতায়াত এবং সেখানেই বিনামূল্যে বিতরিত তিনটি জিনিসের স্বাদ গ্রহণের প্রথম সুযোগ পাওয়া যায়। বনগাঁ হাটে প্রবেশের মুখে একজন খ্রিস্টান পাদ্রী একটা কাঠের বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে প্রভু যীশুর জীবন ও বাণী প্রচার করতেন বাংলা ভাষায় এবং মাঝে মাঝে বক্তৃতা থামিয়ে উৎসাহী শ্রোতাদের হাতে তুলে দিতেন একখানি মথি লিখিত সুসমাচার, কিন্তু এর জন্যে একটি আধলাও চার্জ করতেন না।

এরপরেই ছিল হাটের মধ্যস্থলে বিনামূল্যে লুচির নমুনা আস্বাদনের সুবর্ণ সুযোগ। হোসেন কাশেম দাদা নামক এক কোম্পানির উৎসাহী প্রতিনিধিরা দালদা বনস্পতি দিয়ে ভাজা লুচি চোখের সামনে ভেজে দাবি করতেন, এর স্বাদ অতুলনীয়। বাজারে তখন প্রচণ্ড গুজব ছিল, এই 'ঘি'-তে ভাজা লুচি নিয়মিত ভোজনে নির্বংশ হওয়ার প্রচণ্ড সম্ভাবনা। বিনাপয়সায় গরম লুচি পেলে কে পরবর্তী প্রজন্মের অস্তিত্বের কথা মাথায় রাখে? অনেকেই লুচি খেয়েছি। লুচি খাবার পরে প্রচণ্ড জল তেষ্টা পায়। তখন বিষাক্ত পানীয় জল এড়িয়ে চলে যেতাম হাটের তৃতীয় প্রান্তে চা মার্কেটিং বোর্ডের বিনামূল্যের স্টলে। এইখানেই আমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে দাগ পড়লো, চায়ের অমৃত আস্বাদ জীবনে প্রথম লাভ করে, আমি ধীরে ধীরে চায়ের ভক্ত হয়ে উঠলাম, যদিও 'চেয়ো' মাতালের স্তরে অধঃপতিত হতে আরও কিছুদিন সময় লেগেছিল।

স্বীকার করে নিই, আমি একজন গল্পবাজ, আড্ডাবাজ হুজুগে বাঙালি। আড্ডা পেলে বিশ্বসংসার আমি আর কিছুই চাই না এবং আমি বিশ্বাস করি সামনে চায়ের ভাঁটি না জ্বললে জেনুইন আড্ডা তেমন জমে না।

এক হিসাবরক্ষক বন্ধু তার গণকযন্ত্রে ঝটপট হিসেব করে এই বেহিসেবি বন্ধুকে জানিয়েছিলেন, গত অর্ধশতকে বেপরোয়া জীবনযাপন করে আমি দু'লাখ কাপ চা সেবন করেছি। প্রতি পাউন্ডে দুশো কাপ চা তৈরি হয় এই

সাধারণ হিসেব মাথায় রাখলে অধমের দেহমন্দিরে অন্তত একহাজার পাউন্ড চা ইতিমধ্যেই নিবেদিত হয়েছে। মেধার অনুপস্থিতি ছাড়া আর কোনওপ্রকার ইনটেলেকচুয়াল ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ অগ্নিমান্দ্য, নিদ্রাবিভ্রাট, অকালবার্ধক্য ইত্যাদি অন্য কোনও হাঙ্গামায় আজ পর্যন্ত আমি পড়িনি। অতএব জয় হোক চায়ের। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে দিকে দিকে প্রচার হোক চায়ের, কারণ এই নিরানন্দ বঙ্গভূমিতে নির্মল আনন্দের স্বর্গীয় উৎস হিসেবে চা ছাড়া আমি আর কিছুই তো দেখতে পাই না।

জাপানি বোমা ও ইভাকুয়েশনের আশঙ্কা কাটিয়ে বনগ্রাম থেকে কলিকাতা মহানগরীতে ফিরে আসবার পরে আমার ইস্কুল পরিবর্তনের প্রয়োজন হলো। পিতৃদেবের নজর এড়িয়ে সতত সঞ্চরমান যে বালক বনগ্রামের হাটে চা-আসক্ত হয়েছে তার জন্য এবার ব্যবস্থা হলো স্বামী বিবেকানন্দর নামাঙ্কিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

শোনা গেলো এই বিদ্যালয়ে বেলুড় মঠের পূতচরিত্র সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীদের নিত্য আনাগোনা। তাছাড়াও শিক্ষক হিসেবে আছেন কিছু কট্টর বিবেকানন্দ অনুরাগী যাঁরা চান হাওড়ার ছেলেপুলেরা রাতারাতি তাদের সমস্ত চারিত্রিক দুর্বলতা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে বিবেকানন্দ-চরিত্রের ছাঁচে ঢালা হয়ে যাক। কিন্তু এতো ডিসিপ্লিন কে চায়? স্বভাবতই আমার মন খারাপ।

বনগ্রামে ছিল অবাধ স্বাধীনতা, ইস্কুলে যাওয়ার তাগিদ নেই, আড়াইটে নাগাদ হয় এ-হাটে না-হয় অন্য হাটে ঘুরে বেড়াও, প্রাণভরে বিনামূল্যে চা পান করো। সত্যিকথা বলতে কি বিবেকানন্দ ইস্কুলেও আড়াইটে বাজলেই টি বোর্ডের গরম চায়ের জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠতো। সেই সময় একদিন প্রথম আশার আলো দেখতে পেলাম। ঠিক আড়াইটার সময় টিচার্স রুম থেকে বেরিয়ে ইস্কুলের খ্যাতনামা বেয়ারা গজেন একটি কেটলি হাতে সামনের মিষ্টির দোকানে চলে যায়। গুজব প্রবল যে ওই সময় স্বয়ং হেডমাস্টার সপার্ষদ চা পান করেন।

আমার ধারণা ছিল অন্যরকম। মঠ-মিশন স্থাপন করার সময়ে নরেন্দ্রনাথ দত্ত ঠাকুরের নাম করে সবরকম ইন্দ্রিয়সুখকে নিষেধ করে

দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেবিষয়ে অনেক বেটার, তাঁর সহ্যশক্তি ঢের বেশি, তিনি মদে আপত্তি করলেও চায়ে প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছেন। দেশবিদেশের অনুরাগী ভক্তরা, বিশেষ করে চীনা ও জাপানিরা তাঁকে প্যাকেট প্যাকেট চা উপহার দেয়।

গোদের ওপর বিষফোড়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়। অমন মহাপণ্ডিত এবং প্রতিভাধর বিজ্ঞানী, কিন্তু চায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন—চা-পান, না বিষপান? আমাদের এক বন্ধুও 'চেয়ো' মাতাল, সে রাগ করে গালাগালি করতো, চা না-খেয়েও তো দাড়িওয়ালা আচার্যদেবের অমন প্যাস্তাখ্যাচা স্বাস্থ্য। পরে সেই মাতালই বিশ্বস্ত সূত্র থেকে গোপন খবর নিয়ে এসেছিল, আচার্যদেব নিজে চায়ে আসক্ত—আপনি আচরি ধর্ম অপরকে শিখাইবে তাঁর ঘোষিত নীতি নয়।

গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীদেরও দেখছি সব ব্যাপারে বোঝা শক্ত! দুনিয়ার সব সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে গাছতলায় ধুনি জ্বেলে বেদ-বেদান্ত প্রচারের জন্যেই যেন এঁদের জন্ম। সেই সময় আর এক সহপাঠী একদিন হাটে হাঁড়ি ভাঙলো। সে বললো, মঠ-মিশনে চা-পান কেন তাম্রকূট সেবনেও কোনও নিষেধ নেই। এই বন্ধুর পিতৃদেবের মঠ-অন্ত প্রাণ, তিনি সন্ন্যাসীদের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে অনেক খবরাখবর রাখেন। বহু বইতে নাকি এই অস্বস্তিকর খবর ফাঁস করে দেওয়া আছে।

এরপরেই রামকৃষ্ণ আন্দোলন সম্পর্কে পড়াশোনার আগ্রহ জন্মায় আমার। আমাদের এক সহপাঠী বন্ধু সিগারেট খাওয়া অবস্থায় হাওড়া স্টেশনে আরেক বন্ধুর কাছে ধরা পড়ে যায়। আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় সে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছে। তার বক্তব্য : আমি যে বয়সে বিড়ি টানছি তার থেকে অনেক কম বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ হুঁকো খেয়েছেন, নস্যি নিয়েছেন। অকাট্য যুক্তি! এরপর সে যে বিবেকানন্দর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেউকেটা হবে তাতে সন্দেহ কি?

বিড়ি সিগারেট খাওয়ার টান আমার কখনও হয়নি। কিন্তু আমাকে প্রবলভাবে টেনেছে এই চা। এই নিরানন্দ জীবনে চা আমাকে যে আনন্দ দিয়েছে তার কোনও তুলনা নেই।

চায়ের কোনও বিরূপ সমালোচনা আমি আজও সহ্য করতে পারি না। আর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে চায়ের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খবর কাগজে লিখে দিয়েছি। সেই সব সংবাদ ঠিকমতন ব্যাখ্যা ও পরিবেশন করতে হলে তো একটা মোটা বই-ই লিখে ফেলতে হয়। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের কিছু নমুনা বিতরণ করছি এই আশায় যে, চা-কে আমরা স্বর্গীয় পানীয়র স্ট্যাটাস দিলে অন্য কোনও পানীয়র প্রতি কোনও অন্যায় করা হবে না।

রামকৃষ্ণ আন্দোলনের কর্তাদের চা-সংক্রান্ত দুর্বলতা সম্বন্ধে যতোটা খবর পাওয়া গিয়েছে তার প্রধান সূত্র অবশ্যই একজন স্বঘোষিত 'চেয়ো' মাতাল—এঁর নাম শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম ১৮৬৮, নরেন্দ্রনাথ দত্তর দ্বিতীয় ভ্রাতা। মহেন্দ্রনাথের নিজের কথায় : 'আমরা যখন খুব শিশু তখন একরকম জিনিস শোনা গেল—চা। সেটা নিরেট কী পাতলা কখনও দেখা হয়নি। আমাদের বাড়িতে তখন আমার কাকীর প্রসব হইলে তাঁহাকে একদিন ঔষধ হিসেবে চা খাওয়ানো হইল। আমরা তখন ছোট ছেলে, ন্যাংটো। ঘিরে রইলাম। একটা কালো মিন্‌সে (কালো কেটলী) মুখে একটি নল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার ভিতর কুঁচো পাতার মতন কি দিলে, গরম জল দিলে, তারপর ঢালল। একটু দুধ চিনি দিয়ে খেলে।—তখন চীন থেকে চা আসত, ভারতবর্ষে তখন চা হয়নি।'

শেষের মন্তব্যে বোধ হয় একটু ভুল রয়েছে। কারণ, খাতায় কলমে দেখা যাচ্ছে আসামে চায়ের চাষ শুরু হয়ে গিয়েছে ১৮৩৪ সালে। এদেশে বুনো চায়ের খবরাখবর সায়েবরা দিচ্ছেন ১৮২৩ সাল থেকে। আর মহিনবাবুর জন্ম ১৮৬৮।

বিভিন্ন স্মৃতিকথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, চায়ের নেশাটি বিবেকানন্দ অতি অল্প বয়সে তাঁর বাড়ি থেকেই আয়ত্ত করেছিলেন। ওখানে চা তৈরির আলাদা ব্যবস্থা ছিল।

নেশাটা রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলে কীভাবে ছড়িয়েছিল তার ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে। স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজকে) মহেন্দ্রনাথ একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি এতো চা খেতে শিখলে কোথা থেকে?" তিনি হাসতে

হাসতে স্বীকার করলেন, "তোমার ভাইয়ের পাল্লায় পড়ে। তোমাদের বাড়িতে যে চায়ের রেওয়াজ ছিল সেইটা বরাহনগরের মঠে ঢুকিয়ে দিলে, আর আমাদের চা-খোর করে তুললে। তোমরা হচ্ছ একটা নারকটিক ফ্যামিলি!" এই বলে শরৎ মহারাজ রসিকতা করলেন।

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে বরানগর 'মিলন-মন্দির'-এর স্থান যে হিমালয় শীর্ষে তা উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের অজানা নয়। পরমহংস মহাসমাধির পর শিষ্যগণ শোকার্ত, ভবিষ্যৎ কী হবে তা কেউ জানে না। এই সময়ে সারদানন্দ বলতেন, "ওহে! শিবরাত্রির উপোস করে আমাদের চা খেতে কোনও দোষ নেই। কেন জান? যেদিন ঠাকুরের দেহত্যাগ হয় (১৮৮৬, ১৬ আগস্ট) সকলেই বিষণ্ণ, খাওয়াদাওয়া কিছুই হইল না। কেই বা উনুন জ্বালে? আর কেই বা রান্না করে। অবশেষে দরমা জ্বালিয়ে কেটলি করে জল গরম করে চা করা হলো আর ঢক্‌ঢক্‌ করে খাওয়া গেলো। অমন শোকের দেহত্যাগের দিনেও চা খেয়েছিলুম তো শিবরাত্রির সামান্য উপোস করে চা কেন খাওয়া চলবে না বলো?"

মঠ-মিশনের দ্বিতীয় সভাপতি স্বামী শিবানন্দও ছিলেন চা-প্রেমী। বরানগর মঠে অত কষ্টের মধ্যেও খাওয়া না জুটলেও চায়ের (বিনা দুধ, বিনা চিনি) ব্যবস্থা হতো। বরানগরে সকালে মাঝে মাঝে চায়ের মজলিস বসতো, যার মধ্যমণি অবশ্যই নরেন্দ্রনাথ। উপস্থিত রয়েছেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ, বাবুরাম মহারাজ। চা আনতেন স্বামী সদানন্দ ওরফে গুপ্ত মহারাজ। তারক ওরফে শিবানন্দ ওরফে মহাপুরুষ মহারাজ এবার নরেনের পাশে বসে বললেন, "আমাকে চা দাও!" তাঁর মনে খুব আনন্দ, সম্প্রতি গয়া থেকে ফিরেছেন। শিবানন্দ বললেন, "ওহে! জল দিয়ে তো তর্পণ করা যায়, এবার আমি চা দিয়ে তর্পণ করবো।" মন্ত্র শুরু করলেন, 'অনেন চায়েন'। একজন মন্তব্য করলেন, "অনয়া চায়য়া হবে, কেননা, চা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ।"

মহেন্দ্রনাথ দত্ত রসের সঙ্গে লিখেছেন, "বরানগরে ভাত জুটুক আর না জুটুক চা খাওয়াটা খুব ছিল। গুঁড়ো চা কতকটা থাকতো। আর ফৌজদারি বালাখানায় পাওয়া যেতো তলায় খুরো দেওয়া গোল চীনামাটির বাটি,

হাতল নেই, যেগুলো গরিব মুসলমানরা ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই হল চায়ের বাটি। একটা চীনামাটির চামচ বা কুশীমতন ছিল। সকালবেলা অনেক চা সিদ্ধ হত।"

১৮৮৭/১৮৮৮ সালের আর একটা চায়ের গল্প শুনুন। নায়ক নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাই কালী বেদান্তী (স্বামী অভেদানন্দ)। স্থান : রামতনু বসু লেনের বাড়ি। তিথি একাদশী। দু'জনে এর আগে কয়েকটা বাড়িতে গিয়েছেন, কেউ খেতে দেয়নি। নরেন্দ্রনাথের বাড়িতেও চরম আর্থিক দুরবস্থা, একটুও খাবার নেই। কিছুক্ষণ পরে কালী বললেন, "ভাই নরেন, শীতে যে ঘুমুতে পারছি না।" নরেন্দ্রনাথ বললেন, "দূর শালা, ঠেসাঠেসি করে শো, তাহলেই শীত কমে যাবে।" তবুও কালীর ভীষণ শীত কষ্ট। নরেন্দ্রনাথ তখন চা তৈরির মনস্থ করলেন। হুটকো গোপাল একটা টিপট, একটা বাটি ও ডিশ রেখে গেছল। নরেন হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই এবং ঘুঁটে জোগাড় করলেন, কেরোসিন ডিপে থেকে তেল নিয়ে উনুন ধরাবার চেষ্টা করলেন।...অবশেষে রাত্রি সাড়ে চারটের সময় নরেন চা আনলেন : "কিরে শালা, জেগে আছিস?" এরপর একজন বাটিতে, আর একজন ডিশে চা খেয়ে পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করলেন।

নরেনের আর এক গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ চেষ্টা করেছিলেন স্বামীজির ভাইকে চায়ের লাইন থেকে সরিয়ে দিয়ে পুরোপুরি তাম্রকূটের লাইনে নিয়ে যাওয়ার। তিনি বলতেন, "দ্যাখ, এই নরেনের এতো বুদ্ধি কেন জানিস? নরেন খুব গুডুক ফুঁকতে পারে। আরে গুডুক না টানলে কি বুদ্ধি বেরোয়? তুই ছোঁড়া চা ছেড়ে দে, চা খাসনি।"

অমন যে অমন হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) তিনিও চায়ের মহত্ত্ব অস্বীকার করেননি। একবার তিনি আসামে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এসে চায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি চাঞ্চল্যকর খবর এনেছিলেন, "আমরা যেমন ভাতের সঙ্গে ঝোল খাই, তেমন উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোথাও কোথাও চা মেখে ভাত খায়।"

ভাতের সঙ্গে চা মিশিয়ে এই পরীক্ষা করবার লোভ আমারও হয়েছে, কিন্তু জননী অথবা জায়া কেউই বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করেননি। হরি

মহারাজ ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান সাধক, তিনি কোন্ দুঃখে বানিয়ে গল্প বলতে যাবেন?

একই কথা বলা যায় স্বামী অখণ্ডানন্দ সম্পর্কে, মঠ-মিশনের ত্রাণকার্য শুরু করে যিনি ইতিহাস রচনা করে গিয়েছেন, পরে মিশনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। চায়ের বাটি সামনে রেখে তিনি তিব্বতের গল্প বলতে ভালবাসতেন। তিব্বতীরা একটা হাঁড়িতে জল দেয়, তাতে ব্রিক-টি বা জমাট করা চা খানিকটা ফেলে দেয়, তারপর শুকনো মাংসের গুঁড়ো দেয়, তারপর দেয় ছাতু। সবটা টগবগ করে ফুটলে দেয় মাখন। তারপর সেই মণ্ড সবাই পরমানন্দে আহার করে। তিব্বতীরা যেখানেই যায় হাতে একটা গরম করবার পাত্র থাকে, তার নাম 'সামাবার'। যেখানে বসবে সেখানে একটু চা তৈরি হবে।

মহিমবাবু রসিকতা করেছিলেন, "একি গোঁসাইঠাকুরের গাড়ু হাতে করে যাওয়া!" রসিক তিব্বতী চায়ের কদর বোঝে, তাই চা-পাতাগুলো ফেলে না, ছাতুর সঙ্গে সিদ্ধ করে সবটা খেয়ে নেয়।

শোনা যায়, শরৎ মহারাজ একবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এই মাখন দেওয়া তিব্বতী চা তৈরির এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন, বলা বাহুল্য ফল তেমন উৎসাহজনক হয়নি!

এতক্ষণ ধরে ঠাকুরের চা-প্রেমী সন্তানদের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছি বলে পাঠক-পাঠিকারা যেন ভেবে বসবেন না, তখনকার সব সন্ন্যাসীই নরেনের পাল্লায় পড়ে চায়ে আসক্ত হয়েছিলেন।

ধরুন যোগীন মহারাজের কথা। যিনি স্বামী যোগানন্দ নামে সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

১৮৯১ সালে এই যোগানন্দ বলরাম বসুর বাড়িতে শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে ওঠেন এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষকে খবর পাঠান। গিরিশবাবু স্নান করতে যাচ্ছিলেন, সব শুনে বললেন, এখনই যাচ্ছেন, কিন্তু তার আগে 'যোগেকে একটু ফিকে চা করে খাইয়ে দিগে যা।' দূত বললো, যোগেন মহারাজ চা খান না, চা খেলে তাঁর মাথা ধরে। গিরিশবাবু তবু মত পরিবর্তন করলেন না।

দুধ-চিনি না দেওয়া চা খেয়ে যোগীন মহারাজের মাথাব্যথা কমে গেলো। এরপর গিরিশবাবু এসে সব শুনলেন। ইতিমধ্যেই যন্ত্রণার উপশম হয়েছে শুনে বললেন, "দেখলি শ্যালা, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গুণ দেখলি।" তার মানে, এককথায় চা-কে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের লেভেলে তুলে দেওয়া হলো।

আমার এক বন্ধুর মন্তব্য : "এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, পূর্ব এশিয়ায় প্রায় পাঁচশো বছর ধরে চা-কে ওষুধের সম্মানই দেওয়া হতো। চায়ের বয়স তো নেহাত কম হলো না, খ্রিস্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে থেকে এই পানীয়র কথা শোনা যাচ্ছে।"

গিরিশ শুধু মদই খেতেন, চায়ের গুণগ্রাহী ছিলেন না এমন ভাববেন না। ঈশ্‌নে নামে এক চাকর ছিল, সেই প্রতিদিন বিকেলে চায়ের ব্যবস্থা করে রাখতো, তারপর প্রথিতযশা সন্ন্যাসীরা গিরিশকে সঙ্গ দিতেন।

গিরিশবাবু যতোই সার্টিফিকেট দিন, কলকাতার অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার মহলে অনেকেই আদিপর্বে চা-কে সমর্থন করতে পারেননি। আমরা জনৈক মতি ডাক্তারের নাম পাচ্ছি। বিবেকানন্দর মেজোভাইয়ের তখন শরীর বেশ খারাপ। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। মতি ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন, এটা হচ্ছে টি পয়জন! চায়ের বিষ ধরে গিয়েছে, হাওয়া বদলানো দরকার। স্বামী সারদানন্দ তখনই টিকিট কেটে মহেন্দ্রনাথকে গাজীপুরে পাঠিয়ে দিলেন।

একটু সুস্থ হয়ে মহেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে চা-পান ত্যাগ করা তো সম্ভব নয়।

গিরিশের ভাই অতুলচন্দ্র ঘোষ নামকরা উকিল ছিলেন, ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন কল্পতরুর বিশেষ দিনে, ১ জানুয়ারি ১৮৮৬। মহিমবাবুকে দেখে অতুলবাবু চা ত্যাগ করতে বললেন এবং গালমন্দ করতে লাগলেন। তারপর ভাবলেন, মেজদা গিরিশকে দিয়ে বকালে আরও ভাল ফল হবে।

গিরিশবাবু তখন বৈঠকখানায় তক্তপোষের ওপর দাঁড়িয়ে কাপড় পরছিলেন, এখনই বেরোবেন। অতুল : "দেখছ মেজদা, ছোঁড়ার চা খেয়ে মুখে রক্ত উঠছে, তবু চা খাওয়া ছাড়বে না। তুমি একে ভাল করে বকে

দাও।”

গিরিশ ওই পথেই গেলেন না! কাপড়ের কসি গুঁজতে গুঁজতে বললেন, “দেখ অতুল, তুমি নেশাভাঙ করো না, তুমি আমাদের কথা বোঝ না, আমরা নেশাখোর লোক, আমাদের থাক্ আলাদা; আমি ‘মোদো’ মাতাল, মহিন ‘চেয়ো’ মাতাল।...তুমি ও বিষয়ে কিছু বুঝতে পারবে না।”

আহা যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তেমন তাঁর চেলা গিরিশচন্দ্র! মানুষকে গোঁত্তা মেরে যে নেশা ভাঙানো যায় না, তা এই পৃথিবীতে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। লেখালেখির সময় আমি চেন স্মোকারের মতন একটু একটু করে চা জিভে ঠেকিয়ে চলেছি, সামনে গরম পানীয় না থাকলে মনে হয় অনাথ হয়ে পড়ছি।

আমার মা ব্যাপারটা বুঝতেন, অত্যধিক চা প্রীতিতে সন্তুষ্ট না হলেও, খুব শাসন করতেন না, কারণ ‘মোদো’ মাতাল থেকে ‘চেয়ো’ মাতালকে তিনি অনেক বেশি নিরাপদ মনে করতেন।

এতোক্ষণ তো শুধু চায়ের টান এবং শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে চলেছি। কিন্তু চা নিয়ে রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ রচনাও শক্ত নয়।

আমাদের বাল্যকালে হেমেন্দ্রকুমার রায় ও নীহাররঞ্জন গুপ্ত রহস্য কাহিনী লিখতেন। এঁদের গল্পের শুরুতেই চাকর ‘ধূমায়িত চা’ এনে হাজির করতো। ওঁদের লেখা পড়ে এক এক সময় মনে হতো, চা ধূমায়িত ছাড়া হয় না! পরে কাপের পর কাপ চা ধ্বংস করতে করতে বুঝতাম, এই ধোঁয়াটা তো নজরে পড়ে না, রায় ও গুপ্ত মহাশয় কি স্রেফ অভ্যাসের বশেই গল্পের চরিত্রদের সামনে ধূমায়িত চায়ের আয়োজন করতেন?

স্বামী অখণ্ডানন্দ বা গঙ্গাধর মহারাজের দুঃসাহসিক ভ্রমণ বৃত্তান্তের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বলা হয়নি, গুজরাটের এক শহরে জনৈক ধনীব্যক্তি স্বামী অখণ্ডানন্দকে নিয়মিত বাড়িতে এসে চা পানের নিমন্ত্রণ করতেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর পুত্রবধূর আশঙ্কা হলো, বৃদ্ধ তাঁর বিষয়সম্পত্তি হয়তো সাধুকে দিয়ে দেবেন। ঈর্ষায় একদিন সন্ন্যাসীর চায়ে তিনি সামান্য বিষ ঢেলে দিয়েছিলেন।

অসুস্থ রোগীকে দেখে কবিরাজমশাই ব্যাপারটা আন্দাজ করে অখণ্ডানন্দকে বললেন, কারও বাড়িতে গিয়ে চা খাবেন না। কিন্তু ভিতরের ব্যাপারটা তিনি বললেন না। গঙ্গাধর মহারাজ আবার ওই বৃদ্ধের বাড়িতে গেলেন এবং দুষ্টা পুত্রবধূ তাঁকে আবার বিষ দিলেন চায়ের সঙ্গে। গঙ্গাধর মহারাজের জীবন সেবারও কোনওক্রমে রক্ষা পেলো এবং কবিরাজমশাই তাঁকে এবার খোলাখুলি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। শোনা যায়, ধনী বৃদ্ধ যথাসময়ে খবরটা পান এবং পুত্রবধূকে অভিসম্পাত করেন।

আরও একটা ঘটনা বলি। প্রকাশ্যে চা পানের জন্যে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে একসময় কোর্টঘর করতে হয়েছে। বিবেকানন্দ বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন, আর স্থানীয় বালি মিউনিসিপ্যালিটি সেই মঠকে 'নরেন দত্তর প্লেজার হাউস' বলে নথিভুক্ত করে মোটা ট্যাক্স বসিয়ে দিলো। অ্যাটর্নির ছেলে বিবেকানন্দও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি মামলা করে দিলেন।

চুঁচুড়া কোর্টে এই মামলায় বালি মিউনিসিপ্যালিটি তিনটি মন্তব্য পেশ করে : তথাকথিত সন্ন্যাসীরা এখানে সুখদায়ক সোফায় বসে থাকেন, এখানে বিদেশিনীরা নিত্য যাতায়াত করেন এবং সন্ন্যাসীরা সময়ে অসময়ে অঢেল চা পান করেন। ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখার জন্যে আদালতে একজন সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে পরিদর্শক হিসেবে পাঠাবার আদেশ দেন এবং এই ইংরেজনন্দন সৌভাগ্যক্রমে সন্ন্যাসীদের চা পানের মধ্যে কোনও দোষ খুঁজে পাননি।

মঠের সন্ন্যাসীদের যখন চা পানে আইনগত বাধা নেই, তখন হাওড়া কাশুন্দের আমরাও কেন এই স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত হবো? এই যুক্তির জোরেই ছাত্রাবস্থা থেকে প্রাণের সুখে চা পান করে চলেছি। ঈশ্বরের দয়ায় কখনও 'টি পয়জন' নামক রোগে আক্রান্ত হইনি। তবে অন্য ধাক্কা এসেছে।

বন্ধুরা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে, চা বিদেশি জিনিস—চীন থেকে এ দেশে এসেছে। আরও বলেছে, অমন স্বর্গীয় জিনিসের বিনিময়ে নির্লজ্জ আমরা একসময় প্রতিবেশী চীনকে আফিম গছিয়েছি সমস্ত জাতটার শরীর-স্বাস্থ্য নষ্ট করতে। হয়তো এই ব্যাপারে ইংরেজের মস্ত ভূমিকা ছিল। কিন্তু আমরাও তো টু পাইস করেছি।

মনের মধ্যে একটু অপরাধবোধ অনেকদিন পুষে রেখেছিলাম। সম্প্রতি প্রভাতরঞ্জন সরকারের একটি লেখা পড়ে ভরসা ফিরে পেলাম।

কে বলে চীন আমাদের চা খেতে শিখিয়েছে? প্রভাতরঞ্জন লিখেছেন, দুর্গম গিরি পেরোবার সময় ভারতীয় সন্ন্যাসী পরিব্রাজকরা অন্তত পাঁচ হাজার বছর ধরে হিমালয়ে চা উপভোগ করছেন। অবশ্য পানীয় হিসেবে নয়। তখন দুর্গম পথের যাত্রীরা শীতকে জয় করবার জন্যে চায়ের পাতা চিবিয়ে খেতেন।

চায়ের আরও ইতিহাস আছে। এর আদি ব্যবহার চীন দেশে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দের এই খবর পাওয়া যাচ্ছে, ডাচদের মাধ্যমে চা হাজির হলো ইউরোপে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্রাট দ্বিতীয় চার্লসকে যে দু পাউন্ড দু আউন্স চা উপহার দেন তার প্রতি পাউন্ড দাম চল্লিশ শিলিং। হাওড়ার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে চায়ের চাষ হয় ১৭৮৩ সালে। ক্লান্তি অপনোদনে, খাই খাই রোগে, ঢুলুনিতে ও নেত্রাভিষ্যন্দে (অর্থাৎ চোখ ওঠায়) এর কোনও তুলনা নেই। এই শতাব্দীর শুরুতে দ্রব্যগুণ অভিধানে কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয় চায়ের দুটি নাম সংগ্রহ করেছেন—শ্যামপর্ণী ও অতন্দ্রী।

একসময়ে সংস্কৃতে চায়ের নাম হয় 'কমলরস'! সাহেবরা স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত যাঁরা এ দেশের ঐতিহ্যের কিছুই বিশ্বাস করেন না, তাঁদের কাছে সবিনয় নিবেদন, বোটানির বড় বই খুলে চা-এর পোশাকী নামটা একটু ভাল করে দেখে নিন—*'Camellia Sinensis'*। 'কমল' কথাটি ক্যামেলিয়া শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে নেই? কট্টর স্বদেশীরা যদি পাঁচ হাজার বছর আগের দুঃসাহসী ভারতীয় গিরিলঙ্ঘনকারীদের স্মরণে রেখে চা-কে পুনরায় 'কমলরস' আখ্যা দেন, তা হলে মন্দ হয় না।

মা দুগ্গার খাওয়া-দাওয়া

"বিশ্বায়নের যুগে মা দুর্গাকে শুধু স্বদেশে বেঁধে রাখা চলবে না," বললেন মা দুর্গার অন্ধ ভক্ত অনাবাসী ব্যান্ডোদা। সব কিছুই তো এই অভাগা বাংলা থেকে চলে যেতে বসেছে, ফ্লাইট অফ ক্যাপিটালের সঙ্গে ফ্লাইট অফ মাদার হলে দুঃখের শেষ থাকবে না।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কলকাতায় ল্যান্ড করে ব্যান্ডোদা বললেন, "মনে রাখতে হবে কমপিটিশনের বাজার, একদিন কমপিটিশন করে সুদূর আসিরিয়া থেকে মাকে আমরা এদেশে টেনে এনে ইন্ডিয়ান করে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর টাইটেল এখনও জগজ্জননী—সারা দুনিয়া এখনও পুত্র, আয়ু ও ধনবৃদ্ধির জন্য মায়ের নিত্য ভজনা করতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী এবং প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া আমাদের জাতীয় স্বভাবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যান্ডোদা পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে যেখানেই দুর্গাপূজা হয় সেখানেই চষে বেড়িয়েছেন। বললেন, "ক্লিভল্যান্ড ইউ এস এ-তে যে নিষ্ঠার সঙ্গে মায়ের পুজো হয় তা ম্যাচ করা তোদের পক্ষে মুশকিল হবে।"

ব্যান্ডোদার অনাবাসী ফ্ল্যাটের অবস্থিতি ইদানীং 'মৈনাক' নামক এক বহুতল ফ্ল্যাটবাড়িতে। ন'তলায় ব্যান্ডোধামে বসেই তিনি এবার পুজোর আড্ডা জমিয়েছেন। ফ্ল্যাটের আয়তন তেমন বেশি নয় বলে ব্যান্ডোদা সংশোধনী দিলেন—"ধাম নয়, একে তোরা বলতে পারিস ব্যান্ডোবক্স।"

"বছ্‌ছরকার দিনে মিথ্যাচার করিস না, তুইও তো এক আধবার ফরেন ট্যুর করেছিস, একটা স্বেচ্ছা-স্বীকারোক্তি কর।"

আমার কনফেশন, "তিনটে কনটিনেন্টে অন্তত তিনশো জায়গায় খিচুড়ি খেয়ে, আমাকে মেনে নিতেই হচ্ছে, ওয়ার্লডের সেরা খিচুড়ি আস্বাদন করেছি নিউ ইয়র্কে মহাসপ্তমীর রাত্রে। সেই খিচুড়ির প্রস্তুতি ও বিতরণের

দায়িত্বে ছিল আমার স্কুলজীবনের বন্ধু ডাক্তার তপন সরকার। কিছুদিন আগে তপন আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে, এবার পুজোয় মনটা তাই একটু উদাস হয়ে আছে।"

"সেকেন্ড বেস্ট খিচুড়ি, ব্যান্ডোদা, খেয়েছি বম্বের খার অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের প্যান্ডেলে। সত্যি কথা বলতে কি, অমন খিচুড়ি পেলে সমস্ত বম্বে শহরটাই না শেষপর্যন্ত খারে জমা হয়।"

ব্যান্ডেদা জানালেন, "গতবারের পুজোয় অবিস্মরণীয় খিচুড়ি উইথ বেগুনভাজা খেয়েছি দিল্লির এক সার্বজনীন প্যান্ডেলে! খোঁজ করতে গিয়ে হোঁচট খেলাম, দিল্লির ফুড টেকনোলজি নয়, রাঁধুনি এসেছে কলকাতা থেকে, সাকিন মিডনাপুর। বুঝলাম স্বদেশ থেকে উৎপাটিত হয়ে প্রবাসে বসবাস না করলে বাঙালি রাঁধুনিরাও আজকাল বিকশিত হয় না। সাধে কি আর কলকাতার বিজলী গ্রীল দিল্লিতে শাখা স্থাপন করেছে! ভাজার ফলে বেগুনের ক্যালরি মূল্য প্রচণ্ড বেড়ে যায়—অত্যধিক তেল টানে বলে। কিন্তু দিল্লি প্যান্ডালে বেগুনভাজা অমৃতসম, মুখে না দিয়ে থাকা যায় না।"

নানা দেশ ঘুরে, নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অনেক আশা নিয়ে ব্যান্ডোদা এবার কলকাতায় এসেছেন পুজো কাটাতে, তাঁর খুব ইচ্ছে দিল্লির মতন অনাহুত অবস্থায় এখানকার কোনও মণ্ডপে প্রবেশ করে খিচুড়ি ভক্ষণ করা। বলতে বাধ্য হলাম, "সে গুড়ে বালি ব্যান্ডোদা, কলকাতা-হাওড়ায় কেবল সাজগোজের এবং আলোকসজ্জার চেকনাই, ঘরের খেয়ে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে বনের মোষ তাড়িয়ে আপনি খালি পেটে বাড়ি ফিরুন।"

খুব মন খারাপ ব্যান্ডোদার। বললাম, "আপনি তাজ বেঙ্গলে কিংবা ওবেরয়তে টেবিল বুক করুন।"

"পংক্তিভোজের মাহাত্ম্যই অন্য—ফরেনের ফাইভস্টারে অন্তত হাজার নাইট যাপন করে এই ধ্রুব সত্য উপলব্ধি করেছি," দুঃখ করলেন ব্যান্ডোদা।

আমি বললাম, "কলকাতায় মুখ রক্ষে হচ্ছে ইদানীং ফ্ল্যাটবাড়ির পুজোয়, চলুন আমার সঙ্গে চেতলায় বিশ্বরূপ হাউজিং সোসাইটির পুজোয়—নো ইনভিটেশন, নো নোটিশ, কিন্তু সান্নিধ্যে ও রসনায় তৃপ্তি পাবেন। ওঁদের হালুইকর কোথা থেকে আসছেন তা নিতান্তই সিক্রেট,

পাছে অন্য কোনও ফ্ল্যাটবাড়ি তাঁকে ভাঙিয়ে নিয়ে যায়।"

আমাদের কথার মাঝেই সংস্কৃতবিশারদ অধ্যাপক সর্বদমন রায় মৈনাকে উপস্থিত হলেন। ব্যান্ডোদার খাদ্যবিষয়ক নানা রিসার্চ ও অভিযানে অধ্যাপক রায় বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েক ভল্যুমে সেই সন্ধানের কথা যখন ইংরিজিতে প্রকাশিত হবে, তখন সর্বদমন হয়তো ওয়ার্লড ফিগার হয়ে উঠবেন।

"আমার কি গতি হবে?" সবিনয়ে জানতে চাই।

ব্যান্ডোদা মন্তব্য করলেন, "তুই ছোটাছুটি খাটাখাটি করেছিস, কিন্তু তোর অরিজিন্যাল চিন্তাশক্তি কম, খাওয়ার আনন্দের দিকেই তোর নজর, খাবারের হিস্ট্রি এবং জিওগ্রাফি নিয়ে তোর উৎসাহ কম।"

"পুডিং-এর স্বাদ তো পুডিং-এর ভোজনে, খোদ সায়েবরাই তো একথা বলে গিয়েছেন, ব্যান্ডোদা।"

"ওসব সেকেলে কথা, এখন ফিজিওলজি, কেমিস্ট্রি, এনথ্রপলজি, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি সব মিশিয়ে ফেলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পুডিং সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হয়।"

"সেই সঙ্গে বেদ-বেদান্ত উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত পুরাণ খুঁটিয়ে দেখতে হবে," ফোড়ন দিলেন সর্বদমন রায়, ফলে আমি আরও মুষড়ে পড়লাম। "আমার নাম শিকাগো থেকে দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বার কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই।"

ব্যান্ডোদা এই মুহূর্তে বিশ্বজননীর খাদ্যাখাদ্য নিয়ে খবর সংগ্রহ করতে আগ্রহী। একখানা পি এম বাগচির পুরোহিত দর্পণ বইবাজার থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন। বললেন, "অনেক ঢাকঢোল বাজিয়ে বিল্ববৃক্ষ থেকে মাকে তো নাবানো হলো বোধনের দিনে, সপ্তমীপূজার পূর্বদিনে সায়ংকালে স্বস্তিবাচন করে সঙ্কল্পগ্রহণও করা হলো, তারপর সপ্তমীর দিনে তো মহাস্নানের নানা ঘটা। আটটা কলসি থেকে আটরকম জলে স্নান, ব্যাপারটা গ্র্যান্ড!"

সর্বদমন হিসেব দিলেন—প্রথমে গঙ্গাজল, তারপর বৃষ্টিজল, সরস্বতী নদীর জল, সাগর জল, পদ্মরেণুমিশ্রিত জল, ঝরনাজল, সর্বতীর্থ জল এবং

লাস্টে শুদ্ধজল।

"অর্থাৎ ডিসটিল্‌ড ওয়াটার অথবা মিনারেল ওয়াটার সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষরা সচেতন ছিলেন," আমার এই মন্তব্য শুনে মৃদু বকুনি লাগালেন ব্যান্ডোদা।

আমি বললাম, "মন্ত্রে পাঁচটা আইটেম মাত্র প্রার্থনা করা হচ্ছে, এর মধ্যে মোক্ষের গন্ধ পর্যন্ত নেই—প্রাণ, যশঃ, পুত্র, পত্নী ও বিত্তরক্ষা। জীবনবীমা ও বিত্তবীমা, অর্থাৎ এল আই সি এবং জি আই সি-র পক্ষে মা দুর্গা আইডিয়াল।"

ব্যান্ডোদার প্রধান নজর যে রসনার দিকে তা বুঝে সর্বদমন রায় বললেন, "পুজোর মন্ত্র থেকে যা দেখতে পাচ্ছি, মহাদেবীর আচমনের জন্য দেওয়া হচ্ছে লবঙ্গ-কক্কোলচূর্ণ (কাঁকোল বা বনকর্পূর) মিশ্রিত জল। তারপর আসছে মধুপর্ক। এই মধুপর্ক প্রাচীন ভারতের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে রয়েছে। প্রিয় কোনও অতিথি এলেই প্রথমেই তাকে মধুপর্ক নিবেদন করো।"

এর ফর্মুলা কি? জানতে চাইলেন ব্যান্ডোদা। "মনে হচ্ছে খুব প্রিয় আইটেম, ফর্দমালায় ৩৭টা মধুপর্কর বাটির উল্লেখ রয়েছে দেখছি।"

"আট আঙুল কাঁসার পাত্রে মধু, ঘৃত, দধি, শর্করা সমভাগে মিশ্রিত করে, সেই সঙ্গে নারকোলের জল।"

পিতৃপুরুষদের স্বাদবোধ অন্যরকম ছিল। মধুপর্ক ককটেল সম্বন্ধে সামান্যতম উৎসাহ দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। "ব্যান্ডোদা, এর থেকে সরবৎ অনেক আকর্ষণীয়।"

নৈবেদ্য ঝটপট অ্যানালিসিস করে ফেললেন সর্বদমন রায়। প্রথমে দেবীর দক্ষিণদিকে ঘৃতসহ আমান্ন এবং বামদিকে সিদ্ধান্ন।

আমান্ন মানে যে কাঁচা চাল এবং সিদ্ধান্ন যে সেদ্ধ চাল তা আমার জানা ছিল না।

"আমানির সঙ্গে গণ্ডগোল করবেন না, এর অর্থ পান্তাভাতের জল," সাবধান করে দিলেন সর্বদমনবাবু।

এরপর গ্রাম ও বনজাত নানা সুগন্ধবিশিষ্ট ফলমূল। তারপর বহুবর্ণের বিবিধ ফল। পরবর্তী নিবেদন প্রাণদায়ক চতুর্বিধ অন্ন। পরবর্তী আইটেম

গব্যঘৃত ও নানা মিষ্টি সহযোগে প্রস্তুত পায়েস, ফলোড বাই অমৃততুল্য মিষ্টে রঞ্জিত পিষ্টকং বিবিধং। পিঠে খাওয়ার পর, একদা কুবের রসময় পাত্রপূর্ণ অক্ষয়মধু পান করতেন, দেবি তুমিও এই মধুসেবন করো। নেকস্‌ট্‌ ডিশ---চিনির তৈরি মোদকং স্বাদসংযুক্তং। লাস্ট আইটেম ষড়রসযুক্ত দুধ ও গুড়ের লড্ডুকম অর্থাৎ লাড্ডু।

বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন ব্যাভোদা। তার আগে শুনেছেন, দুর্গাস্তুতিতে যশো দেহি, ধনং দেহি, জয়ং দেহি, হর পাপং, হর ক্লেশং, হর শোকং ইত্যাদি অসংখ্য প্রার্থনা রয়েছে, কিন্তু দুটো প্রিয়খাদ্যর জন্য কোনও আবেদন নেই। এর অর্থ, হয় ভাল রান্না ভাল খাবারের খবর তখনও এদেশে পৌঁছয়নি, অথবা সুখাদ্য এতোই অঢেল যে দেবীর কাছে কোনও প্রার্থনার প্রয়োজন নেই।

স্রেফ লড্ডুকং ও মোদকং আবিষ্কার করে প্রাচীন ভারত কী করে সন্তুষ্ট রইলেন তা ভাবতে পারছেন না আমাদের ব্যাভোদা। ফলের রস দিয়ে পূর্বপুরুষরা মাংস রাঁধতেন জেনে ব্যাভোদা আরও বিমর্ষ হয়ে উঠলেন।

পরিস্থিতির ওপর আলো ফেলবার জন্যে অধ্যাপক সর্বদমন রায় দ্রুত দেবীভাগবতম্ কনসাল্ট করলেন। সব কটি পুরাণ ক্রয় করে ব্যাভোদা ইতিমধ্যেই তাঁর মৈনাক সংগ্রহাগার স্থাপন করেছেন। অষ্টম স্কন্ধে স্বয়ং নারায়ণ তালিকা দিয়েছেন দেবর্ষি নারদকে, মায়ের প্রিয় খাদ্যতালিকা। শুধু সপ্তমী অষ্টমী নবমী নয়, সম্বৎসর মা তো বেঁচে থাকেন এবং ভক্তের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন।

সর্বদমন শুনিয়ে দিলেন। মায়ের প্রতিদিনের ফেভারিট আইটেমগুলি :

রবিবার—পায়েস

সোমবার—দুগ্ধ

মঙ্গলবার—কদলীফল

বুধবার—সদ্যোজাত ঘৃত

বৃহস্পতিবার—শর্করা

শুক্রবার—সিতশর্করা (পদ্মচিনি)

শনিবার—গব্যঘৃত

এই তালিকায় তেমন উৎসাহিত বোধ করছেন না ব্যান্ডোদা। সর্বদমন বললেন, "যে ব্যক্তি সপ্তমীতে দেবীকে গুড় নিবেদন করে সে কদাচ শোক পায় না। অষ্টমীতে নারিকেল নিবেদন করলে সন্তাপবিহীন হওয়া যায়। নবমীতে দেবীকে দিতে হয় লাজ। লাজ মানে লজ্জা নয়, খই। আর্যরা এই খই নিয়ে অনেক মাতামাতি করেছেন। দশমীতে দেবীর প্রিয় আইটেম কৃষ্ণতিল। নিবেদন করলে যমলোকের ভয় থাকে না। দেবীর প্রিয়পাত্র হবার সহজ উপায় একাদশীতে দধি নিবেদন করা। দেবী কত অল্পে সন্তুষ্ট তার প্রমাণ দ্বাদশীতে চিপিটক অর্থাৎ স্রেফ চিঁড়া পেলেই তিনি সন্তুষ্ট। সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকলে ত্রয়োদশীতে নিবেদন করুন চণক অর্থাৎ চানা।"

"সর্বদমনবাবু, এইভাবে আমাদের প্রাণে কষ্ট দেবেন না। মহাদেবীর যোগ্য নৈবেদ্য কি এইসব? আপনিই বলুন।"

অধ্যাপক সর্বদমন রায় শেষ চেষ্টা করলেন। "দুধের খাবারে প্রাচীন ভারত ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চীনারা তো নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরির আগে গোপালন কাকে বলে তাই জানতো না। সায়েবরাও এতো পিছিয়ে ছিল যে এখনও দুধের সর-এর কোনও ইংরিজি প্রতিশব্দ বার করতে পারেনি। আর আমাদের দেখুন। দেবীপ্রিয় কিলাটক (দুধের মালাই) এবং দধিকুর্চি (দইয়ের মালাই) কতদিন থেকে শাস্ত্রে বারবার উল্লিখিত রয়েছে। সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে দেবীর নৈবেদ্যকীর্তন শুনুন—ঘৃত, তিল, শর্করা, দধি, দুগ্ধ, কিলাটক, দধিকুর্চি, মোদক, ফেণিকা, ঘৃতমণ্ড, গোধূমপিষ্টক, পটপত্র, ঘৃতপুর, বটক, খর্জুররস, গুড়মিশ্রিত চণকপিষ্ট, মধু, শূরণ, গুড়, ক্রমুক, দ্রাক্ষা, খর্জুর, চারক, অপূপ, নবনীত, মুদগ, মোদক, মাতুলিঙ্গ।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সর্বদমন বললেন, "গোধূম শব্দের মানে আপনার জানা নেই নিশ্চয়—গম। অপূপংঘৃতবন্তম্ একধরনের পিঠে। বটক একধরনের বড়া। শূরণ একধরনের ওল—হয়তো ওল দিয়ে কোনও মিঠাই বানানো হতো প্রাচীনকালে। লাস্ট আইটেম মাতুলিঙ্গকে আমরা বলি টাবালেবু।"

এই লেবু আমার মাথায় ঢুকছে না। কিন্তু সর্বদমনকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই,

তিনি বলবেন, আপনি জানেন না বলে মাকে নিবেদন করা যাবে না এমন কোনও কথা নেই।

ব্যান্ডোদার মুখের দিকে তাকিয়ে এবার সর্বদমন বললেন, "মায়ের মহিমা সীমাহীন। অর্থাভিলাষে তাঁকে স্তব করলে অর্থলাভ হয়, ধর্মার্থী ধর্মলাভ করে, কামীর সমুদয় কামনা সিদ্ধ হয় ও মুমুক্ষু মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। স্তবকারী ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ হন, ক্ষত্রিয় শত্রু জয় করতে পারেন এবং বৈশ্য ধনধান্যসম্পন্ন হন। অথচ এই দেবীই মদদাত্রী, মদোম্মত্তা, মানগম্যা, মহাব্রতা ও মনস্বিনী।"

সুনির্বাচিত শব্দগুলির তারিফ করলেন ব্যান্ডোদা। তারপর জানতে চাইলেন, খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত কোনও দেবদেবী আছেন কি না।

"আঃ ব্যান্ডোদা, ভজন ও ভোজন এক জিনিস নয়," ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাই আমি।

সর্বদমন একগাল হেসে বললেন, "পুষ্টি কথাটা বিজ্ঞানের বইতে নিশ্চয় পড়েছেন। অ্যাকর্ডিং টু দেবীভাগবত, ইনিও দেবী, আমাদের গণেশের স্ত্রী। তিনি না থাকলে স্ত্রীপুরুষরা ক্ষীণ হয়ে পড়েন। আরেক দেবীর নাম তুষ্টি—অনন্তদেবের পত্নী। আরও অনেক অখ্যাত অথচ শক্তিময়ী দেবী আছেন—দয়া (মোহের পত্নী), প্রতিষ্ঠা (পুণ্যের পত্নী), কীর্তি (সুকর্মের পত্নী)।"

"খারাপ সাইডে?" আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম।

সর্বদমন নির্দ্বিধায় নিবেদন করলেন, "অধর্মের ওয়াইফ হলেন মিথ্যা—তিনি সত্যযুগে অদৃশ্য অবস্থায় এবং কলিতে সর্বব্যাপিনী হয়ে কাপট্যরূপে ভ্রাতার সঙ্গে প্রতিগৃহে বিচরণ করেন। লোভের দুই পত্নী, নাম ক্ষুধা ও পিপাসা। ভাল সাইডে জ্ঞানের তিন সহধর্মিণী—এঁদের নাম বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি। শ্রদ্ধা ও ভক্তি হলেন বৈরাগ্যের পত্নী। মহাশক্তিমান কালের দুই কন্যা—মৃত্যু ও জরা। এসব আমার বানানো সংবাদ নয়, ধৈর্য ধরে শাস্ত্র খুললেই সব খবর পেয়ে যাবেন।"

ব্যান্ডোদার মন অন্যত্র পড়ে রয়েছে, মায়ের প্রিয় খাদ্যতালিকা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, "ফেণিকা ব্যাপারটা কী?"

সর্বদমন জানালেন, "প্রাচীন ভারতে মিষ্টির ছড়াছড়ি—ইক্ষুরস গাঢ় করে প্রথম ফনিত, তারপর গুড়, তারপর খণ্ড।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মায়ের সঙ্গে যেসব দেবদেবী মর্ত্যধামে এসেছেন তাঁরা কি নৈবেদ্যের ভাগী হবেন না?"

ব্যান্ডোদা এবার আমাকে তারিফ করলেন, "ভাল প্রশ্ন।"

সর্বদমন অবশ্য দমবার পাত্র নন। বললেন, "চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এর রেফারেন্স ও সমাধান রয়েছে। মনে রাখতে হবে, মহাদেবের মেজাজ তামসিক, সেইজন্যে ঘি দিয়ে রান্না বা ভাজা কিছু তাঁকে নিবেদন করা হচ্ছে না। হয়তো তাঁর কোলেস্টরল সমস্যা ছিল। তাঁর রান্না হয় সর্ষের তেলে। তাঁর জন্যে নির্ধারিত আইটেম দেখা যাচ্ছে নিমবেগুন, সর্ষে শাক, ডাল লেবু সহযোগে, করঞ্জা এবং কাঁচা আমের ঝোল। খুবই প্লেন ডায়েট। সে তুলনায় ভগবান বিষ্ণুর মেনু একটু আকর্ষণীয়। তিনি নিমবেগুনে বিশ্বাসী নন, শুরুতেই ঘিয়ে ভাজা পটোল, তারপর গোলগোল মণ্ডা, খাণ্ডু ও নাড়ু। আগেকার দিনে একটা গ্রাম্য প্রবাদ ছিল, ভাজে উচ্ছে, বলে পটোল!"

ব্যান্ডোদার মুড দেখে সর্বদমন এবার বললেন, "মায়ের মনোরঞ্জনের জন্য মহাষ্টমীর দিনে আপনি ক্ষিরিকা নিবেদন করতে পারেন। তবে ক্ষিরিকা প্রস্তুতের নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠিন। চালের সঙ্গে প্রথমে ঘৃতসংযোগ করতে হবে, একমাত্র এই সংযোগের পরে দুগ্ধ, শর্করা ও অগ্নিস্পর্শ।"

আলোচনার মধ্যেই সারপ্রাইজ দিতে চাইলেন ব্যান্ডোদা। বললেন, "ভোগের খাদ্য সম্বন্ধে পুরোহিত দর্পণ বা কোনও শাস্ত্রেই বিস্তারিত আলোচনা নেই। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভোগ সংক্রান্ত তথ্য সযত্নে সংগ্রহ করে আমাদের একখানা এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করতে হবে যাতে অনাগত কালে মায়ের ভোগের জন্যে আই.এস-ও নাইন থাউজেন্ড পেতে আমাদের অসুবিধা না হয়। কিন্তু তার আগে বালিগঞ্জ প্লেসের মুখার্জি সুইটস্ থেকে বোঁদের লাড্ডু আনিয়ে রেখেছি—যতদূর বুঝেছি ঘৃতপুর, খজ্জকা ও লড্ডুকের মধ্যে লাস্ট আইটেমটাই কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এখনও সমান জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে।"

একটি লাড্ডু অবিলম্বে হাতে তুলে নিয়ে ব্যান্ডোদার কাছে আমার

সবিনয় নিবেদন, "গোলকধামের নিবাসীরা গোল মিষ্টান্ন পছন্দ করবেন এতে আর আশ্চর্য কী? তিরুপতিতে খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওই মন্দিরে ত্রিশজন হালুইকর প্রতিদিন ভক্তদের জন্যে সত্তর হাজার লাড্ডু তৈরি করেন। এর জন্যে লাগে ছ'টন চিনি, তিন টন ডাল এবং আড়াই টন ঘি। তাতেও সাপ্লাই সুসম্পন্ন হচ্ছে না, তাই কর্তৃপক্ষ স্বয়ংক্রিয় লড্ডুক মেশিন বসানোর ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "লর্ড জগন্নাথ পাবলিসিটি পছন্দ করেন না, তাই নিজের সাফল্য ঘোষণা করেন না, বিশ্বের বৃহত্তম কেটারার কিন্তু তিনিই—সাড়ে সাতশো চুল্লি জ্বেলে এক হাজার রাঁধুনি ওখানে দিনে পাঁচবার ভোগ রান্না করেন।"

অধ্যাপক সর্বদমন রায় আমাদের চমকে দিলেন। মহাসপ্তমী ও মহাষ্টমীতে তিনি উপবাস করেন।

ব্যান্ডোদা দুঃখ করলেন, "ভজনের সঙ্গে ভোজন ছাড়াও যে অনশন রয়েছে তা আমাদের খেয়াল থাকে না।"

অত্যন্ত বিনম্রভাবে সর্বদমন রায় মনে করিয়ে দিলেন, "উপবাস ও অনাহারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে—একটি ইচ্ছাকৃত, আর একটি অনিচ্ছাকৃত। খাবার ইচ্ছে আছে অথচ খেতে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা অনাহার।"

"উৎসব মানেই দেখা যাচ্ছে, প্রথমে ফাস্টিং, তারপর ফিস্টিং। সমস্ত ধর্মেরই এক প্রবণতা—না খেয়ে-খেয়ে শরীরকে এবং মনকে তৈরি করো, তারপর শুরু হোক ভোজন," বললেন ব্যান্ডোদা।

সর্বদমন জানালেন, "উপবাসের অনেক সুযোগ, বারব্রত, তিথিব্রত থেকে শুরু করে, নক্ষত্রব্রত, মাসব্রত এবং সম্বৎসর ব্রত। পাঁজিটা হাতে করলেই সব খবর সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন।"

ব্যান্ডোদা কিছু খবর রাখতেন। স্বীকার করলেন, অমন যে অমন আল বেরুনী, তিনিও পাঁচরকম উপবাসের বিশদ বিবরণ রেখে গিয়েছেন। "প্রথমেই মনে রাখতে হবে, শাস্ত্রগত সব অনাহারই উপবাস নয়। মধ্যাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে ভোজনবিরতি কেবল তার নাম উপবাস। আরও

চারটি ভোজনবিরতি আছে।

ব্যান্ডোদা বললেন, "এই উপবাসের ব্যাপারে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান সকলে একমত হয়ে গিয়েছেন। বুদ্ধ না খেয়ে খেয়ে শরীরটার কী অবস্থা করেছিলেন! খ্রিস্ট যে টানা চল্লিশ দিন উপবাস করেছিলেন তা আমরা জানতে পারছি। খ্রিস্ট বলেছিলেন, উপবাসের সময় মাথার চুলে তেল দেবে, মুখে জল দিয়ে ধোবে, যাতে অন্য কেউ বুঝতে না পারে তুমি উপবাস করছো।"

"আপনি আরও পিছনে চলে যেতে পারেন," পরামর্শ দিলেন অধ্যাপক সর্বদমন রায়। "মায়া সভ্যতায় আমরা উপবাসের জয়গান লক্ষ্য করেছি। প্রাচীন মিশর, মোঙ্গল, সীরিয় কে না বিশ্বাস করতো উপবাসে শরীর ও মনের উপকার হয়? খোঁজ করলে দেখবেন শুধু খ্রিস্ট নন, ড্যানিয়েল, ডেভিড, এলিজা, মোজেস সবাই চল্লিশ দিনের উপবাসে নিজেদের শরীর পবিত্র করেছেন।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "প্রফেসর রায়, উপবাস বড় জটিল সাবজেক্ট, অনেক সময় নিয়ে খোঁজখবর করতে হবে। এখন পুজোর দিনে মায়ের নাম করে আমরা কোথাও কমিউনিটি খিচুড়ি খেয়ে আসি চলুন। মনে রাখবেন, সন্তান উপবাসী থাকলে মা কিছুতেই স্বস্তি পেতে পারেন না। গর্ভধারিণী মা ও মাটির মায়ের মধ্যে এ-বিষয়ে কোনও পার্থক্য নেই।" এই বলে ব্যান্ডোদা আবার তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ থেকে লোভনীয় লড্ডুক বিতরণ শুরু করলেন।

রাজা-মহারাজার লাঞ্চ-ডিনার

শারোদৎসবে এবারের বৈঠকে মাত্র তিনটি ক্যারাকটার উপস্থিত। অধ্যাপক সর্বদমন রায়, এই অধম ও ব্যান্ডোদা।

এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য, সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত সর্বদমনকে অবশ্যই খ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদ বলতে পারেন। সম্প্রতি ব্যান্ডোদার অর্থানুকূল্যে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে এসেছেন। সর্বদমনের বয়স ৫৯, সাতপুরুষ ধরে এঁরা পুরোহিত ও সংস্কৃতজ্ঞ। আর ব্যান্ডোদা তো সর্ব অর্থে প্রখ্যাত ব্যক্তি। অনাবাসী বাঙালি, সাম্প্রতিক নিবাস বেভারলি হিল্‌স, ক্যালিফোর্নিয়া। ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ, হার্ভার্ড বিজনেস ইস্কুল থেকে ডক্টরেট, শারীরিক বয়স সত্তরের কাছাকাছি হলেও মানসিক বয়স বত্রিশ। নানা প্রলোভন ও প্ররোচনা সত্ত্বেও বহুদিন ভারতীয় পাশপোর্ট ত্যাগ করেননি, স্রেফ গ্রীনকার্ড হোল্ডার হিসেবেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু ইদানীং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মার্কিন নাগরিক হয়েছেন। ইদানীং ভারতবর্ষের অতীত ও ভবিষ্যত নিয়ে ব্যান্ডোদা প্রায়ই চিন্তা করেন এবং বছরের একটা বড় সময় এদেশে বসবাস করেন। সম্প্রতি বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে 'মৈনাক' নাম বহুতল বাড়িতে তিনি ফ্ল্যাট কিনেছেন, যদিও বহুজাতিক কর্পোরেশনের

কাজে এদেশে এলে অধিকাংশ সময় পাঁচতারা হোটেলে রাত্রিযাপনে বাধ্য হন।

ভিজিটিং কার্ডে দেখবেন, কে কে ব্যান্ডো। পিতৃদত্ত আদিনাম কল্যাণকুসুম বন্দ্যোপাধ্যায়—টাইটেলটা মার্কিনী সায়েবরা মরে গেলেও উচ্চারণ করতে পারবে না, তাই পরিস্থিতির পাকেচক্রে ব্যান্ডো হয়েছেন আমাদের ব্যান্ডোদা।

ইদানীং ব্যান্ডোদার ধারণা হয়েছে, নতুন সহস্রকে অধ্যাত্মবাদ, সঙ্গীত ও রন্ধনের মাধ্যমেই বিশ্বসভায় আমাদের ভারতবর্ষ সম্মানিত হবে। ইয়োগা, সিতার অ্যান্ড কারি! শেষে থেকেই শুরু করেছেন ব্যান্ডোদা। কিছুদিন হলো ম্যানেজমেন্ট বিশারদের চোখে ভারতের টক-ঝাল-মিষ্টি এটসেটরা খুঁটিয়ে দেখছেন। বহুদিন আগে কলেজে পড়ার সময় ব্যান্ডোদা বেলুড়মঠে নিত্য যাতায়াত করেছিলেন, তারপর প্রিয় এক মহারাজের বকুনি খেয়ে ফিরে এসেছেন কর্মযোগে।

ব্যান্ডোদা সেদিন নিজেকে নিয়েই রসিকতা করলেন, "শেষপর্যন্ত যদি কঠিন ব্রহ্মচর্যের পর গেরুয়াধারণ করবার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করতাম, তা হলে নাম নিতাম স্বামী ভোজনানন্দ।"

"সেগুড়ে বালি, ব্যান্ডোদা!" আমার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ।

"ভোজনটা বোধহয় কোনও উন্নতমার্গের আনন্দ নয়", সন্দেহ প্রকাশ করলেন সর্বদমন রায়।

"কী বলছেন, প্রফেসর রায়! স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব খেতে ভালবাসতেন, খাওয়াতে আরও ভালবাসতেন। তাঁর প্রধান চেলা স্বামী বিবেকানন্দ খেতে ভালবাসতেন, রাঁধতে ভালবাসতেন এবং প্রিয়জনদের খাওয়াতে পারলে আর কিছুই চাইতেন না! তাঁর আর একজন গুরুভাই, মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ যৌবনে কুস্তির লড়াই করে আধসের কচুরির জলখাবার সমপরিমাণ আলুর তরকারি সহযোগে উপভোগ করতেন। আর একজন চেলা উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এমনই ভোজনদক্ষ ছিলেন যে, বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, তোর পেটখানা দে, পৃথিবীতে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিই।"

"এঁরা আবার না খেয়েও থাকতে পারতেন," সবিনয়ে মনে করিয়ে দিলেন সর্বদমন রায়।

"সেকথা একশো বার! আসলে, ব্রহ্মচারী যখন সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে সন্ন্যাসী হন, তখন নতুন নামকরণটা গুরুই করেন এবং ভোজনানন্দ নামটা তাঁরা গোড়াতেই রিজেক্ট করে দিতেন।"

বলে রাখা ভাল, ষড় রস সম্পর্কে দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে, ব্যান্ডোদা এই কলকাতাতেই কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পাঁচতারা হোটেলের আশ্রয় ত্যাগ করে ব্যান্ডোদা উঠে এসেছেন বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে 'মৈনাক'-এর দশতলায়—বহুকষ্টে এক বাঙালি বিধবাকে রান্নার কাজে নিযুক্ত করেছেন, তাঁকে প্রতিদিন সুক্তো ও মোচার ঘণ্ট সরবরাহ করবার জন্য।

ব্যান্ডোদার দুঃখ, বিলেতের সায়েবরা মাংসের কারিতে মজলো, অথচ সুক্তোর মাহাত্ম্য এখনও বুঝলো না।

তবে ব্যান্ডোদা প্রচণ্ড আশাবাদী। বললেন, "এখনও হয়েছে কি! সবে চিকেন টিক্কা কারি খেতে শিখেছে বিলেতের সায়েবরা! পরবর্তী পর্যায়ে তিক্তরসের দিকে নজর যাবেই! যে মানুষ বীয়র ভালবাসে, সে উচ্ছে, বেগুন, পলতা, করলা, নিমঝোল ভালবাসবে না, তা হতেই পারে না।"

"সাত সকালে আপনার নিমবেগুনের আলোচনা রাখুন, দোহাই ব্যান্ডোদা! আমরা মিঠাই ইস্কুলের লোক! গল্পই যদি করবো তা হলে মণ্ডা-মিঠাই-সন্দেশ-রসগোল্লায় ডুবে থাকবো? আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, বিজনেসে কলকাতা যতো পিছিয়েই থাক, এখনও ওয়ার্লডের সেরা দই এখানেই তৈরি হয়।"

"দই নয়, মিষ্টি দই!" ব্যান্ডোদা আমার মন্তব্যকে একটু কোয়ালিফাই করতে চাইলেন।

"ব্যান্ডোদা, জেনুইন বাঙালির কাছে দই মানেই মিষ্টি দই। কোনওদিন কেউ বার করবে টক রসগোল্লা। ওসব হল বঙ্গসংস্কৃতিকে বিপন্ন করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।"

মৃদু হেসে ব্যান্ডোদা বললেন, "সাধারণ মানুষ যে সারাক্ষণ মিষ্টিটাই

পছন্দ করে তার প্রমাণ কোথায়?"

সর্বদমন বললেন, "ব্যান্ডোবাবু, ভাল গুড় পাওয়া যেতো বলেই এই দেশের নাম হয়েছিল গৌড়! একথা ভুলবেন না। একসময় ওয়ার্লডের সেরা আখ এই হুগলি জেলাতেই চাষ হতো।"

প্রতিবাদের চেষ্টা চালালেন ব্যান্ডোদা। "গুড় থেকে গৌড়দেশ, না গৌড়দেশে পাওয়া যায় বলে গুড়?"

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় নেই, সুকুমার সেন নেই, রাজশেখর বসু নেই—এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দেবে কে?

"আমার এক এন-আর-আই বৈষ্ণব বন্ধুর ধারণা, গৌরাঙ্গ থেকে গৌড় হয়েছে!"

"সেটা অসম্ভব, কারণ গৌরাঙ্গর জন্ম মাত্র পাঁচশো বছর আগে, অথচ তার অনেক আগেই এদেশকে গৌড় বলা হচ্ছে।"

আমার মন্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত হলেন অধ্যাপক সর্বদমন রায়। বললেন, "এদেশে সবই সম্ভব—রাম না জন্মাতেই তো রামায়ণ লেখা হয়ে গিয়েছিল।"

ব্যান্ডোদা এবার সর্বদমনকে সাপোর্ট করলেন। "এদেশ কেন? সব দেশেই ব্যাপারটা সম্ভব। সায়েবরা তো স্বীকার করেছে, কামিং ইভেন্টস্ কাস্ট দেয়ার শ্যাডোজ। অনাগত ঘটনাও অগ্রিম ছায়া বিস্তার করতে সক্ষম।"

শব্দতত্ত্বে কাবু করা যাচ্ছে না, অতএব লোককথার শরণাপন্ন হওয়া যাক। "ব্যান্ডোদা, আপনি তো জানেন সেই গল্প। ক্লাসে মাস্টারমশাই রচনা লিখতে দিলেন, আমি যদি রাজা হইতাম। ক্লাসের সবচেয়ে গরিব ভূমিহীন কৃষিকর্মীর ছেলেটি সরলমনে খাতায় তার বাসনা প্রকাশ করলো, আমি যদি রাজা হইতাম তাহা হইলে সব ভাত অবশ্যই গুড় দিয়ে খাইতাম!"

"এর থেকে কী প্রমাণ করতে চাইছিস?" ব্যান্ডোদা তখনই জানতে চাইলেন।

গম্ভীরভাবে অধ্যাপক সর্বদমন রায় মন্তব্য করলেন, "বোধ হয় প্রাচীন ভারতে গুড় এবং মিষ্টান্নই রাজা-মহারাজাদের প্রিয় রাজকীয় খাদ্য ছিল। অথবা গুড় এতোই দুষ্প্রাপ্য ছিল যে রাজা-মহারাজা ছাড়া কেউ কিনতে

পারতেন না।”

চান্স নিলাম আমি। “প্রফেসর রায়, আপনিই সেদিন আমাকে বললেন, হরপ্পায় পোড়া আখের নমুনা পাওয়া গিয়েছে। অনেকদিন থেকে মনের আনন্দে ভারতীয়রা আখের রস পান করছে। ঋগ্‌বেদে-এর নাম ছিল কুসর, অথর্ববেদে বলা হচ্ছে ইক্ষু। আপনিই বললেন, সিক্স হানড্রেড বি সি থেকে শর্করা শব্দটি আমরা ব্যবহার করছি, যা উত্তর ভারতে বিকৃত হয়ে শক্কর এবং ইংরেজের জিভে সুগার হয়ে গিয়েছে!”

“এই যে সেদিন তুই আমাকে লিখলি চীন দেশ থেকে এসেছিল তাই চিনি!” ব্যান্ডোদার মন্তব্যে অবিশ্বাসের সুর!

“যদি এমন কথা লিখে থাকি তা হলে উইথড্র করছি! কারণ সর্বদমনবাবু আমাকে খবর দিয়েছেন, সুগার টেকনোলজি শিখতে সপ্তম শতাব্দী থেকে চীনের ছাত্ররা এদেশে এসেছিলেন এবং স্বয়ং সম্রাট হর্ষবর্ধন এই আনাড়ি ছোকরাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছিলেন।”

“মিষ্টি যে প্রাচীন ভারতে অঢেল পাওয়া যেতো এবং সবার প্রিয় ছিল, তার প্রমাণ মধুপর্ক। ঘি, দই, দুধ, শর্করা ও সেই সঙ্গে মধু মিশিয়ে এই মধুপর্ক দেওয়া হতো গৃহে আগত বিশিষ্ট অতিথিদের। পাণিপাদ প্রক্ষালনের পরেই ফার্স্ট আইটেম। গৃহবধূ পাঁচমাস গর্ভবতী হলে এই মধুপর্ক, জন্মের পরও নবজাতককে এই মধুপর্ক, গুরুগৃহে গমনের সময় ছাত্রকে মধুপর্ক, বিবাহ মানসে বর যখন কন্যাগৃহে আসে তখনও বরণের সময় মধুপর্ক।” জানালেন অধ্যাপক সর্বদমন রায়।

“মধুপর্কর যে রেসিপি পাওয়া গেলো, তা খেতে ভাল হবে আশা করা কঠিন। বোঝা যাচ্ছে, প্রাচীন ভারতের হাই সোসাইটির রসনা অন্যরকম ছিল। তবে তর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই, স্বীকার করে নেওয়া যাক, সেকালের রাজারাজড়ারা মিষ্টান্ন পছন্দ করতেন,” বললেন ব্যান্ডোদা।

গুড় থেকে আমাদের আলোচনা রাজকীয় খানার দিকে ক্রমশ সরে যাচ্ছে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

একবার সাধকদের কথাও উঠলো। আমি বললাম, “শুনেছি সেন্ট জন

এক সময় মধুতে ফড়িং ডুবিয়ে স্রেফ সেই ফড়িং খেয়ে অনাড়ম্বর সাধক জীবনযাপন করতেন।”

ব্যান্ডোদা বললেন, “সব দেশেই সে সময় রাজা-মহারাজা, সুলতান শা এন শা, কিং কুইনরা সুখে থাকতেন এবং মনের আনন্দে ভোজন করতেন। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। ফরাসিরা তো রুটির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ইতিহাস নতুনভাবে লেখার চেষ্টায় নেমেছে।”

“ব্যান্ডোদা, ভোজনের মাধ্যমে মানুষকে যতোটা চেনা যায়, তা আর কোনওভাবেই জানা যায় না।”

“তুই বলছিস, বাঁচার লড়াই মানে অধিকাংশ সময়েই আহার-অনাহারের লড়াই! আমরা যদি এই সাবজেক্টে অনুসন্ধান চালাই? পারবি পরিশ্রম করতে?”

প্রফেসর রায় বলে বসলেন, “এদেশে পুরুষের ষড়দোষ—নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা।”

আমার আঁতে ঘা লাগলো। “শাস্ত্রকারদের কোনও সহায়তা প্রয়োজন নেই, আমাদের নিজস্ব লেখক কেদার বাঁড়ুজ্যে মশাই নিজে আত্মসমীক্ষা করে লিখে গিয়েছেন: আমরা হলাম বকুলগন্ধামোদিত কোকিলডাকা ছায়াশীতল দেশের লোক— আমাদের ফুরফুরে হাওয়া, ভুরভুরে গন্ধ, ফিনফিনে কাপড়, মিনমিনে সুর, ফিকফিকে হাসি, ধুকধুকে বুক লইয়া কারবার।”

“তবু এই টিম যে কোনও গবেষণায় ডুবে থাকবে, উদ্ধার করবে বিস্মৃতির অতলে ডুবে থাকা মণিমাণিক্য।” ব্যান্ডোদা আমাদের নিরুৎসাহ হতে দেবেন না আজ কিছুতেই।

রণনীতি ও কর্মপদ্ধতি ঠিক করে ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট হিসেবে ব্যান্ডোদা দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। তিনি বললেন, “প্রফেসর রায়, এখন সকাল সাড়ে ন'টা, আপনি লাইব্রেরিতে গিয়ে রাজা-মহারাজাদের নোলার খবরাখবর নিয়ে আসুন। আমি ইন্টারনেটে সায়েবদের নোলার খবরাখবর নিই।”

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যান্ডোদা বললেন, “ধৈর্য ধরে পড়াশোনা

তো কখনও তোর ধাতে আসে না। তুই তোর গুরুদেব শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সঙ্গে একটু ঠাকুর-স্বামীজি-সম্পর্কে কথাবার্তা বল। তারপর রান্নাঘরের খোঁজখবর নে, আমরা ঘড়ি দেখে দেড়টায় পিওর বেঙ্গলি মধ্যাহ্নভোজনপর্ব শুরু করবো।"

ব্যান্ডোদার নির্দেশিত মধ্যাহ্নভোজন প্রায় প্রস্তুত। প্রফেসর সর্বদমন রায় এখনও ফিরে আসেননি। গবেষক মানুষ, জ্ঞানের গন্ধ পেলে আহার নিদ্রার খেয়াল থাকে না।

ব্যান্ডোদা বললেন, "ভাল রান্নার সূত্রপাত যে চীনারা করেছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। পিকিং গুহা থেকে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, চীনা পূর্বপুরুষরা পাঁচলাখ বছর আগে আগুন জ্বালিয়ে মাংস রোস্ট করতেন। জলে সেদ্ধর ব্যাপারটা অনেক পরে এসেছে। কারণ পোড়ামাটির পাত্রে জল গরম করার কায়দা শিখতে মানুষের বহু শতাব্দী লেগে গিয়েছে। মাটির হাঁড়ির বয়স মাত্র সাত হাজার বছর! তেমনি মাংস দিয়ে শুরু হলেও, মানুষের পাতে মাছ পড়তে অনেক বেশি সময় লেগেছে।"

ব্যান্ডোদা প্রাচীনযুগের মানুষের খানাপিনার অনেক খবর তিলে তিলে সংগ্রহ করেছেন। যেমন আদিযুগের মানুষ ফলমূল খেয়ে প্রথমে জীবন ধারণ করেছেন। তারপর পশুপাখি হনন করে কাঁচাখেকো হয়েছেন। রান্নার প্রক্রিয়ার সর্বাগ্রে রয়েছে রোস্ট অথবা ঝলসানো। যে অনুসন্ধানী মানুষ এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন করেছিলেন তাঁর নাম জানা থাকলে বহু দেশে সেই নামে রাস্তাঘাট তৈরি হতো।

ব্যান্ডোদা বললেন, "মোদ্দা কথাটা হলো, টেন থাউজেন্ড বি সি পর্যন্ত জঙ্গলের আইনকেই মানুষেরা আইন মেনে নিয়েছে। মনে রাখতে হবে, তখন সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা মাত্র তিরিশ লাখ, অর্থাৎ কলকাতার জনসংখ্যার সিকিভাগ। আরও সাত হাজার পরে তিন হাজার বি সি-তে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়ালো এক কোটি। মানুষ কিন্তু তখনও ক্ষণজীবী—অর্ধেক জনসংখ্যা কুড়ি বছরেই ফাঁক, চল্লিশ বছর কেউ বাঁচলে তো ভীষণ ব্যাপার!"

আদিযুগের মানুষের রুচি অরুচি সম্বন্ধে যতটুকু আন্দাজ করা যাচ্ছে তার থেকে বলা যায়, বন্যকুক্কুটকে গৃহপালিত পক্ষীতে রূপান্তরিত করার ক্রেডিট ইন্ডিয়ায়। হরপ্পার জাংগ্‌ল ফাউলই যে পরবর্তীকালে দুনিয়ার চিকেন হয়েছে, এ খবরটা সুযোগ পেলেই সায়েবদের শুনিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ ওদের ধারণা, আমেরিকার ব্রয়লার মুরগীই ইন্ডিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

হরপ্পাকে হারিয়ে আর্যরা ক্ষমতা কব্জা করলেন আনুমানিক ১৭৫০ বি সি-তে। তখন দেখা যাচ্ছে, আর্যদের খাবার ভেড়ার মাংস, গোমাংস, দুধ এবং দই। তখনও রান্নার মাধ্যম হিসেবে তেলের খোঁজ পাননি আর্যরা—ওঁদের একমাত্র কুকিং মিডিয়াম ঘি।

থার্ড সেনচুরি বি সি, অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্মের তিনশো বছর আগে রাজা বিন্দুসারের (বিম্বিসার) রুচি-অরুচির কিছু পরিচয় পাচ্ছি আমরা গ্রীক সূত্র ধরে। কারণ বিন্দুসার এক পত্র মাধ্যমে গ্রীসের কাছ থেকে চেয়ে পাঠাচ্ছেন দ্রাক্ষারস, কিছু ডুমুরজাতীয় ফল (ফিগ) এবং একজন দার্শনিক। গ্রীকরা সবিনয়ে জানালেন গ্রেপ সিরাপ এবং ফিগ পাঠাবেন তাঁরা সানন্দে। দার্শনিক বিনিময়ের ব্যবসা কিন্তু স্থানীয় আইনের বিরোধী।

"বোঝ তা হলে, গ্রীকরা তাঁদের দার্শনিকদের কতো মূল্য দিতেন, কোনও কারণেই বিদেশে দার্শনিক পাঠাতে অর্থাৎ ব্রেন-ড্রেন করতে তাঁরা রাজী নন।" বললেন ব্যান্ডোদা।

ভারতের খাদ্যাখাদ্যের গুণগানে মুখর হতে উঠলেন ব্যান্ডোদা। অন্যসব দেশের অবস্থা যখন শোচনীয় তখন ফার্স্ট মিলেনিয়াম এ ডি-তে ভারতীয়রা দিনে দু'বার লাঞ্চ-ডিনার উপভোগ করছেন। সায়ান্সের আদিভূমি তো, তাই সবকিছুই মাপা! তখন এদেশে প্রতিবার ভোজনের মাত্রা বত্রিশ গ্রাস। ওই যে গ্রাসাচ্ছাদন কথাটা এখনও শোনা যায়! প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বলে গিয়েছেন, উদরের চারটি প্রকোষ্ঠ! এর দুটি বোঝাই করতে হবে খাবার দিয়ে, একটি পানীয় দিয়ে এবং চতুর্থটি খালি রাখতে হবে অবাধ বায়ু চলাচলের জন্যে!

"দাদা, ওই সময়ে আমাদের পিতৃপুরুষরা কী ভোজন করতেন?"

বিরক্ত হলেন না ব্যান্ডোদা। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট থেকে তিনি বিস্তারিত বিবরণ নোট করে এনেছেন। "লিখে নে। প্রথমেই ক্ষুধাবর্ধক আদাকুচি এবং সেইসঙ্গে একটু নুন। এবার গরম ভাত, গরম মাখন এবং ডাল, এরপর ঘিয়ে ভাজা পিঠে ইত্যাদি এবং লাস্ট আইটেম আখের কুচি।"

তবে এই মেনু যাঁরা ভেজিটারিয়ান তাঁদের জন্যে। ইদানীং সায়েবরা তৎকালীন পৃথিবীতে ভারতবর্ষ, চীন এবং ইউরোপীয় খাদ্যের তুলনামূলক আলোচনা করে ইন্ডিয়াকেই ফার্স্ট প্রাইজ দিয়েছেন। কারণ, চীনারা কয়েকটা পদে আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিলেও, দুগ্ধজাত খাদ্যে একেবারে ফেল, গোপালনে চীনাদের কখনও মন বসেনি। অন্যদিকে সায়েবরা ফলের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। ওঁদের টেবিলে মাছ মাংস দুগ্ধজাত দ্রব্য আছে, কিন্তু ফলের দেখা নেই। একমাত্র এই ইন্ডিয়ায় খাবার থালায় তিনরকম খাবারের দুর্জয় উপস্থিতি।

"সায়েবদের আদিযুগে মস্ত ডাক্তার গ্যালেনের নাম শুনেছিস নিশ্চয়। ওঁদের চরক! ইনি সারাজীবন বলে গেলেন, ফল খেয়ো না। ফল খেলে আমাশয় অনিবার্য। প্রাতঃস্মরণীয় এই চিকিৎসাবিজ্ঞানী আরও বললেন, আমার পিতৃদেব যে শতায়ু হয়েছেন তার একমাত্র কারণ তিনি সারাজীবনে কখনও ফল মুখে দেননি।"

সত্যি কথাটা হলো, এই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে মন দেওয়ার মতন সভ্যতা গড়ে তুলতে সায়েবদের অনেক সময় লেগেছে। চীনারা এই সাবজেক্টে কয়েক মাইল এগিয়ে। একাদশ শতাব্দীতেই বিখ্যাত এক চীনা চিকিৎসক প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন : যেসব ডাক্তার রোগ সারান তাঁদের স্থান যেসব ডাক্তার রোগ প্রতিরোধ করেন তাঁদের থেকে অনেক উঁচুতে। আবার, যাঁরা ওষুধপত্র দেন তাঁরা যাঁরা খাবারের তালিকা বেঁধে দেন তাঁদের থেকে নিকৃষ্ট!

অর্থাৎ সুপরিকল্পিত ডায়েটের জয় সারা এশিয়ায়। আমরা দেখছি হরাপ্পার যুগেও ইন্ডিয়ানরা গম, বার্লি, ডাল ব্যবহার করছেন, রান্না হচ্ছে তিল তেলে, গম থেকে আটা তৈরির ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে মশলা বাটার সুবন্দোবস্ত। ফলের মধ্যে রয়েছে তরমুজ, খেজুর, নারকোল, কলা, বেদানা

এবং লেবু। গৃহপালিত জীবের মধ্যে রয়েছে ভেড়া, ছাগল, মোষ, শূয়োর এটসেটরা।

আমি বললাম, "রায়সায়েব থাকলে আর্যদের ব্যাপার-স্যাপার স্পষ্টভাবে জানা যেতো!"

ব্যান্ডোদা বললেন, "সর্বদমনবাবু যতই আর্যবন্দনা করুন, আর্যরা অনেক খাবারের নাম এদেশের আদিবাসী মুণ্ডাদের কাছ থেকে টুকলিফাই করেছিলেন। যেমন মসুর (ডাল), মুগ ডাল (মুদগ), সরষে (সর্ষপ) এবং তিল। তেমনি, যোম মানে ছিল খাওয়া—তার থেকে চোখ-লা—তার থেকে চাউল—চাল!"

সব ব্যাপারেই ঘুরেফিরে চীনের প্রশস্তি—মেজাজটা বিগড়ে যায়। ব্যান্ডোদা বললেন, "ইন্টারনেট তাই বলছে, আমি কী করবো? ভাবলাম পোলট্রিতে চীনারা পিছিয়ে আছে। ওমা! ইউরোপ মুরগি এবং ডিমের স্বাদ নেবার এক হাজার বছর আগে থেকে (১৫০০ বি সি) চীনেরা মনের আনন্দে ফাউল খাচ্ছেন!"

সর্বদমনবাবুও মনের আনন্দে খোঁজখবর নিয়ে ফিরে এসেছেন। বুফে স্টাইলে ইতিমধ্যে বাংলা ডিশ এগিয়ে দেওয়ায় তিনি ব্যান্ডোদার ওপর তেমন খুশি হলেন না!

বললেন, "ব্যান্ডোবাবু, প্রাচীন ভারতে শুয়ে অথবা দাঁড়িয়ে ভোজনে নিষেধাজ্ঞা ছিল। খেতে খেতে ঘোরা অপছন্দ ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের। নিয়ম ছিল মাটিতে বসে, হয় পূর্বদিকে অথবা উত্তর দিকে, একটিও কথা না বলে, সম্পূর্ণ নীরবে ভোজন-পর্ব সম্পন্ন করতে হবে।"

অতএব খাওয়া-দাওয়ার সময় শাস্ত্রীয় স্তব্ধতা পালন করে, খাওয়ার পরে আবার আমাদের আলোচনা শুরু হলো।

ব্যান্ডোদার অনুরোধে সর্বদমন জানালেন, "প্রাচীন ভারতে অন্তত সাতরকমভাবে মাংস তৈরি করা যেতো। টক মাংস থেকে শুঁটকি মাংস—কিছুই বাদ যেতো না। সেকেন্ড সেঞ্চুরিতেই যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে আমরা পোলাও-এর উল্লেখ পাচ্ছি—সুতরাং এটি কোনওক্রমেই সুলতানী আমলের আমদানি নয়! রামায়ণে আমরা দেখছি, দণ্ডকারণ্যে রাম-সীতা-

লক্ষ্মণ মনের সুখে খাওয়া-দাওয়া করছেন। সীতার প্রিয় ডিশের নাম মাংসভূতাদনা—আসলে সবজি, হরিণের মাংস, চাল ও মশলার সংমিশ্রণে তৈরি একধরনের বিরিয়ানি! এটাও মনে রাখবেন, ভারতীয়রা বহুশতবছর ফলের রসসহকারে মাংস রাঁধতেন। এঁদের আর একটা প্রিয় ডিশ—পিষ্টউদন। নাম শুনে ঘাবড়াবেন না, আসলে কিমা কারি উইথ রাইস!"

"রন্তিদেব নামটা শুনেছেন?" জিজ্ঞেস করলেন সর্বদমন। "আমার এক বন্ধু ছিলেন রন্তিদেব, অত্যন্ত কিপটে।"

এবার অন্য এক রন্তিদেবের গল্প বললেন সর্বদমন, খোদ মহাভারতের শান্তিপর্ব থেকে। বহুযজ্ঞকারী এই বিখ্যাত রাজা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেন, তাঁর গৃহে যেন প্রচুর অতিথির আগমন হয় এবং তিনি যেন সবসময় শ্রদ্ধাবান থাকেন। রন্তিদেবের গৃহে এতো অতিথি আসতো যে, দু'লক্ষ পাচককে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হতো। প্রতিদিন একুশ হাজার পশু বধ করেও মাংসের সংকুলান হতো না।

সর্বদমন বললেন, "স্বামী বিবেকানন্দ নিরোর পরবর্তী এক রোম সম্রাটের কথা বলেছেন, যিনি রান্নাঘরেই বেশি সময় কাটাতেন ; খাবার জন্যে আসাম থেকে ময়নাপাখি এবং উত্তর ভারত থেকে ময়ূর নিয়ে যেতেন। ময়নাপাখির মাথার ঘিলুর সঙ্গে দুধ মিশিয়ে তিনি তাঁর প্রিয় স্যুপ তৈরি করতেন। কিন্তু শুনুন, আমাদের রাজারা শুধু খেতেন না, রান্না সম্বন্ধে মহামূল্যবান গ্রন্থও লিখে গিয়েছেন। মধ্যভারতে কল্যাণের রাজা সোমেশ্বর যে বই লিখেছিলেন, তার নাম 'মানসোল্লাস'। কেলাদির বাসবরাজ যে বই লিখেছিলেন, তার নাম 'শিবতত্ত্বরত্নাকর'। সোমেশ্বরের বইয়ের আর এক নাম : অভিলাষিতার্থচিন্তামণি! একটি চ্যাপাটারের নাম অন্নভোগ! সোমেশ্বর বলছেন, যদিও মাটির পাত্রে পরিবেশিত খাবারের স্বাদ উন্নততর, তবুও রাজাকে স্বর্ণপাত্রে ভোজন করতে হবে।"

আরও খবর পাওয়া গেলো। রাজা সোমেশ্বর অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ইডলি ধোসার বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চালের উল্লেখ না করে ডালের বর্ণনা দিয়েছেন। ভাদিত্রক বলে এক ধরনের কাবাব প্রস্তুতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। বেগুনের মধ্যে বাটা মাংস ঢুকিয়ে তিনি 'পুরভট্টক' প্রস্তুতের

পরামর্শ দিয়েছেন।

এই সোমেশ্বরই বোধহয় বিশ্বের প্রথম ছানার সৃষ্টি করেছিলেন যা পরবর্তীকালে বাঙালির হাতে পড়ে সন্দেশ-রসগোল্লায় পরিণত হলো! ময়দার সঙ্গে ছানা মিশিয়ে যে খাবারের রেসিপি সোমেশ্বর দিয়েছেন, তার নাম ক্ষীরপ্রকার। ময়ূরের ডিমের আকার দিলে তার নাম হতো মোরেন্তক। এই ক্ষণজন্মা সম্রাটই বাঙালির মিষ্টান্নযাত্রার পথপ্রদর্শক।

সোমেশ্বরের আরও কয়েকটি যুগান্তকারী সৃষ্টি হলো—কসার ও ঘৃতপুরা। ঘিয়ে ভাজা খজ্জিকা—যা আধুনিক যুগের খাজা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক লিখেছেন। রাজা সোমেশ্বরের আর একটি প্রিয় মিষ্টান্ন লাড্ডুকা, যার অপর নাম মোদক। এই যে রথের সময় চিনির পুতুল মফস্বলের ছেলেমেয়েদের কাছে আজও জনপ্রিয় হয়ে আছে, তারও সৃষ্টি এই যুগে, নাম শর্করিপুত্রিকা!

এরপর সর্বদমন এক শাকাহারী রাজার মধ্যাহ্নভোজন বর্ণনা করলেন। প্রথমেই ছোলার চাকতি। নাম কাড়ুবু। তারপর সুন্দরী সেবিকা রাজার পাতে তুলে দিলেন বেগুনভাজি (প্রাচীনকালে বেগুনের নাম ছিল বৃন্তক)। সেই সঙ্গে নারকোল কোরা, লেবুর রস এবং কর্পূর। পাশে থাকবে তেঁতুলের চাটনি এবং নানাবিধ আচার। এর পরেই পাঁপড়। রাজা খেতেন মেঝেতে বসে, কলার পাতায়।

এই মেনুতে ব্যান্ডোদা উৎসাহিত বোধ করছেন না। এই মেনুর জন্যে রাজা হবার হাজার হাঙ্গামায় যাওয়া কেন?

সর্বদমন রায় খবর দিলেন, "রাজকীয় রান্নাঘরের আয়তন সম্বন্ধেও নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন বাসবরাজা—৩২ ফুট বাই ৮ ফুট। ঘরের সঙ্গে চিমনি থাকা আবশ্যিক। রান্নাঘরের পূর্ব দিকে থাকবে উনুনের সারি, দক্ষিণে থাকবে জ্বালানি কাঠ। জলের জালা রাখা হবে পশ্চিম দিকে এবং দক্ষিণ দিকে থাকবে কুলো এবং ঝাঁটা ইত্যাদি।"

এবার শুনুন রাজভোজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। রাজা বসবেন স্বর্ণখচিত পিঁড়িতে, যার নাম ভোজনপিঠ। পূর্বমুখী হলে রাজার দীর্ঘায়ু, দক্ষিণমুখী হলে খ্যাতি, পশ্চিমমুখী হলে স্বাস্থ্য ও সম্পদ এবং উত্তরমুখী হলে

সত্যবাদিতা।

"তার মানে, যে মুখোই হন রাজার সমৃদ্ধি অনিবার্য!"

"আঃ, ডিস্টার্ব করিস না!" ব্যান্ডোদা আমাকে ভর্ৎসনা করে সর্বদমন রায়কে উৎসাহ দিলেন।

রাজা অবশ্যই স্বর্ণপাত্র থেকে ভোজন করবেন। তাঁর পানীয় ও ভোজ্য থাকবে থালার বাঁদিকে, থালার মধ্যিখানে ভাত এবং তার দক্ষিণে সবজি। প্রথমেই মিষ্টান্ন পরিবেশন হবে, তারপর টকের আগমন, এরপর লবণাক্ত খাদ্য এবং সর্বশেষে তিক্ত ও কষায়।

ভাত কিন্তু এক রকমের নয়—অন্তত আটরকম চালের নাম সর্বদমনবাবুর জানা আছে। এরপর ডাল—বহু রকমের। এর নাম স্যুপ। এরপর ছ'রকমের শাক-সবজি। তারপর দুধের বিভিন্ন আইটেম—কীরকম ফুটনো হয়েছে এবং ঘনত্ব অনুযায়ী পানপাক, লেহ্যপাক, ঘুটিপাক এবং শর্করাপাক। শেষোক্ত আইটেমের বর্তমান নাম খোয়া! এর সঙ্গে মিশ্রিত হতো নানারকম ফুল ও ফলের আঘ্রাণ। চিনির রস থাকতো চার রকম—মৃদু, মধ্যম, খর ও সারিকা। রাজভোজের সময় ন'রকমের পানীয় জল প্রস্তুত থাকতো, যার এক একটিতে মেশানো থাকতো এক এক রকম চূর্ণ। খাবার শেষে আসতো টুথপিক—নাম ছিল ঘুটিকা। টুথব্রাশটা আমাদের ব্রেনে ঢোকেনি, উদ্ভাবনের কৃতিত্ব চীনের।

রাজকীয়, কিন্তু ইমপ্রেসিভ নয়! ব্যান্ডোদার মুখ দেখেই খানা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

প্রফেসর সর্বদমন রায় আমার ইঙ্গিতে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। দক্ষিণের মানুষরা যেমন হিসেবী, রাজারাও তেমনি। "এবার উত্তর ভারতের নমুনা। রাজা শ্রেণিক একবার ভবিষ্য নামে এক অনুরাগীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম পদেই পরিবেশন করা হলো ফল, যেমন বেদানা, ডালিম, আঙুর—যেসব ফল চর্বণ করা যায়। তারপর চূষ্য—যেমন আখের কুচি, কমলালেবু, আঁব (আম কথাটা ঠিক নয়।)। তারপর লেহ্য ফল, চতুর্থ পর্বে মিষ্টান্ন—সেবকা, মোদক, ফেনক ও ঘৃতপুরা। পঞ্চম পর্বে ভাত এবং ষষ্ঠ পর্বে নানারকম খাবার মিশিয়ে সেদ্ধ করা। এরপর রাজা হাত ধুয়ে

ফেললেন। পাত্র সব সরিয়ে ফেলা হলো। এরপর এলো গরম দুধ অথবা ক্ষীর, যার সঙ্গে মেশানো শর্করা, মধু ও জাফরান। অবশেষে সুগন্ধি চূর্ণ হাতে মেখে হাত ধুয়ে ফেলার পালা।”

সর্বদমন বললেন, “জেনে রাখবেন, প্রাচীন ভারতে রাবড়ি খুব প্রিয় ছিল রাজাদের। এর আদি নাম—ফেনি-পায়স। আরও দুটি প্রিয় মিষ্টান্নের নাম—ভোজনাধিক-রুটি ও মধুনল।”

সর্বদমন আরও জানালেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ভোজন সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু উল্লেখ পেয়েছি। তাঁর রান্নার দায়িত্বে থাকতেন রমণীরা। পরিবেশনায় থাকতেন সেরা সুন্দরীরা। শুধু ভোজ্য নয়, চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সুরাপানে দক্ষ। মদ্যপান করতে করতে নেশার ঘোরে তিনি প্রায় ঘুমিয়ে পড়তেন, সুন্দরীরা তখন তাঁকে চ্যাংদোলা করে শয়নমন্দিরে দিয়ে আসতেন রাতের বিশ্রামের জন্য।

এসব বিবরণ নীরবে হজম করছি আমরা। বৌদ্ধ যুগে শ্রমণদের অতি-সাধারণ খাওয়া-দাওয়ার কথা একবার কোনও বইতে পড়েছিলাম। সন্ন্যাসীরা একসঙ্গে সূর্যোদয় থেকে মধ্যদিনের মধ্যে আহারে বসতেন। প্রথমেই দেওয়া হতো দু'কুচো আদা আর নুন। তারপর সাদা ভাত ও তার সঙ্গে ঘি। এরপর দেওয়া হতো ফল এবং গুড়। এরপর এসে যেতো টুথপিক এবং হাতধোয়ার জল। পানীয় বলতে পরিবেশন হতো ঘোল অথবা ছানার জল।

রাজকীয় খানার ধারা অবশ্য অব্যাহত ছিল শত শত বর্ষ ধরে। বিজয়নগরের কিংবদন্তিতুল্য রাজার পানীয় জল পাহারা দিতো বিশ্বস্ত প্রহরীরা। এই জলের আধার তুলে দেওয়া হতো যে রমণীরা রাজার দেখাশোনা করবেন তাঁদের হাতে। রাজার রাঁধুনির সংখ্যা দশ জন—এঁরাই তাঁর ব্যক্তিগত শেফ। রাজ ব্যাংকোয়েটের জন্যে থাকতেন আরও অনেক রাঁধুনি। একজন খোজা প্রহরী রান্নাঘরের দ্বারে সারাক্ষণ পাহারা দেন। রাজার যখন খাবার ইচ্ছে হয় তখন উপস্থিত সবাই নিঃশব্দে সরে যান। সুন্দরী রমণীরা বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে স্বর্ণখচিত তেপায়া টুল বসিয়ে দেন। কোনও টেবিল ক্লথ বিছনো হতো না, কিন্তু খাওয়ার পরে হাত ধুয়ে হাত মোছবার জন্যে একটি বস্ত্রখণ্ড আনা হতো। খাবার সময় সমস্ত

খবরদারি করতেন সেবিকা রমণী ও খোজা প্রহরীরা। এই রাজাই স্বাস্থ্যের কারণে অনেকখানি তিল তেল পান করতেন, আবার তিল তেল রাজশরীরে মর্দনও করা হতো প্রতি প্রভাতে। তেল মাখা অবস্থায় তরোয়াল হাতে তিনি শরীরচর্চা করতেন। ঘামতে ঘামতে শরীরে মাখা তেল ঝরে না যাওয়া পর্যন্ত চলতো এই শরীরচর্চা।

এবার ব্যান্ডোদা কিছুক্ষণের জন্য ইন্ডিয়া ত্যাগ করে পশ্চিমে যেতে চাইলেন। ব্যান্ডোদা বললেন, "হিন্দু রাজারা ব্যাংকোয়েট ডেকে ইয়ারবন্ধুদের সঙ্গে খানাপিনায় মত্ত হতেন, এমন ছবি আমরা বেশি পাচ্ছি না। সেদিকে গুরুদেব ছিলেন রোমানরা। শুনেছি, রোমরাজ্যে ভাল রাঁধুনিদের বিশেষ সম্মান ছিল, ভাস্কর ও সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে একাসনে বসতেন তাঁরা। স্বয়ং জুলিয়াস সিজার উপস্থিত ছিলেন এমন এক ব্যাংকোয়েটের মেনু আজ উদ্ধার করেছি। ডিনার শুরু হবার আগে আসছে সি হেজহগ, টাটকা ঝিনুকের মাংস, বড় ঝিনুক, চর্বিওয়ালা মুরগি, ঝিনুকের বড়া, মাছের ডিম, ময়দায় মুড়ে চিকেন ভাজা, তারপর শুয়োরের স্তন, শুয়োরের বড়া, হাঁসের মাংস, খরগোশ, ফাউল রোস্ট এটসেটেরা এটসেটেরা।"

সম্রাট নিরোর আমলের ব্যাংকোয়েটকে কেন্দ্র করে এক ব্যঙ্গকাহিনী লেখা হয়েছিল। নায়কের নাম ত্রিমালশিও—প্রথম জীবনে ইনি ক্রীতদাস ছিলেন, তারপর বিজনেস করে প্রচুর অর্থের মালিক হন।

তাঁর পার্টিতে অতিথিদের প্রবেশ মাত্র বরফ জলে হাত ধুইয়ে দেওয়া হলো, তারপর ভৃত্যরা অতিথিদের পা ধুইয়ে নখ কেটে দিলো। তারপর একের পর এক সীমাহীন পদ। সেই সঙ্গে মদের ফোয়ারা। রুপোর পাত্রে নানা খাদ্যের বিচিত্র শোভাযাত্রা। যে পানীয় বিতরণ করা হচ্ছে তার বয়স অন্তত একশো বছর। মাঝে মাঝে ইথিওপিয়ান ভৃত্যরা আসছিলেন চামড়ার ব্যাগ থেকে মদ স্প্রে করে হাত ধুইয়ে দেবার জন্যে।

গৃহস্বামী যা-তা লোক নন। বাড়ির মধু পছন্দ না হওয়ায় তিনি দূর দেশ থেকে নতুন প্রজাতির মৌমাছি আমদানি করেছেন। শ্রেষ্ঠ মাশরুমের জন্যে তিনি চিঠি লিখেছেন ইন্ডিয়ায়।

ব্যান্ডোদা বললেন, "বোঝা যাচ্ছে মাশরুমের বাজারে এক সময় ভারতবর্ষের বিশেষ নামডাক ছিল।"

আরও বোঝা যাচ্ছে, ভোজনের ব্যাপারে রোমানরা যেভাবে মন দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে সেই সময় পৃথিবীর কেউ পাল্লা দিতে পারেনি। পরবর্তী যুগে ওঁদের কাছাকাছি এসেছিলেন ফরাসি সম্রাটরা, কিন্তু সে তো অন্য এক কাহিনী।

ভোজনের ব্যাপারে প্রথম যুগের রোমানদের যে খ্যাতি ছিল তা কোনও সময়ে নষ্ট হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকে একের পর এক ভ্রমণবিশারদ তাঁদের রোজনামচায় রোমের ভোজনব্যবস্থার নিন্দায় মুখর। রোমের আর্কিটেকচার, রোমের ইতিহাস মনে সম্ভ্রমের উদয় ঘটায়। কিন্তু রসনা পরিতৃপ্তির জন্য তো কেবল কাঁচা হ্যাম, বোলোনা সসেজ ও সঙ্গে আদা, লবঙ্গ ও দারুচিনি, সেই সঙ্গে ক্যামলিন সস। এই ক্যামলিন সস তৈরি হতো আদা, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ একসঙ্গে বেটে ভিনিগারে চুবিয়ে রাখা পাঁউরুটির সঙ্গে মেখে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রোমান খানায় আজকের সুবিন্যস্ত ছন্দের অভাব। এখন একটা পরম্পরা সৃষ্টি হয়েছে—স্যুপ, মাছ, মাংস এবং মিষ্টান্ন।

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকোয়েটের একটা নমুনা খাদ্যরসিকদের হস্তগত হয়েছে। স্বয়ং মহামান্য পোপ পঞ্চম পায়াস ১৫৭০ সালে ভোজ দিচ্ছেন। প্রথম কোর্সে ছিল ঠাণ্ডা খাবার—

টুকরো মারজিপ্যান ও মারজিপ্যানের গোল্লা
মশলা কেক
মলাগা ওয়াইন ও পিসা বিস্কুট
পেসট্রি ও সেই সঙ্গে দুধ ও ডিম
টাটকা আঙুর
স্প্যানিশ অলিভ
ওয়াইনে রান্না করা প্রসিডটো
নোনতা শূয়োরের জিভ
রোস্টেড পাখি

দ্বিতীয় কোর্সে কিচেন থেকে পাঠানো হয়েছিল হাতে গরম রোস্টের সমারোহ।

ফ্রায়েড গোরুর মাংস ও মেটে
রোস্টেড স্কাইলার্ক পাখি সঙ্গে লেমন সস
রোস্টেড তিতির
রোস্টেড পায়রা
রোস্টেড খরগোস
রোস্টেড পারট্রিজ
মাংসের কিমা দিয়ে বোঝাই পেসট্রি
তারপর ছাগলের দাবনা
অলমণ্ড ক্রিম স্যুপ
প্রতি দু'জন অতিথির জন্য তিনটি পায়রা

তৃতীয় ও চতুর্থ কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ছাড়াও মাননীয় ধর্মসাধকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মাবার আশঙ্কা। কারণ তৃতীয় কোর্সে ছিল সেদ্ধ করা খাবার ও স্টু-য়ের সুবিশাল তালিকা। শেষ পর্যায়ে মিষ্টান্নের বিপুল আয়োজন, যার মধ্যে মিষ্টি দইয়েরও উপস্থিতি রয়েছে।

রাজকীয় খাদ্যের রেওয়াজ একসময় ইতালি থেকে ফ্রান্সে হাজির হয়েছিল। যদিও ভেনিসের রাষ্ট্রদূত দুঃখ করছেন, ফরাসিরা বড়ই পেটুক। দিনের মধ্যে চারপাঁচবার খেয়ে খেয়ে এরা শরীরের বারোটা বাজায়, যেমন জার্মানরা সারাক্ষণ মদ্যপান করে লিভারের সর্বনাশ করছে।

এবার ব্যান্ডোদা একটা মজার খবর দিলেন। "জেনে রাখ, শুক্রবারে পশ্চিমে মাংস আহার ছিল নিষিদ্ধ। এই সেদিন পর্যন্ত খোদ ইংলন্ডে শুক্রবার মাংসাহার করলে প্রাণদণ্ডের লিখিত বিধান ছিল।"

"তা হলে সায়েবরা আমাদের নবমীতে লাউ খাওয়া নিষেধ নিয়ে হাসাহাসি করলো কী করে?"

"সময় খারাপ হলে এরকমই হয়। রাজার জাতের হাঁড়ির খবর কে আর রাখতে যাচ্ছে?"

১৫৭১ সালে অস্ট্রিয়ার রাজকুমারী এলিজাবেথ যেদিন প্যারিসে হাজির হচ্ছেন সেদিন শুক্রবার। রাজকীয় মেনু তৈরি করতে গিয়ে রাজকীয় রাঁধুনিরা ঘেমে উঠলেন। তারপর অবশ্য বিভিন্ন মাছের অবিস্মরণীয় আয়োজন হলো। যার মধ্যে রয়েছে :

চারটি টাটকা স্যালমন
দশটা বড় টার্বাট
আঠারোটা করে ব্রিল, মুলে ও গুণার্ড
পঞ্চাশটি কাঁকড়া
আঠারোটা ট্রাউট
ন'টা বড় এবং আটটা ছোট পাইক
ন'টা টাটকা শ্যাড
তিনটে ক্রিল
অনেক শামুক
দুশোটা তেল হেরিং, এবং সমপরিমাণ ভাপা হেরিং
বারোটা গলদা চিংড়ি
চব্বিশ রকম স্যালমন
পঞ্চাশ পাউন্ড তিমি

লিস্টির এখানেই শেষ নয়। আরও আছে কড, ল্যামপ্রে, ক্রে, রুই এবং অবশ্যই হাজার হাজার ব্যাং। রাঁধুনিদের ভীষণ লজ্জা, তাঁরা ব্রিম, কচ্ছপ এবং তাজা ম্যাকেরেল জোগাড় করতে পারেননি বলে!

রোমান ভোজনবিলাসে মন না দিয়ে ব্যাণ্ডোদা আবার ভারতে ফিরতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

প্রফেসর সর্বদমন রায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে কয়েকটা বই ঘেঁটে সেই কাজই করে এসেছেন। তাঁর দুঃখ, হিন্দু যুগের খবরাখবর সে যুগের রাজা-মহারাজারা অতো যত্নের সঙ্গে রক্ষে করে যাননি, যতো রেখেছেন সুলতানরা এবং মোগল সম্রাটরা। তার ওপর এই পর্বে যেসব বিদেশী ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, তাঁরাও চমৎকার সব ভ্রমণবৃত্তান্ত অনাগত

কালের জন্যে রেখে গিয়েছেন।

প্রফেসর রায় বললেন, "সুলতানরা অনেক যুগান্তকারী কাজ করে গিয়েছিলেন যা আমাদের জনদরদী সরকাররা এযুগে নকল করে বাহ্‌বা নিয়েছেন। যেমন ধরুন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য। পথপ্রদর্শক স্বয়ং আলাউদ্দীন খলজি—তিনি ছ'টি পণ্যের উচ্চতম দাম বেঁধে দিয়েছিলেন যাতে ব্যবসায়ীরা অত্যধিক মুনাফা না করতে পারে।"

"আর পাগলা সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক, যাঁকে নিয়ে এখনও সুযোগ পেলে হাসাহাসি হয়, তিনি দুর্ভিক্ষের সময় দিল্লিতে সব নাগরিককে মাথাপিছু দৈনন্দিন ৬৭৫ গ্রাম খাবার বিনামূল্যে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মনে রাখবেন, একদিনের দানমাত্র নয়, এই বিতরণ ব্যবস্থা হয়েছিল পাকা ছ'মাসের জন্যে। প্রজাদের খাবারের ব্যবস্থা করে কেউ যদি নিজের জন্যে একটু রাজভোগের ব্যবস্থা করেন, তা হলে দোষ দিতে পারেন না।"

কথা না বাড়িয়ে আমরা অধ্যাপক রায়ের সঙ্গে একমত হচ্ছি। ব্যান্ডোদা বললেন, "মুখুজ্যে, যতই তুই বইপত্তর খুলে হিন্দু যুগের পলাণ্ডুর কথা বলিস, মুসলমানরা এদেশে না এলে পোলাও, কাবাব, সামোসা, এটসেটরা খেয়ে সুখ পাওয়া যেতো না।"

"সামোসা ব্যাপারটা আমার কাছে একটু অস্পষ্ট, সিঙাড়া জিনিসটারই সুলতানী নাম।"

প্রফেসর রায় বললেন, "না মশাই, শুধু সিঙাড়া নয়—পুর দেওয়া জিনিসকে সামোসা বলা হতো, হিন্দুরাও বানিয়েছে, কিন্তু জুৎ করতে পারেনি। যেমন হালুয়া, ফালুদা এবং সরবৎ। যার যা বিশেষত্ব মশাই—খাবার টেবিলে বসে কোনও এক সম্প্রদায়ের কোলে ঝোল টেনে লাভ নেই। আজ যে খানা খেয়ে আমরা তৃপ্তি পাচ্ছি, তাতে হিন্দু বৌদ্ধ শক হুন পাঠান মোগল চীনে জাপানি ইংরেজ ফরাসি হাঙ্গারিয়ান—সবাই কিছু না কিছু দিয়েছে। আমার সন্দেহ, ভারততীর্থ কবিতায় 'সবার পরশে পবিত্র করা' লাইনটি ভোজনরসিক রবীন্দ্রনাথের অবদান। সভ্যতার সহজ মিলন ডাইনিং টেবিলে যতোটা সম্ভব হয়েছে, তা আর কোথাও হয়নি।"

এবার শোনা গেলো এক সুলতানী খানাপিনার বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর কলমে। লেখক স্বয়ং ইবন বতুতা—এই ভদ্রলোক ২৯ বছর ভারতবর্ষে থেকে বহু পরিশ্রমে তাঁর দিনলিপি রচনা করেছিলেন। ভ্রমণকাল ১৩২৬-১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ।

এবার নবাবী আমলে আসা যাক। ডিনারপর্বের শুরুতে সুলতানের আমির হাজির (হিন্দু যুগে বলা হতো কঞ্চুকী) বড় একটা কার্পেটের সামনে দাঁড়িয়ে সুলতানের প্রতি নতজানু হবেন। এর নাম খিদমত—এবার বুঝছেন খিদমতগার কথাটা কোথা থেকে হাজির হয়েছে। এরপর অভ্যাগত অতিথিরা ডিনার কার্পেটের ওপর বসে পড়লেন। এবং রুপো এবং কাচের পাত্রে এলো মিষ্টি সুগন্ধী জল, যার নাম সরবৎ। সরবৎ পর্বের পর সেরকার উঁচুগলায় বিসমিল্লা বললেন। শুরু হলো খানা। ডিনারের শেষে রুপোর জগে করে বার্লিজল এলো যার নাম ফুক্কা। তারপর পান-সুপারি। শেষে আবার বিসমিল্লা।

সুলতানী খানা শুধু সুখাদ্য গলাধঃকরণের জন্যে নয়। সেখানে থাকতো নানারকম প্রটোকলের আইনকানুন, অতিথিরা যে যেখানে বসে পড়বেন, তা সম্ভব নয়। ভোজনকার্পেটের প্রথম সারিতে বসবার অধিকারী কাজী (বিচারক), খাতিব (বক্তা), শোর্ফা (আইনজ্ঞ), সৈয়দ এবং দরবেশ (মাশেখ)। এরপর বসবেন সুলতানের আত্মীয়স্বজন এবং হোমরাচোমরা আমীররা। সবাই জানেন কে কোথায় বসবার অধিকারী। বসা সম্পূর্ণ হলে শর্বদরিয়া অথবা পানীয়বিতরণকারীরা সোনা-রুপো-তামা ও কাচের পানপাত্র নিয়ে হাজির হবেন ভোজনকক্ষে। এরপর হুজ্জব বিসমিল্লা বলবেন। সুলতানী খানায় সবাই আলাদা আলাদা নিজস্ব পাত্র থেকে ভোজন করবেন। একই পাত্র থেকে বহুজনে খানা তুলে নেবেন না।

এখন প্রশ্ন, ডিনার মানে সুলতানী আমলে সান্ধ্যভোজ নয়। ইলেকট্রিক না থাকায় রাতের অনুষ্ঠান একটু কমের দিকে। সুলতানী ডিনারের দু'টি সময়—দুপুরের আগে অথবা অপরাহ্ণে।

সুলতানী ডিনার দু'রকমের—রাষ্ট্রীয় ভোজসভা এবং কোনও বিশিষ্ট বহিরাগতের জন্যে সুলতানের বিশেষ ভোজ। রাষ্ট্রীয় ভোজসভায়

সুলতানের সঙ্গে থাকবেন হেড চেম্বারলেন (আমীর হাজিব), এবং অনুষ্ঠান পরিচালক আমীর-ই-মজলিশ! সুলতান যদি কোনও আমীরকে একটু বেশি খাতির করতে চান, তা হলে একটি প্লেটে একখানি রুটি দিয়ে নিজে অতিথির দিকে এগিয়ে দেবেন। কৃপাধন্য অতিথি সবিনয়ে বাঁ হাতে প্লেটটি গ্রহণ করে নতজানু হয়ে ডান হাতে ভূমিস্পর্শ করবে। ইবন বতুতা বলছেন, এইসব রাষ্ট্রীয় ভোজে জনা কুড়ি অতিথি নিমন্ত্রিত হতেন।

সুলতানের কিচেন থেকে প্যালেসের প্রধান অফিসারের নেতৃত্বে যখন খাবার আসবে, তখন তিনি সোনার রাজদণ্ড ধরে থাকবেন। তাঁর ডেপুটিও একটি রাজদণ্ড ধারণ করবেন। তবে সেটি রুপোর তৈরি। এঁদের শোভাযাত্রা যখন সভাগৃহের কাছাকাছি উপস্থিত হয়েছে, তখন সমস্ত অভ্যাগত উঠে দাঁড়াবেন, কেবল সুলতান বসে থাকবেন। এরপর যখন ডিশ পরিবেশন শুরু হবে, তখন প্রধান অফিসার একটি বক্তৃতা শুরু করবেন—এই বক্তৃতায় সুলতানের প্রশস্তি থাকবে এবং তারপর এই অফিসার এবং উপস্থিত সবাই সুলতানের প্রতি নতজানু হবেন। প্রথা ছিল, প্রধান অফিসার (নকিব-উন-নকবার) প্রশস্তি শুরু হওয়ামাত্র যে যেখানে আছে সে সেইখানে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

ব্যাভোদা বললেন, "একবার কলকাতার রাজভবনে প্রজাতন্ত্র দিবসে দৃশ্যটা দেখেছি—যেমনি জাতীয় সঙ্গীত শুরু হয়ে গেলো, অমনি সবাই যে যা অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় পাথরপ্রতিম! আজকাল তোরা যাকে বলিস নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু—এই ধারা সুলতানী আমল থেকেই বয়ে আসছে।"

এক সুলতানী বন্দনায় রাষ্ট্রীয় খানা শেষ হতো না। নকিব-উন-নকবার ডেপুটিও একটি নাতিদীর্ঘ স্পিচ দেবেন এবং সবাইকে নতমস্তকে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তা শুনতে হবে। এরপর বসে পড়বার পালা। এই সময় সুলতান জানেন খাবার এসে গিয়েছে। তবু প্রটোকল অনুযায়ী তাঁর এক কর্মচারী লিখিতভাবে সুলতানের জন্যে রিপোর্ট তৈরি করবেন—খানা ইজ রেডি! অভিজাত পরিবারের একটি বালক এই রিপোর্টটি সুলতানের কাছে নিয়ে আসবে, সুলতান সেটি পাঠ করে, উপস্থিত আমীরদের মধ্যে একজন

সিনিয়র আমীরকে দায়িত্ব দেবেন অভ্যাগতদের বসিয়ে তাঁদের খানাপিনার তদারকি করতে।

মুহম্মদ বিন তুঘলক একবার বিদেশ থেকে আগত জজ সায়েবের সম্মানে ডিনার দিয়েছিলেন। এই ডিনারের সুব্যবস্থার জন্যে সুলতানের আমীর-ই-হাজিব খোদ মুলতান থেকে কুড়িজন বাবুর্চি সংগ্রহ করলেন।

ব্যান্ডোদার সংযোজন : "বোঝা যাচ্ছে মুলতানের রান্নাবান্নার সুনাম ছিল। বাংলায় আমরা কেবল মুলতানী গাইয়ের কথাই শুনেছি।"

প্রফেসর রায় বললেন, "মনে করুন, এই ভোজসভায় আপনিও ইনভাইটেড হয়েছেন। তা হলে আপনার প্লেটে প্রথম পড়লো খুব পাতলা রুটি। বোকার মতন ভেবে বসবেন না এটি রুমালি রোটি। চুপি চুপি পাশে বসা আমীরকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন এর নাম 'খুবি'। এরপর ঝলসানো মাটন রোস্ট! এই ভেড়ার মাংসের যে অংশটি আপনার প্লেটে পড়লো তার সাইজ? মনে রাখবেন, সুলতানী ভোজসভায় একটি ভেড়াকে চার টুকরো, বড় জোর ছ'টুকরোর বেশি করলে রাজসম্মান থাকে না! এরপর আসবে ঘি মাখানো নরম তুলতুলে মোটা রুটি। মাটন রোস্টের সঙ্গে অনুপান হিসেবে একটি বিশেষ ধরনের মিষ্টি, নাম সুবুনিয়া। এতে থাকে বাদাম, মধু এবং তিল তেল। বুঝতেই পারছেন, আর্য-অনার্য শক হুন পাঠান ইংরেজ—যেই আসুক, এদেশে সেই মধুভক্ত হয়ে ওঠে। রুটির ওপর একটা ঘিয়েভাজা ময়দার মিষ্টি। ইবন বতুতা একে খিস্তি বলেছেন।"

"তা হলে খিস্তিটা গালাগালি নয়, মিষ্টির নাম," আমি পুলকিত হয়ে বলে উঠি।

"পুলকিত হবার কিছু নেই," বকুনি লাগালেন ব্যান্ডোদা।" "কথাটা হয়তো খাস্তা।"

"হোয়াট ইজ খাস্তা?"

সর্বদমন একটু বিরক্ত হলেন। "এইসব এ বি সি ডি না জেনে মোগলাই খানা সম্পর্কে গবেষণা করা কেন? খাস্তা হচ্ছে বেশি ময়ান দেওয়া যা অল্পচাপেই ভেঙে যায়। মুড়মুড়ে বলতে পারেন।"

খিস্তির পরে আপনার প্লেটে আসবে বিভিন্ন মাংস যাতে ঘি চপচপ

করছে। এতে আরও আছে, পিঁয়াজ এবং কাঁচা আদা। এই পদটি পরিবেশন করা হচ্ছে চীনামাটির পাত্রে। পরবর্তী ডিশের জন্যে প্রস্তুত থাকুন।

রুটির মধ্যে পিঁয়াজ, মশলা, বাদাম, পেস্তা-সহ কিমা। ঘিয়ে ভাজা এই আইটেমের নাম সমুসক। আপনার এবং প্রত্যেক অতিথির সামনে প্লেটে অন্তত পাঁচটি সমুসক থাকবে। এখনই কিন্তু হাত গুটিয়ে নেবেন না। পরবর্তী আইটেম এলো বলে—পিলাও এবং মুর্গামসাল্লাম। পিলাওয়ের ওপর এই রোস্টেড ফাউলটি বসানো থাকবে। এর পরে পাবেন মিষ্টি, নাম হাসিমি। নামটা চেনাচেনা মনে হচ্ছে, এই ভাবতে ভাবতেই আপনার জন্যে আর একটা মিষ্টি এসে যাবে। এর নাম আল-কাহিরিয়া। এক ধরনের ক্ষীরের পুডিং বলতে পারেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসর রায় বললেন, "বইতে যা পেলাম, পান-সুপুরি রাজকীয় মহলে বিশেষ জনপ্রিয় আইটেম। ভোজনের সময় হাতই ব্যবহার করা হতো। ছুরি-কাঁটার প্রচলন ছিল না। তবে মাংস কাটাকাটি ও পরিবেশনের জন্যে কাস্‌ক্ (চামচ) এবং কারাদ (ছুরি) ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল।"

এখন বিকেল চারটে। ব্যান্ডোদা বললেন, "সুলতানী আমলে ভোগসুখ ছিল, কিন্তু মোগলের কাছে তা কি? সুলতান যদি ২৫ ওয়াটের বাতি হয়, তা হলে মোগল সম্রাটের ওয়াট তো হাজার।"

মোগলাই খানার ব্যাপারে ব্যান্ডোদা বিশেষ আগ্রহী হবেন এতে আর আশ্চর্য কী?

আমি বললাম, "মোগলরা কী খেতেন, কতো খেতেন, তা আমার জানা নেই। কিন্তু তাঁরা যে খাওয়াতে ভালবাসতেন, সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

"কোন বইতে রেফারেন্স পেলেন?" জানতে চাইছেন প্রফেসর সর্বদমন রায়।

"বইপড়া বিদ্যে ওর বিশেষ নেই। ও বোধহয় লোকশ্রুতি থেকে বলছে—পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।"

এই খানা খেতে ভয় পেয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক কৃচ্ছ্রসাধন

এবং অনেক নির্মল আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছেন। আবার বলতে পারেন, খাওয়া-দাওয়ার বাতিক ছিল বলেই, অনেক বছরের ধাক্কা সহ্য করে তাঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষে করতে পারলেন।"

আবার বইপড়া জ্ঞান উপহার দিলেন অধ্যাপক সর্বদমন রায়। ফাদার মনসেরট বলেছেন, সম্রাট আকবরের ভোজে অন্তত চল্লিশ রকম পদের আয়োজন থাকতো। রয়াল ডাইনিং হলে এইসব খাবার পাতলা কাপড়ে মুড়ে নিয়ে আসা হতো। রান্নাঘর থেকে বেরুবার আগে বিষ মেশানোর আশঙ্কায় এইসব পাত্র সিল করে দেওয়া হতো। কমবয়সী ছেলেরা এইসব পাত্র ডাইনিং হলের দরজা পর্যন্ত বয়ে আনতো। তারপর খোজারা এই খাবারের দায়িত্ব নিতো। খোজারা কিন্তু ডাইনিং টেবিল পর্যন্ত যেতে পারতো না, সে কাজ ছিল সেবিকা সুন্দরীদের। সম্রাট একা একা আহার পছন্দ করতেন।

প্রফেসর রায় বললেন, "শুনুন মশাই, সম্রাট আকবরের রান্নার তদারকি করা সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রথমদিকে শুক্রবারে তিনি মাংস খেতেন না। পরে রবিবারেও তিনি শাকাহারী হলেন। চান্দ্রমাসের পয়লাও তিনি নিরামিষাশী! পুরো মার্চ মাসে তিনি মাংস স্পর্শ করতেন না। জন্মমাস নভেম্বরেও একই নিয়ম। সম্রাট সাধারণত শুরু করতেন দই ভাত দিয়ে, সাধারণ খাবারের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন এই বিশ্ববিশ্রুত সম্রাট।"

আকবরের মেনু হতো তিন রকমের। যেদিন শাকাহারী, সেদিনের খানার নাম সফিয়ানা। চাউল (জর্দ-বিরিনু, খুসকা, খিচড়ি, শির-বরিন্দ)। গম (চিখি), ডাল, পালংশাক হালুয়া, সরবৎ।

"এই মেনুর জন্যে মোগল সম্রাট হওয়া—পড়তায় পোষায় না," হতাশা প্রকাশ করলেন ব্যাণ্ডোদা।

প্রফেসর রায় বললেন, "যেদিন মাংস খেতেন, সেদিন সম্রাট আকবরের মেনু—পোলাও, বিরিয়ানি, শুন্না, শুর্বা। মাংস ও গমের সমন্বয়ে—হরিষা, হালিম, কাস্ক, সানবুসা। আবার কোনও কোনও দিন, মাংস, ডিম, ঘি, দই ও মশালার সংমিশ্রণে—ইয়াখনি, কাবাব, দোপিঁয়াজা, মুসম্মান, দমপোখ্ত, কালিয়া এটসেটেরা। সেই সঙ্গে নানা ধরনের গরম গরম

রোটি।”

“জেনে রাখুন, আকবরের রান্নাঘরের চাল আসতো গোয়ালিয়র এবং রাজোরি থেকে, হিসার থেকে ঘি, কাশ্মীর থেকে হাঁস, মুরগি এবং নানা রকম সবজি। ফল আসত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং দেশের নানা অংশ থেকে।”

সম্রাট জাহাঙ্গির রইস আদমী ছিলেন, কিন্তু মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে বৃহস্পতিবার ও রবিবার পশুবধ নিষেধ হয়েছিল। তখন তো আর রেফ্রিজারেটর ছিল না, ফলে সবার পক্ষেই সরকারি নির্দেশে মিটলেস ডে! শাকাহারী দিবসে তাঁর প্রিয় খাবার ছিল গুজরাতি খিচুড়ি। তারপর ফালুদা। বাবার মৃত্যুদিবসে জাহাঙ্গির উপবাস করতেন। সম্রাট টানা আঠারো দিন উপবাস করতেন পার্শিয়ান নববর্ষ নওরোজের শুরুতে।”

“শুনে রাখুন, তখনকার দিনে হিন্দুস্থানের আমীররা গাধার মাংস খুব পছন্দ করতেন। জাহাঙ্গির অবশ্য এই মাংস পছন্দ করতেন না, তাঁর প্রিয় ছিল পাহাড়ি ছাগল।”

“সম্রাট ঔরঙ্গজেব?” জানতে চাইছেন ব্যান্ডোদা।

প্রফেসর রায় বললেন, “সাধন ভজন ও কৃচ্ছ্রসাধনে শীর্ণ শরীর এই সম্রাটের। মাংস স্পর্শ করতেন না। খেতেন কেবল জোয়ারের রুটি। শুতেন মেঝেতে একটি বাঘছালের ওপর। সোনা বা রুপোর পাত্র পর্যন্ত ব্যবহার করতেন না।”

ব্যান্ডোদাকে বেশ চিন্তিত দেখা যাচ্ছে। তিনি বললেন, “মোগলরা এদেশকে নিজের করে নিয়েছিলেন। অথচ তাঁদের নামে কোনও খানা এখন দেখছি না। অথচ ইংরেজরা অনেক ধূর্ত—পান্তুয়া না খেয়েও লেডি ক্যানিং তাঁর নামটা জুড়ে দিলেন মিষ্টির সঙ্গে। ইংরেজ রাজত্বের অবসান হলো, কিন্তু লেডিকেনি বহাল তবিয়ত রইলেন।”

কেন এমন হলো তা খোঁজখবর করে দেখা দরকার। প্রফেসর রায় বললেন, “মোগল আমলে জিলিপির নামটা পাল্টাবার চেষ্টা হয়েছিল। কোথাও কোথাও এই জিলিপিকে ‘জাহাঙ্গিরি’ বলে, কিন্তু সমস্ত ইন্ডিয়া এই

নাম নেয়নি।"

"অথচ আরব দেশ থেকে এই জেলাবি এদেশে এসেছিল। আমরা সত্যিই অকৃতজ্ঞ।"

প্রফেসর রায় ইতস্তত করলেন। "জিলিপি আরব দেশ থেকে এসেছিল কি না এবিষয়ে প্রবল মতদ্বৈধ আছে—ভাল করে বুঝতে গেলে জৈন শাস্ত্র মন্থন করতে হবে, সেই সঙ্গে পড়তে হবে রঘুনাথের বিখ্যাত বই 'ভোজন-কুতূহল'।"

"বাঃ নামটি তো চমৎকার। মুখুজ্যে, তুই যদি কোনওদিন বাংলায় কোনও বই নামাতে পারিস, তা হলে নামটা পুনর্ব্যবহার করতে পারবি।"

ব্যান্ডোদা এবার বললেন, "সর্বদমনবাবু যদি কিছু মনে না করেন, খানার সঙ্গে পিনা বলে যে শব্দটি আছে, তা আপনি যেন একটু এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন। সরবৎ ছাড়া আর কিছুর উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি না!"

একটু লজ্জা পেলেন সর্বদমন। "ওই সাবজেক্টটা যখন তুললেনই তখন শুনুন, সরাবের সঙ্গে মোগলদের কখনও ভাব কখনও আড়ির সম্পর্ক। বাবর মদ্যপান করলেও মাঝে মাঝে সোনার মদ্যপাত্র ভেঙে টুকরো টুকরো করে তা বিলিয়ে দিতেন। তবে কিছুদিন পরে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে আবার পানাসক্ত হতেন। ঢোলপুরে একখানা বিশাল প্রস্তরখণ্ড কেটে তিনি বিরাট আধার তৈরি করেছিলেন, পরিকল্পনা ছিল এটি মদিরায় পূর্ণ করবেন। কিন্তু যখন পাথর কাটা সম্পূর্ণ হলো, তখন বাবর মদ ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে মদের বদলে এটি পূর্ণ করা হল লিম্বুপানিতে। আকবর মদ খেতেন না বললেই চলে, কিন্তু তাঁর ভাঙ-এর নেশা ছিল। এঁদের দৌলতেই বোধ হয় নেশাভাঙ কথাটার সৃষ্টি!"

"ভাল বলতে হবে, নিজে মদ খান না, অন্যকে উৎসাহও দেন না।"

"কী বলছেন মশাই!" বকুনি লাগালেন সর্বদমন রায়! "কর্তার দুটো ছেলে তো মদ খেয়ে খেয়েই অকালে মারা গেলো। জাহাঙ্গিরের মদ্যপ্রীতির কথা তো ইস্কুলের ছেলেদেরও জানা। বৃহস্পতি ও শুক্রবারে মদ খেতেন না, কিন্তু অন্যদিন অন্তত কুড়ি পেগ পান করতেন—দিনের বেলায় চোদ্দ এবং রাতে ছয় পেগ। কিন্তু তাঁর রাজসভায় মাতলামির স্কোপ ছিল না।"

ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে প্রশ্ন করে লাভ নেই। এককাট্টা লোক, ইনি যে মদ স্পর্শ করবেন না, এটাই স্বাভাবিক। ১৬৬৮ সালে ঔরঙ্গজেব প্রহিবিশনের ফতোয়া জারি করেছিলেন—হিন্দু মুসলমান উভয়েরই মদ্যপান সরকারিভাবে বন্ধ হয়ে গেলো।

"খোঁজ করে দ্যাখ, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের এইটাই কারণ কি না!" এই বলে আমাদের ব্যান্ডোদা হাসতে লাগলেন।

বাবরও ভাঙ খেতেন শুনে আমি একটু অবাক হলাম। গাঁজা, সিদ্ধি, চরস জনগণের নেশা বলে আমার ধারণা ছিল।

ব্যান্ডোদা আমার আর একটা ভুল ভেঙে দিলেন—এই তিনটি নেশার উৎপত্তি যে একই স্থলে, তা এই বয়সেও আমার জানা ছিল না। ব্যান্ডোদা বললেন, "মোগল সম্রাটদের বদনাম করার আগে জেনে রাখ, অথর্ববেদে ভাঙকে পবিত্র তৃণ বলা হয়েছে। ভাঙ বা সিদ্ধি হলো ঘাসের পাতা। তোরাই তো বলতিস, 'সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে।' সিদ্ধি ঘাসের শুকনো মঞ্জরী হলো গাঁজা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লেখা হয়েছে—'তুলসী কাটিয়া বুড়া রুপিল গাঁজাই।' গাঁজার আঠা হলো চরস, ইনিই ইদানীং হাসিস নামে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন।"

সর্বদমন বললেন, "ব্যান্ডোবাবু, শুধু সম্রাট নন, আমীর-ওমরাওরা যে তাঁদের ডিনারে বিশ থেকে পঞ্চাশ রকম খানা পরিবেশন করতেন, তার বিবরণ ইংরেজ দূত স্যার টমাস রো লিখিতভাবে রেখে গিয়েছেন। প্রায় একই সময়ে আর একজন ইউরোপিয়ান পিটার মুন্ডি ১৬৩১ সালের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন খিদের তাড়নায় মানুষ গোবরের গাদা ঘাঁটছে যদি কিছু হজম না করা দানা খুঁজে পাওয়া যায়। সমস্ত রাস্তায় মৃতদেহ ছড়িয়ে রয়েছে, দুর্গন্ধে টেকা দায়।"

"এবার সোজা ইংরেজ যুগে চলে আসতে পারি আমরা।" গ্রীন সিগন্যাল দিলেন ব্যান্ডোদা।

শ্রাবণী বসুর বই 'কারি ইন দ্য ক্রাউন' ব্যান্ডোদাই আমাকে উপহার দিয়েছেন। আমি বললাম, "এদেশে ইংরেজের খানা-পিনার তিনটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পর্বে সায়েবরা মনের সুখে নবাবী খানার স্বাদ উপভোগ

করছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, এদেশের মাটিতে পা দিয়ে গরীব ইংরেজ যেন স্বর্গসুখের সন্ধান পেলো। রাতারাতি এঁরা হয়ে উঠলেন পেটুকদের শিরোমণি! খানাপিনাসর্বস্ব কিছু ইংরেজ দুপুর দুটোয় খেতে বসে আসন ছেড়ে উঠতেন না বিকেল পাঁচটার আগে। বিভিন্ন রাজকীয় ডিশের সঙ্গে থাকতো অন্তত ৬ গেলাস ইমপোর্টেড মদিরা! পলাশীর যুদ্ধের আগের বছর এক ইংরেজ বাহিনীর ৮৪৮ সৈন্যের মধ্যে ৮৭ জন দেহ রাখলেন স্রেফ লিভার পচিয়ে।

বিশেষজ্ঞরা আন্দাজ করছেন, পলাশীর যুদ্ধের পরে সন্ধ্যায় লর্ড ক্লাইভ-এর ডিনার মেনু ছিল—চিকেন দোপিঁয়াজা, মালাই চিংড়ি এবং বিরিয়ানি! বছর পঁচিশেক পরে মিসেসকে কলকাতা থেকে লিখছেন, দুপুর দু'টোর সময় ডিনার সারা হলো। মেনু—স্যুপ, ফাউল রোস্ট, রাইস অ্যান্ড কারি, মাটন পাই, ভেড়ার মাংস, রাইস পুডিং, টার্ট, চিজ, মাখন এবং মদিরা! সিপাহি আন্দোলনের পরে ইংরেজ একেবারে নির্ভেজাল ইংরেজ থাকবার জন্যে নিজেকে গুটিয়ে নিলো। ১৯১০ সালের একটা মেনু শুনুন: পি স্যুপ, রোস্ট চিকেন, ব্রেড সস, আলু, চিজ, ম্যাকারনি ও লেমন পুডিং।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "বেঙ্গল ক্লাবে এই বিষয়ে বিস্তারিত রিসার্চ করা যেতে পারে। ১৮২৬ সালে ক্লাবের মেনু, ১৮৫৭ সালের ক্লাব মেনু এবং ১৯২৬ সালের মেনু ওঁদের স্টুয়ার্ড দত্ত সায়েবকে দিয়ে পরীক্ষা করালেই ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যাবে।"

আমি বললাম, "তৃতীয় পর্বে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটালো। দেশ ছেড়ে চলে যাবার পরে ইংরেজ মরিয়া হয়ে উঠল ইন্ডিয়ান কারি খাবার জন্যে। এখন তো খোদ বিলেতে ইংরেজের সবচেয়ে প্রিয় খাবার এই কারি—যতো ঝাল, ততো তার কদর।"

"এ বিষয়ে এবছরেই তো আমরা বিস্তারিত খবরাখবর করেছি, তুই ওই রিপোর্টটা ঝটপট লিখে ফেল। তোর বাংলা লেখাটা পেলে আমি ওর ইংরেজি তর্জমা করবো নিজে। আমার খুব ইচ্ছে প্রফেসর সর্বদমন রায় ওর সংস্কৃত অনুবাদ করে সংস্কৃত কলেজের ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেন। যদি কখনও সংস্কৃত আবার জাতীয় ভাষা হিসেবে ফিরে আসে, তা হলে খুব

কাজে লেগে যাবে।”

আমি বললাম, “ব্যান্ডোদা, আপনি আমাদের আজ খাওয়ালেন নিরামিষ, আর আলোচনা করালেন রাষ্ট্রীয় ভোজের।”

সর্বদমন বললেন, “ব্যান্ডোদা আজ যা সুশালি রান্না করিয়েছিলেন তা শ্রীচৈতন্যের প্রিয় ডিশ—লাফরা। খুব শক্ত রান্না—মিঠে কুমড়ো, রাঙা আলু, মানকচু, কাঁচকলা, বিচে কলার থোড়, গর্ভমোচা, বেগুন ও শিম দিয়ে এই রান্না। শুনুন, মহাপ্রভুকে তুষ্ট করার জন্যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য যে মেনু করেছিলেন, তাও মনে রাখার মতন—দশ রকমের শাক, নিমের সুক্তো, মরিচের ঝোল, ছানাবড়া, বড়িঝোল, দুগ্ধতুম্বি, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, লাফরা, মোচাঘণ্ট, মোচা ভাজা।

ভাববেন না এখানেই শেষ, আরও ছিল, কচি নিমপাতার সঙ্গে ভৃষ্টবার্তাকী, পটোল ভাজা, কুষ্মাণ্ড, ভাঙা মাষকলাই, মুগের ডাল, মুগের বড়া, কলাবড়া, ক্ষীরপুলি, আম, দধি সন্দেশ এটসেটেরা।”

“যারা বলে নিরামিষ খেয়ে সুখ নেই, তারা এদেশের কিছুই জানে না,” সগর্বে মন্তব্য করলেন ব্যান্ডোদা। “এখন বুঝছি সারা দেশটা কেন চৈতন্যপ্রেমে ডুবেছিল।”

এবার আমার পালা। ব্যান্ডোদা বললেন, “তুই তো গুরুদেব শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অনুমতি না নিয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি কথা মুখে আনবি না।” ব্যান্ডোদা জানেন, মৈনাক থেকেই টেলিফোনে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।

বললাম, “শ্রী শ্রীঠাকুরের খাওয়া-দাওয়ায় আপত্তি ছিল না, ভড়ংও ছিল না। একবার তাঁর ‘বিপরীত ক্ষুধা’র উদ্রেক হয়েছিল। ‘যত কেন খাই না, পেট কিছুতেই যেন ভরত না। এই খেয়ে উঠলুম, আবার তখনই যেন কিছু খাই খাই—সমান খাবার ইচ্ছা। দিনরাত্তির কেবলই খাইখাই ইচ্ছা।’ আবার তিনি বলছেন, ‘আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব। আমি মাছভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি-চচ্চড়ি—এ সবতাতেই আছি। আবার মুড়িঘণ্টোতেও আছি, কালিয়া পোলোয়াতেও আঁছি।” ’

“ঠাকুরের খাওয়া নিয়ে গবেষণা করলে একখানা ছোট সাইজের

ভোজনামৃত হয়ে যায়, ব্যাভোদা।"

"তুই বরং ওঁর চেলা স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু বল। ওঁর গুরুদেব তো বিশ্বকে যা বলেছেন, তা মার্কসও অতো খোলাখুলি বলেননি—খালি পেটে ধর্ম হয় না।"

আমি বললাম, "শঙ্করীবাবু অন্তত হাজার দেড়েক জায়গায় দাগ দিয়ে রেখেছেন, আমার প্রতি অপার দয়াবশত সেসব দেখতে দেবেন এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। শুনুন, নরেন্দ্রনাথ দত্ত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। আবার একই সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারের কাছে পীরুর হোটেলে মুরগির কারি খেয়ে আনন্দ পাচ্ছেন।"

ব্যাভোদা এবার আমাকে আক্রমণ করলেন। "তুই তো রিসার্চ নোটে ফেনিয়ে লিখেছিস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রচণ্ড ঝাল লঙ্কা খেতেন, মিষ্টিতে অনুরাগ ছিল না। আবার মেমসায়েবরা গবেষণা করে দেখাচ্ছেন, আইসক্রিম উইথ হট চকোলেট খুব পছন্দ করতেন আমেরিকায়। এ-ব্যাপারে একটু আলোকপাত কর।"

"ঝাল ভালবাসলে শেষপর্বে আইসক্রিম ভালবাসাটাই স্বাভাবিক, ব্যাভোদা—জিভটা ধুয়ে নিতে হবে তো! আর একটা ব্যাপার, যতদূর দেখা যাচ্ছে। এই আইসক্রিম প্রীতিটা এসেছিল বিবেকানন্দের জীবনের শেষপর্বে। স্বামীজির ভাই মহেন্দ্রবাবু একবার বলেছিলেন, যে মানুষ সারাজীবন নোনতা ভালবাসে, সে হঠাৎ মিষ্টি পছন্দ করলে লক্ষণটা ভাল নয়—বুঝতে হবে বড় কোনও রোগ, অথবা মৃত্যু আসন্ন। এ-বিষয়ে আমি বরুণ মহারাজের সঙ্গে কনসাল্ট না করে আপনাকে কিছু বলতে পারবো না। স্বামী প্রভানন্দর সঙ্গে দেখা করা শক্ত ব্যাপার। আমি চেষ্টা চালাবো।"

ব্যাভোদা বললেন, "মহাপুরুষদের জীবনে কখনও কখনও কনট্রাডিকশন থেকে যায়।"

আমি বললাম, "বিবেকানন্দ ছিলেন বিশ্বপথিক। বেদান্ত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রান্নাবান্না নিয়ে সমান তালে মাথা ঘামিয়েছেন। বিষয়টা সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন। শুনুন, মৃত্যুর কিছু আগে তিনি যেমন তোলা উনুনে বেলুড় মঠে বসে ফুলুরিওয়ালা হয়েছেন, তেমনি নিবেদিতা (মার্গারেট নোব্‌ল)

এবং রবীন্দ্রনাথের বোনের মেয়ে সরলা ঘোষালকে নিজের হাতে রান্না করে কী খাইয়েছেন তা পড়লে যে কোনও রসনারসিকের মাথা ঘুরে যাবে।”

“এসব খবর আমরা আগে পাইনি কেন?” জিজ্ঞেস করলেন ব্যাণ্ডোদা।

“পাবেন কী করে, ব্যাণ্ডোদা? মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার এইসব চিঠি এতদিন বাক্সবন্দি হয়ে পড়েছিল। শঙ্করীপ্রসাদ বসু অনেক মেহনত করে পত্রাবলী উদ্ধার করে জনগণকে উপহার দিয়েছেন।”

১৬ নম্বর বোসপাড়া লেন থেকে রবিবার ৫ই মার্চ, ১৮৯৯ সিস্টার নিবেদিতা তাঁর বান্ধবী ‘ডার্লিং ইউম’কে বিস্তারিত চিঠি লিখছেন। রবিবার কাউন্টেস কুন্নাভোরা বেলুড়ে স্বামীজি সন্দর্শনে এলেন। পরে স্বামীজি মন্তব্য করলেন, এই মহিলাটি তামস! একদিন নিবেদিতাকে নিয়ে তিনি এই মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন।

এরপর মধ্যাহ্নভোজন পর্ব। আমন্ত্রণকর্তা এবং রন্ধনকর্তা দুই-ই স্বামী বিবেকানন্দ। নিজে খিদমতগারের ভূমিকা নিয়ে তিনি পরিবেশনও করলেন। সরলা ও নিবেদিতা এক টেবিলে বসেছেন। সরলা ঘোষাল এমনভাবে বসেছেন যে, দক্ষিণেশ্বরকে ভালভাবে দেখতে পান। মেনুতে সারা বিশ্বের ছায়া—বিশ্বপথিক বিবেকানন্দের রুচির প্রতিফলন।

১। ইয়াংকি—ফিশ চাউদার

২। নরওয়েজিয়ান—ফিস বল—“বিবেকানন্দ জানালেন, স্বয়ং মাদাম এগনেওয়াসন এই রেসিপি উপহার দিয়েছেন।” প্রশ্ন : “কে এই মাদাম? তিনি কী করেন? এঁর নাম তো কখনও শুনিনি।” স্বামীজির উত্তর : “মাদাম অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে ফিস বল রাঁধেন।”

৩। ইংলিশ অথবা ইয়াংকি—বোর্ডিংহাউস হ্যাশ। তিনি রসিকতা করলেন, “ঠিক মতন করে রান্না হয়েছে—এতে নখ মেশাতে হয়েছে।” নিবেদিতা এবং সরলা কিন্তু লবঙ্গ ছাড়া কিছুই খুঁজে পেলেন না! পরে মনে পড়লো, নখের মতন দেখতে বলে ইংরিজিতে ক্লোভ বলে লবঙ্গকে।

৪। মিন্‌স্ পাই আ লা কাশ্মির—মাংসের কিমার সঙ্গে বাদাম এবং কিসমিস।

৫। বেঙ্গলি রসেগুলি অ্যান্ড ফ্রুট—অর্থাৎ আদি অকৃত্রিম রসগোল্লা ও

ফল।

এসব স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ ধৈর্য ধরে বেলুড় মঠে রান্না করেছেন শুনে ব্যান্ডোদা কুপোকাৎ! "অ্যাদ্দিন আমি জানতাম উনি ঝাল মরিচ দিয়ে আলুচচ্চড়ি এবং পলাণ্ডু রাঁধতে জানতেন। 'ভোজনরসিকের চোখে বিবেকানন্দ' বলে তুই একটা বই খেটেখুটে লিখে ফেল—আজেবাজে সাবজেক্টে ডুবে থেকে অমূল্য সময় নষ্ট করিস না। আজ তুই যা বললি আমি কম্পিউটারে তুলে নিচ্ছি।"

প্রফেসর সর্বদমন রায় শেষ মুহূর্তে কঠিন প্রশ্ন তুললেন। "এবার তো আপনি রাজা-মহারাজাদের খানা-পিনার ওপর তথ্য সংগ্রহ করছেন, সেখানে আবার স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে টানাটানি কেন?" ব্যান্ডোদা বললেন, "আপনি চাইছেন বাদ দিতে?"

আমি নার্ভাস হয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে ফোন করে বেজায় বকুনি খেলাম। "স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববন্দিত শেফ হতে পারতেন—এই থিসিস প্রচার করে দুনিয়ার কী লাভ হবে?"

তারপর অবশ্য উত্তরটা পেয়ে আমি নিশ্চিন্তে ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

ব্যান্ডোদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এনিথিং টু সে?"

দুঁদে ব্যাটসম্যানের মতন হাঁটুমুড়ে ব্যাট চালিয়ে একটি ছক্কামারার স্টাইলে উত্তর দিলাম, "অ্যাকর্ডিং টু মাই গুরু, মহারাজা বলতে সমস্ত উত্তর ভারতে রাঁধুনিকেই বোঝায়। স্বামীজির এক শিষ্য ছিলেন স্বামী সদানন্দ। তিনি বরানগরে এসে সন্ন্যাসীদের মহারাজা বলা শুরু করেন এবং পরে সমস্ত রামকৃষ্ণ মিশনে এই প্রথা চালু হয়ে যায়। সুতরাং সাধারণ মানুষের চোখে যাঁদের সব কিছু আছে তাঁরাও মহারাজা। ভগবান দু'জনকেই আহার এবং ক্ষুধা থেকে মুক্তি দেননি, সুতরাং দু'জনের কথাই আমরা লিপিবদ্ধ করলে কোনও দোষ হবে না।"

আনন্দে উৎফুল্ল ব্যান্ডোদা বললেন, "দে হাতখানা দে।" হ্যান্ডসেকের জন্য ব্যান্ডোদা তাঁর হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

জয় বেঙ্গল

ঠিকানা বেভারলি হিল্‌স, আমেরিকা হলেও, আমাদের ব্যান্ডোদা যে কখন কোথায় থাকেন তার ঠিকঠিকানা নেই। এই সেদিন ম্যানেজমেন্ট উপদেষ্টা হিসেবে হাভানা গিয়েছিলেন, সেখান থেকে সাওপালো, তারপর সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। আমি এইসব জানতে পারি কারণ ব্যান্ডোদা যেখানেই যান সময় পেলেই একখানা পিকচার পোস্টকার্ড ডাকে ফেলে দেন। লাস্ট কার্ডে লিখেছিলেন, এবার যাচ্ছি লন্ডন ভায়া লিসবন্।

এই লন্ডন এক বিচিত্র জায়গা। দুনিয়ার যতো বিচিত্র মানুষ নানা কারণে এখানে হাজির হচ্ছেন গত তিনশ বছর ধরে ; এঁদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়েই লন্ডন এতো বড় মহানগরী হয়েছে।

লন্ডন থেকে ব্যান্ডোদার টেলিফোন। ওই শহরে একজন হাইলি ইন্টারেস্টিং ইয়ংম্যানের সঙ্গে দেখা হয়েছে ; এই ভদ্রলোক কলকাতায় আসছেন, কলকাতায় এখন ইংরেজ স্থাপত্যের কি হাল হয়েছে তা নিজের চোখে দেখতে। বিপুল উৎসাহে ব্যান্ডোদা আমার নামটা দিয়ে দিয়েছেন ওই ভদ্রলোককে। বলেছেন, ওর হাতে তেমন কাজকর্ম নেই ; এইসব আধসেদ্ধ সাবজেক্ট পেলে খুব খুশি হয়, একবছরের অনুসন্ধান এক সপ্তাহে

সেরে ফেলতে পারবেন, খেয়ালি লেখক সঙ্গে থাকলে।

এই টেলিফোন নির্দেশ এবং পরবর্তী যোগাযোগ থেকেই বিশ্ববিমোহিনী বেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ও কলকাতার সামাজিক কৌতূহল বৃদ্ধি।

ব্যাণ্ডোদা নির্দেশিত বেঙ্গল ক্লাব সম্পর্কিত এই প্রবন্ধের নাম হওয়া উচিত ছিল 'জয় বাংলা,' কিন্তু পশ্চিমবাংলার পূর্বসীমান্ত থেকে ভেসে আসা এক দৃষ্টিবিভ্রমকারী অসুখের কথা মনে রেখে নাম দিতে হচ্ছে—জয় বেঙ্গল। ব্যাণ্ডোদাও এই নামটি পছন্দ করেছেন।

ব্যাণ্ডোদার বন্ধু কলকাতায় পদার্পণ করে যথা সময়ে আমার সঙ্গে যোগোযোগ স্থাপন করেছিলেন।

ওঁর সঙ্গে ঘোরাঘুরি চলছে। টিপটিপে শ্রাবণের অত্যাচার অগ্রাহ্য করে আমি ওঁদের সঙ্গ দিচ্ছি পথে পথে। এক সময় পার্ক স্ট্রিটের কাছে কলকাতার চৌরঙ্গী রোডের পশ্চিমদিকে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে এবং হাঁ করে বিশ শতকের অন্যতম দৃষ্টিনিগ্রহকারী স্থাপত্য নিদর্শনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। দেশলাই বাক্স সদৃশ এই বাড়িটি আঠাশতলা, বোধহয় নগর কলকাতার উচ্চতম সৌধ। কেন জানি না এই বাড়িটার দিকে তাকালে চোখ জ্বালা করে, মনে হয় স্থাপত্যশিল্পের সবরকম সৌন্দর্যবোধকে গলাটিপে হত্যা করার জন্যেই এই অশোভন সৃষ্টি।

আমার মনে পড়লো, এই বাড়িটা খুব পুরনো নয়। বাড়িটা যখন তৈরি হয়নি তখনও আমি চৌরঙ্গীর এই অঞ্চলে নিত্য যাতায়াত করেছি কর্মসূত্রে।

স্মরণে আনবার চেষ্টা করছিলাম, পুরনো দিনে ঠিক এইখানেই চৌরঙ্গী আলো-করা এক ভুবনমোহিনী শ্বেতশুভ্র অট্টালিকা সমস্ত পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ওই ধরনের বাড়ির দৌলতেই একদিন আমাদের এই কলকাতা প্রাসাদপুরী অথবা 'সিটি অফ প্যালেস' হিসাবে বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করেছিল।

ধন্য এই ইংরেজ সাহেবরা। কবে এই দেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন।

তবু গাঁটের পাউন্ড খরচা করে এক বিলিতি ম্যাগাজিন এদেশে পাঠিয়েছেন একজন কবি ও একজন স্থপতিকে। গত পঞ্চাশ বছরে নগর কলকাতায় কী পরিবর্তন হয়েছে তা লক্ষ্য করে একটি ছোট আকারের নিবন্ধ রচনা করবেন তাঁরা। আমি লক্ষ্য করলাম, আমাদের এবং ব্যান্ডোদার নতুন বন্ধুদের মধ্যে যথেষ্ট শব্দগত দূরত্ব রয়েছে।

যতোবার আমি বলছি 'স্বাধীনতার' সুবর্ণজয়ন্তী, ততবার ওঁরা বলছেন 'ট্রান্সফার অফ পাওয়ার', ক্ষমতার হস্তান্তর। ওরে বাপু, এটা আমাদের বড় আদরের স্বাধীনতা, কিন্তু 'ইনডিপেন্ডেন্স' কথাটা ভুলেও সায়েবরা মুখে আনলেন না, অথচ ব্রিটিশ নাগরিক ফ্রান্সের অতো কাছে বসবাস করে এবং বিগত যাট বছর আমেরিকার চরণ-চর্চা করেও লিবার্টি শব্দটির অর্থ বোঝেন না এমন নয়।

নবাগত কবি ও স্থপতি কোথা থেকে কলকাতার একদা-বিখ্যাত ফটোগ্রাফার বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের তোলা প্রায়-ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতন দেখতে চৌরঙ্গীর সেই হারিয়ে-যাওয়া বাড়িটার প্রাচীন ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করেছেন। আগেই এঁদের যথাসাধ্য নিরুৎসাহ করেছিলাম। কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছি, বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের ফটোগ্রাফের রত্নভাণ্ডার কিছুদিন আগে স্বয়ং অগ্নিদেব আমাদের মুখরক্ষা করার জন্যে দয়াপরবশ হয়ে গ্রাস করেছেন। সায়েব কবি মুচকি হেসে গ্র্যান্ড হোটেল থেকে কয়েকজন পরিচিতকে ফোন করেছিলেন এবং তারই ফল— ওঁদের হাতে সেই হারিয়ে-যাওয়া প্রাসাদপুরীটির আলোকচিত্র, বোধহয় কোনও কলকাতাপ্রেমী সংগ্রাহকের কপি নেগেটিভ থেকে ছাপা।

সায়েব নীরবে যা বলতে চাইলেন : "আমরা তোমাদের হাতে কোন কলকাতা হস্তান্তর করেছিলাম এবং গত অর্ধশতাব্দীতে সেই মহানগরীর কী অবস্থা করেছো তোমরা! কোথায় এই বহুতল নারকীয় নির্মাণ, আর কোথায় সেকালের সেই হারিয়ে যাওয়া মর্মরের কাব্য, যা ইংরেজরা নির্মাণ করেছিলেন ভালবাসা দিয়ে, রুচি দিয়ে এবং তার সঙ্গে হয়তো কিছুটা ঔদ্ধত্য মিশিয়ে।"

হাজার হোক কবির হৃদয়, খুব কঠোর হতে চাইছিলেন না, তাই মিষ্টি

করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী অসুবিধে হয়েছিল? হোয়াট ওয়েন্ট রং? কেন এমন ভুবনমোহন অট্টালিকা ধ্বংস করলে তোমরা?"

মাথা চুলকে আমার উত্তর, "নিশ্চয় খুব পুরনো হয়ে গিয়েছিল। পুরনো বাড়ি রক্ষে করা এই নোনালাগা ভিজে শহরে খুবই অসুবিধাজনক। ওয়েদার—এই ওয়েদারই আমাদের দীর্ঘজীবী ও পূর্ণ কর্মক্ষম হতে দেয়নি কোনওদিন।"

সায়েব আমার কথায় যে তেমন ভিজছেন না তা আন্দাজ করার মতন বুদ্ধি এখনও আমার আছে। বাধ্য হয়েই উদ্ধৃতি দিলাম : "মেকলে—লর্ড ব্যাবিংটন মেকলের নাম তোমরা এখনও ভুলে যাওনি নিশ্চয়। এই জমিতেই একদিন ছিল তাঁর বসবাস। তিনি দুঃখ করে বলছেন, এই দেশের আবহাওয়া মানুষকে বছরে চার মাস রুটির মতন সেঁকে, পরের চার মাস বয়েল বা সেদ্ধ করে। তারপর বাকি চার মাস লেগে যায় সেই গরমকে হাওয়া দিয়ে আবার ঠাণ্ডা করতে।"

সায়েব ও তাঁর সঙ্গিনী প্রথমে সবিনয়ে আমার উদ্ধৃতিগুলো হজম করলেন। কিন্তু তার পরেই মহিলা বললেন, "যতদূর শুনেছি ছবির বাড়িটা তৈরি শুরু হয়েছিল ১৯০৮ সালে, কারণ সাড়ে পাঁচ লাখ টাকায় জমিটাই কেনা হয়েছিল তার আগের বছর।"

বুঝলাম, এঁদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই, কিছু হাঁড়ির খবর সংগ্রহ করে তবে এঁরা হাজির হয়েছেন পিতৃপুরুষের পরিত্যক্ত এই জমিদারিতে। সায়েবের নোটবুকে, হারিয়ে যাওয়া বাড়িটার ঠিকুজি-কুষ্ঠি আগেই লেখা হয়ে গিয়েছে। বাড়ির স্থপতি ছিলেন মিস্টার ভিনসেন্ট এস্‌ক, কনট্রাকটর বেঙ্গল স্টোন কোম্পানি। নামে স্টোন, আসলে সেকালের নামকরা চুন বালি ইট সুরকির কনস্ট্রাকশন প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের ইনজিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান এখন আর কলকাতায় নেই।

সায়েব মুখে কিছু বলছেন না, কিন্তু কিছু নীরব প্রশ্ন তাঁর মুখে ফুটে উঠছে: "যে অট্টালিকায় গৃহপ্রবেশ উৎসব হলো ১৯১১ সালে তা কী করে ক্ষয়ে যায় এই ক'বছরে? যদি না বাড়ির দখলদাররা কিছু অবহেলা করে থাকেন?"

আমি নীরুত্তর থেকেও মুক্তি পাচ্ছি না! মেমসায়েব জানতে চাইছেন, "বিভীষিকা-স্থাপত্যের প্রতিভূ এখনকার দেশলাই বাক্সটির নকশাদারটি কে?"

একবার ভাবলাম, কোনও একটা সায়েবের নাম বলে রেহাই পাই। এ দেশের কম সর্বনাশ তোমরা ইংরেজরা করে যাওনি, তোমাদের আরও অনেক বদনাম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষলাম। বললাম, "জানা নেই।"

সায়েবটি আমার লজ্জা নিবারণের চেষ্টায় স্তোকবাক্য দিলেন, "ট্রানজিশন পিরিয়ডের স্থাপত্যে এইরকম মূল্যবোধের সমস্যা হয়। অন্য সব বিষয়ে এই সংকট কিছুটা অনুচ্চারিত থাকতে পারে, কিন্তু সমকালের স্থাপত্যে আটকানো কঠিন এর প্রভাব। এই স্থাপত্যের ফলে চৌরঙ্গী অঞ্চলে তোমাদের নান্দনিক সুখ্যাতি সাফার করেছে।"

"সাফার মানে! প্রতি মুহূর্তে চোখের মধ্যে বালি ঢুকে ঘা করে দিচ্ছে। স্বাধীন দেশের নব-স্থাপত্যের জন্যেই বোধহয় কলকাতা শহরে এতো আই ড্রপস বিক্রি হয়!"

ব্যান্ডোদাপ্রেরিত সায়েবটি অন্যদিকে বেশ উদারপন্থী, কার্লাইল থেকে কার্ল মার্কস পর্যন্ত অনেক কিছু শ্রদ্ধার সঙ্গে হজম করেছেন। তবু এঁর রাজভক্তি অসাধারণ। মিষ্টি মিষ্টি করে আমাকে বললেন, "ভাবতে ভাল লাগে, সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং তাঁর মহিষী ভারতভ্রমণকালে তাঁদের বড়দিন এইখানেই উদ্‌যাপন করেছিলেন।"

ইংরেজ বড় বিচিত্র জীব। কট্টর মার্কসিস্ট কিংবা বেদান্তিস্ট হলেও তার রাজভক্তি বিন্দুমাত্র কমে না। যেমন বিবেকানন্দের পরমভক্ত এ জে গুডউইন সায়েব। বেদান্তে নির্ভরশীল হলেও তাঁর রাজ-অনুরক্তি একটুও কমেনি। তিনি এ বিষয়ে প্রায়ই তাঁর প্রভু বিবেকানন্দের সঙ্গে তর্ক করতেন।

একবার যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড ডার্বি রেস জিতলেন, তাঁর ঘোড়ার নাম পার্শিমন। রাজপরিবারের বিজয়ে আনন্দে গুডউইন লাফাচ্ছেন এবং সেই দেখে স্বামী বিবেকানন্দ কিছু ব্যঙ্গ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গুডউইন অনুরোধ করলেন, "গুডউইন আপনার শিষ্য, আপনার ভৃত্য, আপনি যতো

খুশি গালমন্দ করুন, কিন্তু রাজপরিবারের ওপর কিছু বলবেন না।”

বিবেকানন্দ সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলেননি, কিন্তু স্বদেশে ফিরে একবার গুডউইনের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “লড়ে মরে ভারতীয় সেপাই, বাহবা পায় ইংরেজ সেপাই। তোদের জাতের তো এই বীরত্ব।” আরও বলেছিলেন, “তোদের জাত এই ভারতবর্ষকে হিপনোটাইজ করে ফেলেছে...যেদিন মোহিনীশক্তি চুলোয় যাবে সেদিন তোদের লেবু চ্যাপ্টা করে ফেলে দেবে।”

গুডউইনও ছাড়বার পাত্র নন। একেবারে গুরুর মুখের ওপর জবাব দিয়েছিলেন, “আপনি মস্ত মানুষ, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনার দেশের মানুষ জানে না কী করে নিজের দেশ চালাতে হয়, এই ভারত শাসন করার পক্ষে ইংরেজরাই যোগ্য!”

এসব কথা মনে মনে ভেবেছি, কিন্তু ভুলেও ব্যান্ড্রোদাপ্রেরিত সায়েবকে ফাঁস করিনি। তোমরা যাবার আগে এদেশের জল ঘুলিয়ে গিয়েছ, আমাদের হাড়ে যাতে চিরকাল দুব্বো গজায় তার ব্যবস্থা পাক্কা করে তবে তোমাদের লোকরা বিলেতের জাহাজে উঠেছে। হাড়ে দুব্বো গজানোর ফলেই আমাদের সৌন্দর্যবোধ, মূল্যবোধ, সৃষ্টিক্ষমতা সব প্রচণ্ড ঝাঁকানি খেয়েছে। ব্রহ্মতালুতে রক্ত উঠে গিয়েছিল কলকাতার, সেই অবস্থায় স্থাপত্যের কিছু অসঙ্গতি হবে এটা এমন কি আশ্চর্য কথা।

সায়েবকে আমি বললাম, “মহাশয়, সমস্ত রস নিংড়ে লেবু যখন তেতো হয়ে উঠেছে তখন ইংরেজরা এদেশের ক্ষমতার চাবি কেমব্রিজে পড়া বাদামি সায়েবদের হাতে তুলে দিয়ে সরে পড়েছেন, কিন্তু আমরা সেই চ্যাপ্টা লেবু ডাস্টবিনে ফেলে দিইনি। দেখুন, এই বাড়ির ঠিক পেছনেই ইংরেজের পরম প্রিয় বেঙ্গল ক্লাব এখনও বেঁচে রয়েছে। স্বাধীন ভারতেই এই ক্লাবের দেড়শো বছর পূর্তি উৎসব সম্পন্ন হয়েছে, সামনের ২০২৭ সালে দুশো বছর পূর্তি উৎসবের সময় কি মেনু হবে তা এখন থেকে ঠিক করছেন উৎসাহী সভ্যরা। আরও শুনে রাখুন, ইন্ডিয়ানদের প্রবেশ নিষেধ যে-ক্লাবে সেই ক্লাবকে স্বাধীনতাসংগ্রামী লাটসাহেব চক্রবর্তী রাজাগোপালচারী স্বয়ং চিঠি লিখে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ‘জীবন যেমন

চলছে তেমন চলবে—ক্লাবের নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করবেন না।' এক কোপে দু' টুকরো হয়ে ১৪ অগস্ট ১৯৪৭ বেঙ্গল শেষ হলো, কিন্তু বেঁচে থাকুক বেঙ্গল ক্লাব যতদিন চন্দ্রসূর্য উঠবে—যাবৎচন্দ্রদিবাকরো বলে একটা কথা তখনকার দিনে জমির অধিকার হস্তান্তরের সময় লেখা হতো।"

ব্যান্ডোদাপ্রেরিত লেখক সায়েব তাঁর স্থপতি সহচরীকে নিয়ে উড়ে গিয়েছেন অন্য এক ভারতীয় শহরের হাঁড়ির খবরের খোঁজ করতে। কিন্তু চৌরঙ্গী মোড়ের এই জায়গাটা আমার মাথার মধ্যে ঢুকে বসেছে। পায়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখেছি, খোদ চৌরঙ্গীর ওপরেই একটা ছোট্ট প্রাইভেট পথের গেট এখনও রাখা হয়েছে বেঙ্গল ক্লাবের, যদিও সেটা সারাক্ষণ তালাবন্ধ থাকে।

বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে বিশ্ববিমোহনী বেঙ্গল ক্লাবের যা যোগাযোগ তা সব রাসেল স্ট্রিট ধরে। এখন বোধহয় ওই পথটারও কী এক বেয়াড়া নাম হয়েছে। কিন্তু সে নাম সারাক্ষণ মুখে আনতে কলকাতা পুরসভা আমাদের বাধ্য করতে পারে না। মেয়রসায়েব এবং শ্রদ্ধেয় কমিশনার সায়েবের কাছে নতমস্তকে আমাদের নিবেদন, প্লিজ মনে রাখবেন, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক আমরা, হাতে গোনা কয়েকজনের খেয়ালখুশি অনুযায়ী বিখ্যাত রাস্তার নাম ঘন ঘন পরিবর্তন হলে সাইনবোর্ডওয়ালা ছাড়া আর কেউ উপকৃত হবে না। অকারণে নাম পরিবর্তনের অত্যাচার থেকে এদেশের নিরীহ নাগরিকদের কে বাঁচাবে?

ঠিকানা ৩৩বি চৌরঙ্গী রোড, কিন্তু আজকের বেঙ্গল ক্লাবের যা কিছু রমরমা তা সব পূর্বদিকের রাসেল স্ট্রিটে। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে পিতৃদেবের অকাল মৃত্যুর পরে কর্মসন্ধানে সেই যেদিন হাওড়া থেকে কলকাতায় পা দিয়েছিলাম সেদিন থেকেই এই জায়গাটা আমাকে ভীষণ টানে। তখন কী বিচিত্র স্বপ্নের পরিবেশ ছিল এখানে।

এক দিকে চৌরঙ্গী যার এক প্রান্তে এক অশ্বারোহী সারাক্ষণ তার

ভুবনবিদিত বাহনটিকে আয়ত্তে আনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। আমরা বলতাম আউট্রাম, দু'একজন কায়দা করে উচ্চারণ করতেন উট্রাম। কেউ কেউ বলতেন বিশ্বের অন্যতম নয়নসুখ ভাস্কর্য। কিন্তু এঁকে এখান থেকে না-সরানো পর্যন্ত নতুন নেতাদের ঘুম ছিল না। শেষপর্যন্ত লোকটিকে সরিয়ে কী এমন লাভ হলো, জনগণের কী উন্নতি হলো তা এখনও হিসেব হয়নি। কিন্তু সে তো আর এক গল্প। অশ্বারোহীর জায়গায় যাঁকে বসানো হলো, তিনি তো কখনও একটি পিঁপড়েকেও গায়ের জোরে ভিটেছাড়া করতে চাননি। বেঁচে থাকলে এই উচ্ছেদ মহাত্মা গান্ধী কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না, হয়তো কলকাতার রাস্তায় বসে অনশন শুরু করতেন। বিখ্যাত হওয়ার এবং পাবলিকের খরচে স্ট্যাচুর যোগ্য হওয়ার হাজার হাঙ্গামা এই নিউ ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারতে, যার জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্টের মধ্যরাতে এবং যার অন্নপ্রাশন ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি।

বেঙ্গল ক্লাবের এক সীমানায় পার্ক স্ট্রিট। জনস্রোত থেকে যদি নদীর সৃষ্টি সম্ভব হতো তা হলে বলা চলতো পার্ক রিভার, অথবা টেম্‌স, কিংবা শ্যেন! পূর্বমুখো হয়ে দাঁড়ালে এই নদীরই লজ্জাবতী শাখা রাসেল স্ট্রিট যা একটু এগিয়ে গিয়েই মিডলটন নামের এক ইংরেজ পুরুষের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করেছে। এক কথায়, চমৎকার চৌহদ্দি—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে স্মরণে রেখে মোহময়ী মহানগরীর পিনোন্নত বক্ষদেশের সঙ্গেও এর তুলনা করতে লোভ লাগে।

পরপর কয়েকদিন এই অঞ্চলেই ঘনঘন পাক খাচ্ছি। সাংবাদিক সায়েব আমার মধ্যে বেঙ্গল ক্লাব সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়ে বিদায় নিয়েছেন খবরটা পেয়ে ব্যান্ডোদা টেলিফোনে কড়া নির্দেশ পাঠিয়েছেন। "এবার ঝটপট লিখে ফেল বেঙ্গল ক্লাব সম্পর্কে—স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেকার বেঙ্গল ক্লাব সম্পর্কে এখন না লিখলে আর কবে লিখবি?"

আসলে ব্যান্ডোদা জানেন, যারা পঞ্চাশোর্ধ্ব, ১৯৪৭-এর ১৫ই অগস্টের স্মৃতি যারা এখনও সচেতনভাবে বহন করছে, তাদের দিন শেষ হতে চলেছে। এখনই সব কিছু লিপিবদ্ধ না হলে অনেক কিছু হারিয়ে যাবে

চিরতরে।

আমাদের প্রজন্মের মানুষদের কথা সত্যিই একটু আলাদা—আমরা একসময় ইস্কুলে ইউনিয়ন জ্যাককে সম্মানিত করেছি, আবার রাস্তায় বন্দেমাতরম শব্দ শুনতে-শুনতে ভেবেছি ভারতবর্ষের পরবর্তী পতাকার মধ্যে অবশ্যই থাকবে চরকা, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে চরকা হারিয়ে গেলো, শেষপর্যন্ত আমরা পেয়েছি অশোক চক্রকে।

যারা সীমানার ওপারে পূর্ব পাকিস্তানে একসময় বসবাস করেছে তারা অন্য পতাকা দেখেছে তারপর বিতাড়িত হয়ে, এবং যথাসর্বস্ব হারিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সীমানা অতিক্রম করে এই তেরঙার সুরক্ষা ভিক্ষা করেছে। এই অদ্ভুত যুগের কোনও সাক্ষী জীবিত থাকবেন না যখন ২০৪৭ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ক্লাব তার দুশো কুড়ি বছর পূর্তি উৎসব পালন করবে। অতএব পুরনো যুগের মানুষদের বুকের মধ্যে যা লুকিয়ে আছে, যা এখনও প্রকাশিত হয়নি, তার খোঁজ নিয়ে নাও, যাবার আগে সব কিছু বলে এরা বুক হাল্‌কা করুক, সময়ের বিচিত্র রসিকতা সম্বন্ধে কোনও তথ্যই যেন অব্যক্ত অথবা অপ্রকাশিত না থাকে।

ব্যান্ডোদার পরামর্শ অনুযায়ী পায়ে হেঁটে আমি বারবার প্রদক্ষিণ করছি আমার নতুন বিষয়বস্তুকে, ভাবছি ইতিহাস কেন কথা কয় না? ইতিহাস কি সত্যিই বোবা? না লজ্জাবতী? না চির উদাসীনা? সময়ের সঙ্গে গোপন গাঁটছড়া বেঁধে সে বয়ে চলে নদীর মতন আপন খেয়ালে। উদ্ধত মানুষের অহংকে অবজ্ঞা করার জন্যেই যেন সে ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকিয়ে রাখে—মানুষকে সে চিনতেই চায় না।

মাঝে মাঝে দূর থেকে বেঙ্গল ক্লাব গৃহ নিরীক্ষণ করতে-করতে এও ভেবেছি, ইতিহাসকে দিয়ে কথা না বলিয়ে নিলে মানুষের মস্ত লোকসান। যা একবার হারিয়ে যাবে তা তো চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাবে। বেঙ্গল ক্লাবের বাড়িটা, তার দেওয়াল বা দরজা দেখে অনাগত কালে কিছুই তো বোঝা যাবে না। প্রায় একই অনুভূতি অনেক দিন আগে আমার হয়েছিল চৌরঙ্গীর শাজাহান হোটেল ছেড়ে নগরীর রাজপথে বেরিয়ে আসার সময়। তারপর কতবার রাতের গভীরে নিওন আলোয় সুশোভিত অট্টালিকার

সামনে দাঁড়িয়ে বলেছি, কথা কও, কথা কও। কিন্তু সে চির নিরুত্তর।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বোকার মতন পার্ক স্ট্রিটের কুইনস্ ম্যানসনের সামনে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আমি এসব ভাবছিলাম ঠিক খেয়াল নেই। এমন সময় ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতন আবির্ভূত হলেন এক বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোক। আজকাল বুড়ো শব্দটা অশোভন হয়ে গিয়েছে, নতুন এই সমাজে কেউ তো বুড়ো হয় না। সিটিজেন থেকে তাঁদের পদোন্নতি সিনিয়র সিটিজেনে, বাংলায় বলা চলে বর্ষীয়ান নাগরিক।

যে ভদ্রলোক সস্নেহে আমাকে দেখে পিঠে হাত রাখলেন তাঁর আদি নাম অবশ্যই একটা আছে, কিন্তু নগর কলকাতার হাই সোসাইটিতে তিনি পিন্টো সান্ডেল বলেই সুপরিচিত। এই ভদ্রলোক এক সময় স্যর ব্রায়ান রে-র বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। সেই জাঁদরেল বাঙালি কোম্পানি-ডিরেক্টরের কথা সীমাবদ্ধ উপন্যাসে কিছুটা লিপিবদ্ধ আছে। স্যর ব্রায়ান রে অর্থাৎ বরেন রায়ের মতন মানুষ এদেশে আর জন্মাবে না।

বড়ই স্নেহপ্রবণ মানুষ মিস্টার পিন্টো সান্ডেল। একবার রসিকতা করে আমাকে বলেছিলেন, "সত্তর স্পর্শ করার পরে কোনও পুরুষমানুষকে বয়স জিজ্ঞেস করা অশোভন। পুরুষমানুষের বয়েস আবার জিজ্ঞেস করতে পারেন নাইনটি থেকে। তখন বয়সটাই হয়ে ওঠে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান অ্যাসেট! নিজেই লোককে ডেকে বলবে, জানো আমি নাইনটি!"

সাধারণ সামাজিক পরিস্থিতিতে মিস্টার পিন্টো সান্ডেলের মতন মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচিত হওয়ার কথা নয়। সান্ডেল থাকেন বার্ডওয়ান রোড, আলিপুরে ; প্রায়ই ফরেনে চলে যান, বিশেষ করে জুন মাসে তাঁকে কিছুতেই ক্যালকাটাতে পাবেন না। ওই সময় মিস্টার সান্ডেল লন্ডনের ঠিকানা দিয়ে একটা ভিজিটিং কার্ড চালু রাখেন—বলা বাহুল্য লন্ডনের ঠিকানা খোদ ওরিয়েন্টাল ক্লাব!

একবার মিস্টার সান্ডেলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "বিলেতের ওরিয়েন্টাল ক্লাবের মেম্বার হলেন কী করে? কোনও ইন্ডিয়ানের পক্ষে সে তো ভীষণ শক্ত ব্যাপার! প্রায় নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মতন।"

মাথাঠাণ্ডা মানুষ এই মিস্টার সান্ডেল। অতিরঞ্জন, অতি-কথন একেবারেই পছন্দ করেন না। তিনি বলেছিলেন, "নোবেল নয়, বলতে পারেন ম্যাগসেসে প্রাইজ। একসময় প্রতীচ্য দেশ থেকে যেসব সায়েব বিরাট প্রফেশনাল সাফল্যের পর, স্যর ট্যর হয়ে বিলেতে ফিরে যেতেন তাঁরাই কেবল দাপটে এই ক্লাবের সভ্য হতে পারতেন। ইংরেজ এদেশে আরও দশটা বছর থেকে গেলে আমরাও স্যর হয়ে যেতাম। ব্যাপারটা বুঝুন। ব্যাট্‌ল অব প্লেসি যেন হলো কত সালে?"

"১৭৫৭।" আমি খেই ধরিয়ে দিলাম।

"ওয়েল, মিউটিনি হলো তার ঠিক একশো বছর পরে। সেটা কন্ট্রোলে এনে আর একটা সেঞ্চুরি কমপ্লিট করলে ইংরেজের কি এমন অসুবিধে হতো? সেই হিসেবে, ১৯৫৭ হচ্ছে ইংরেজের ডিউ টাইম। কিন্তু, মজার ব্যাপার হলো, আমাদের যেমন বছর তেরো মাসে, জেনুইন সায়েবদের তেমন বছর হলো এগারো মাসে। দুড়ুম করে আগাম প্যাক আপ করে, ইনিংস ডিক্লেয়ার করে সায়েবরা ইন্ডিয়া থেকে চলে গেলেন।"

মিস্টার সান্ডেল একবার কয়েকজন অনুরাগীকে তাঁর ককটেল পার্টিতে বলেছিলেন, "এটাও মনে রাখতে হবে যে ইংরেজ প্রথমে ঘোষণা করেছিল, ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে যাবে জুন ১৯৪৮ সালে, কিন্তু তার এগারো মাস আগে ১৫ই অগস্ট ওরা সরে গেলো. ওদের চিরকেলে ফিলজফি হলো বেটার আর্লিয়ার দ্যান অন টাইম। আর আমাদের হলো বেটার লেট দ্যান নেভার।"

ওরিয়েন্টাল ক্লাবের ব্যাপারে আজকাল মনে একটু দুঃখ হয়েছে মিস্টার সান্ডেলের। "মশাই, এখন এই কলকাতা থেকেই আধ ডজন মেম্বার হয়ে গিয়েছে ওখানে।" মুড়ি-মিছরি একদর না বলে তিনি বলেন, "ব্রেড অ্যান্ড কেক-এর কখনও এক দাম হওয়া উচিত? ওই প্রস্তাব দিয়েই তো ফরাসি সম্রাজ্ঞী মারি আঁতোয়াকে গিলোটিনে মাথা রাখতে হয়েছিল।"

মিস্টার সান্ডেলের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার যোগাযোগ থাকার কথা নয়। কিন্তু ওঁর এক শ্যালিকা তাঁর প্রিয় জামাইবাবুকে আমার সীমাবদ্ধ উপন্যাসের চলচ্চিত্র দেখিয়ে মূল বাংলা উপন্যাসটি উপহার দিয়েছিলেন।

বই পড়ে মোটেই রাগ করেননি, তিনি বরং শ্যালিকার সান্নিধ্যে ছবিটাও খুব এনজয় করেছিলেন। বার্ডওয়ান রোডের বাড়িতে আমাকে ডেকে একবার চা খাইয়েছিলেন, তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এই কোম্পানি ডিরেকটর স্যর ব্রায়ান রে'টি কে? আশা করি অমুক," এই বলে এক বঙ্গসন্তানের নাম উল্লেখ করেছিলেন। আমার বিপদ হলো, সেই ভদ্রলোক আবার ফোন করে অন্য এক প্রায়-সায়েব বাঙালির নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন।

সেই থেকে মিস্টার সান্ডেলের ভালবাসার শিকলে বন্দী হয়ে গেলাম। পিন্টো সান্ডেল আমাকে অকাতরে স্নেহপ্রশ্রয় দিয়েছেন, বলেছেন, "অল্প নলেজ নিয়ে এই সব বিষয়ে লেখা খুবই কঠিন, সায়েবরা কতো খবরটবর নিয়ে রাজ-এর হিস্ট্রি লিখে রাখছে অনাগত কালের জন্যে, আমরা অ্যানটি-রাজ বিষয়টাও ম্যানেজ করতে পারছি না। তবে সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং"—সুতরাং অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে উপদেশ দিয়েছিলেন মিস্টার সান্ডেল। দয়াপরবশ হয়ে তিনি আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন যখন-তখন ফোন করার, এমনকি লন্ডনের গোপন ফোন নম্বরও দিয়েছেন। আর সস্নেহে নিজের পার্টিতে কয়েকবার আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন, যদিও তিনি জানেন আমি কখনও ডালভাত ছাড়া কিছুই ওঁকে খাওয়াতে পারবো না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, বেগুনে ওঁর অ্যালার্জি, ডেনটিস্টের পরামর্শ অনুযায়ী ডাঁটা-চচ্চড়ি খাওয়া বারণ এবং মাছের সরু কাঁটা তিনি সেই বাল্যবয়স থেকেই ম্যানেজ করতে পারেন না। পারবেন কী করে? বিলেতের পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। "খোঁজ নিয়ে বলুন, হ্যারোর ছাত্র নেহরু চারা মাছের কাঁটা ম্যানেজ করতে পারতেন কি না? এয়ার মার্শাল সুব্রতটা তো শ্বাসনালিতে মাংস ঢুকিয়ে বেঘোরে মারা গেলো টোকিওর রেস্তোরাঁয়।"

মিস্টার পিন্টো সান্ডেলের আদি নাম পান্নালাল সান্যাল—এই নাম কেমন করে পিন্টো সান্ডেল হলো তা নামের মালিক নিজেও ভালভাবে জানেন না। পান্নালাল সান্যাল বলে ডাকতে গেলে হাঁপের রোগ ধরে যেতো, অথচ ঠাকুমাও নাছোড়বান্দা, তাঁর আদরের পান্নালালের অন্য নাম

তিনি ভাবতেও পারেন না। ঠাকুমা কবে চলে গিয়েছেন, বিশ্বসংসারে এখন পান্নালাল বলবার কেউ নেই।

বড় স্নেহপ্রবণ মানুষ এই পিন্টো সান্ডেল। আমরা কখনও পিন্টোদা, কখনও অবস্থা বুঝে মিস্টার সান্ডেল বলার অনুমতিও পেয়েছি। কিন্তু আমার মতন বয়োকনিষ্ঠকেও তিনি আপনি বলেন, মনে করিয়ে দেন, ডাঃ বি সি রায়ের একটা ব্যাড হ্যাবিট ছিল সবাইকে তুমি বলা—অথচ বিদ্যেসাগর মশাই তাঁর বইগুলোতে বারবার তুই, তুমি এবং আপনি শব্দগুলোর পার্থক্য বুঝিয়ে গিয়েছেন।

অক্সফোর্ডে এম. এ. করলেও বাংলার এসব পিন্টোদার অজানা নয়। কিছুদিন আগে ফয়েলস-এর দোকানে তিনি বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের খোঁজ করেছিলেন, লন্ডনে বইটা না পেয়ে আমাকে ফোন করলেন, এক কপি দ্রুত পাঠিয়ে দিয়েছি। পিন্টোদার এই বয়সে বর্ণপরিচয়ে কৌতূহল হবার কথা নয়। কিন্তু ফার ইস্টার্ন রিভিউয়ে বর্ণপরিচয় সম্পর্কে মস্ত এক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ওরিয়েন্টাল ক্লাবের বাররুমে কেউ কেউ তাঁকে পানডিট্ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, সেই জন্যে একটু ঝালিয়ে নেওয়া!

এই মিস্টার সান্ডেলই আমাকে পাকড়াও করলেন রাসেল স্ট্রিটের ফুটপাথে। সাটন সিড্স-এর দোকান থেকে চারা কিনে নিয়ে তিনি বেরুচ্ছিলেন। সেই সঙ্গে কিছু ধানিলঙ্কার বীজ!

বিলেত থেকে এক সায়েব বন্ধু এসেছেন, বার্ডওয়ান রোডে তাঁর আতিথ্য নিয়েছেন। তাঁর ভীষণ ইচ্ছে লন্ডনে এই ধানিলঙ্কার চাষ করেন নিজের গার্ডেনে। অলরেডি এগারো রকম লঙ্কাগাছ লাগিয়েছেন। ভীষণ ঝালের নোলা হয়েছে সায়েবদের ইদানীং, অথচ এখানে আমাদের ঝালে ভীতি ধরানো হচ্ছে! যতো বেশি সাকসেস, ততো কম ঝাল, এই হচ্ছে এখনকার ইন্ডিয়ান পরিস্থিতি! বিলেতে ঠিক উল্টো।

"বেঙ্গল ক্লাব সম্পর্কে লেখার বাসনা হয়েছে আপনার!" প্রায় আকাশ ভেঙে পড়লো পিন্টো সান্ডেলের মাথায়।

"বাসনা আমার নয়, ব্যান্ডোদার," সবিনয়ে জানালাম। মিস্টার সান্ডেল বললেন, "তার মানে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যোগ্য লোকের অভাব হচ্ছে,

অথচ এ দেশে একশো কোটি লোক। একবার ইংরেজদের কথা ভাবুন! ওইটুকু দেশ, ওই ক'টা লোক—তবু নিজের দেশ চালিয়েও, হ্যান্ড পিক্ড লোকদের পাঠিয়েছিল এই কলকাতায়! দেখছেন তো সামনের বাড়িটা। কে থাকতেন ওখানে? স্বয়ং টমাস ব্যাবিংটন মেকলে—এতো বড় প্রতিভাধর পণ্ডিত বিলেতেও বেশি জন্মাননি, তবু কর্তব্যের বোঝা বইতে এখানে এসেছিলেন। শুনুন মশাই, বিশ্বযুদ্ধের পরেই যেদিন ইংরেজ বুঝতে পারলো যে এই সাম্রাজ্য চালাতে লোকাভাব হবে অমনি লর্ড ওয়াভেল এবং মাউন্টব্যাটেনকে পাঠিয়ে দিলো এখানকার পাট গুটিয়ে ফেলবার জন্য।"

সত্যিই আমার সীমিত ক্ষমতা, এ বিষয়ে আমার নিজের মনে কোনও সন্দেহ নেই, তবু লজ্জা-লজ্জা করতে লাগলো। আত্মপক্ষ সমর্থনে শুধু বলা যায়, একদা আমি হোটেল নিয়ে একখানা নবেল নামিয়েছিলাম। পিন্টো সান্ডেল আমার উৎসাহের আগুনে আরও এক ঘটি জল ঢেলে দিলেন, "হোটেল এবং ক্লাব যে এক জিনিস নয়, তা বুঝলেন না কেন আপনার ব্যান্ডোদা? টলি ক্লাবে দেখা হলে ওঁকে বলতে হবে তো? শুনুন মশাই, হোটেল যদি হয় সায়েবদের ধরমশালা তা হলে ক্লাব হলো গিয়ে সায়েবদের ভদ্রাসন।"

আমি মাথা নিচু করে আছি। সাটন কোম্পানির চারাগুলো সামলাতে-সামলাতে মিস্টার সান্ডেল বললেন, "ভয় পাবেন না, অধৈর্যও হবেন না! বছর পাঁচেক এই বেঙ্গল ক্লাব নিয়ে সারাক্ষণ লেগে থাকুন, তারপর একটা আউট লাইনে ভেবে দেখা যাবে!"

আমার বাক্যরহিত! পিন্টো সান্ডেল একটু বিরক্ত হলেন। "বুঝেছি! এইটাই বেঙ্গল ক্লাব সম্পর্কে লেখার শ্রেষ্ঠ সময়। কিন্তু আপনাদের প্রস্তুতি কোথায়? স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর যে ১৯৯৭ সালে পড়বে তা তো ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্টের মধ্যরাত থেকেই মানুষের জানা। ইংরেজদের কথাই ভাবুন, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজ প্রস্তুত হতে আরম্ভ করেছে ১৮৫৭ সাল থেকে, ওই সময়েই তারা মনে মনে বুঝে নিয়েছে, ইন্ডিয়া এবং ইংলন্ড একেবারে আলাদা, তেলে জলে কিছুতেই মিশ খাবে

না।”

আমার নীরবতা এবার ফল দিলো। মিস্টার সান্ডেল সখেদে বললেন, “বুঝেছি, আমরা নিজেরাই নিশ্চিত ছিলাম না, পঞ্চাশ বছর ধোপে টিকব কি না। ওই দুর্মুখ চার্চিলটা যা সব বাজে কথা বকে গিয়েছে না!”

দুঃখ পেলেন মিস্টার সান্ডেল। তারপর বললেন, “ক্যালকাটার লেখকরাও এখনও মানে-বই পড়ে, সাজেশন বুক হাতে নিয়ে ইতিহাস লিখতে বসতে চায়! আগে তো এমন ছিল না!”

আগের বিখ্যাত বাঙালি লেখকদের সমস্ত খবরাখবর কী রাখেন মিস্টার পিন্টো সান্ডেল?

মনের সব কথা সুবিশাল অভিজ্ঞতা থেকে আন্দাজ করতে পারেন মিস্টার সান্ডেল। তিনি বললেন, “ধরুন, কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা! হুতুম প্যাঁচার নকশা, বাংলায় মহাভারত কি তিনি এইভাবে মানে-বই মুখস্ত করে লিখেছিলেন?”

“আপনি কালীপ্রসন্ন সিংহ মশায়ের চর্চা করেছেন!” আমার বিস্ময় চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠলো।

“না করে উপায় আছে এই বেঙ্গল ক্লাবের সিনিয়র মেম্বারদের? এখানেই তো থাকতেন মেকলে সায়েব, নিজেই নিজের বাসগৃহের প্রশংসা করে তিনি লিখছেন, শহরের সেরা বাড়িটাতেই আমি থাকি। কিন্তু জানেনই তো বিহাইন্ড এভরি গ্রেট ইংলিশম্যান ইন ইন্ডিয়া দেয়ার ওয়াজ অলওয়েজ এ গ্রেট ইন্ডিয়ান! বলি, এই বাড়িটার মালিক ছিল কে? স্বয়ং কালী সিংহি মশায়। পরবর্তীকালে ক্লাবকে তাঁর সঙ্গে স্পেশাল ব্যবস্থা করতে হয়েছে এই মেকলে নিবাসের সম্পত্তিতে থাকবার জন্যে।”

এবার আমি উৎসাহ পেয়ে বললাম, “আমার ভয় ছিল একেবারে সাহেবি কাণ্ড এই বেঙ্গল ক্লাব—ঠিকানা ছাড়া আর কোথাও কোনও বেঙ্গলত্ব নেই এই প্রতিষ্ঠানের। অথচ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে একটা চমৎকার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।”

“আপনারা যে ধৈর্য ধরে কোনও একটা বিষয় ইংরেজ বা আমেরিকান লেখকদের মতন অনুসন্ধান করেন না! তাই তখনকার সব ইতিহাস বাসি

দুধের মতন কেটে যায়। শুধু কালী সিংহমশায় কেন? আপনারা নীলদর্পণ নিয়ে মাতামাতি করেন। দীনবন্ধু মিত্তিরমশাই তো বাংলায় নাটক লিখে খালাস। কিন্তু সেই নাটক ইংরিজিতে প্রকাশ করলো একজন ইংরেজ। তার নাম কী?"

এটা আমার জানা বিষয়। লং সায়েব—রেভারেন্ড জেমস লং বঙ্গবন্ধু।

খুশি হলেন মিস্টার সান্ডেল। "গুড। কিন্তু ইংরিজি অনুবাদ ছাপিয়ে লং সায়েব যখন মামলায় জড়িয়ে পড়লেন তখন তাঁর বিচার করলেন কে?"

আমার অতশত জানা নেই। মিস্টার সান্ডেল সাটন কোম্পানির চারা দোলাতে দোলাতে বললেন, "আমাদের এই বেঙ্গল ক্লাবের এক মেম্বার—স্যর মরডন্ট লুই ওয়েলস্। ১৮৫৯ থেকে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন, লেটারস্ পেটেন্ট ইস্যু হবার পরে ক্যালকাটা হাইকোর্টের জজ। তারপরে ১৮৬৪-তে আমাদের এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। শুনুন মশাই, তখনকার সুপ্রিম কোর্টের ওইটাই শেষ বিখ্যাত মামলা। এটাও জেনে রাখুন, শুধু নীলদর্পণ নাটকের জন্যে ইংরেজরা লং সায়েবের বিরুদ্ধে মামলা করেনি, মানহানির মামলাটা হয়েছিল রেভারেন্ড লং-এর ইংরিজি অনুবাদের ভূমিকা নিয়ে, যাতে ইংলিশম্যান কাগজ এবং দৈনিক 'দ্য বেঙ্গল হরকরার' মানহানি হয়েছিল, আর নীলকর সায়েবরা অপমানিত হয়েছিলেন মূল নাটকে। সায়েবরা মশাই দিশি বানানটানান তেমন সামলাতে পারতেন না, তাই ইংরিজিতে লিখতেন 'হারকারু'—অনেকটা 'হারাকিরি'র মতন। তা এই মামলায় আমাদের ক্লাব মেম্বার স্যর মরডন্ট লুই ওয়েলস্ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে এক মাসের জেল এবং এক হাজার টাকা জরিমানা করেছিলেন।"

এতে গর্ব করার কী আছে? বিনীতভাবে জানতে চাইলাম আমি। হেসে ফেললেন মিস্টার সান্ডেল। "আপনার বয়স কম, সবে সিনিয়র সিটিজেন হয়েছেন, এখনও ওয়ার্লড ফেমাস ইংলিশ ধৈর্যের স্বাদ পাননি। শুনুন, এতেও আমাদের বেঙ্গল ক্লাবের গর্ব। লং সায়েবের জরিমানার টাকা তৎক্ষণাৎ গুনে দিয়ে এলেন কে? স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ, অর্থাৎ আমাদের বাড়িওয়ালা। অথচ, এ নিয়ে ক্লাবের সায়েব মেম্বাররা একটা কথাও

তুললেন না। একটা খবর চুপিচুপি দিয়ে রাখি, অনেকে ঠিক জানে না, নীলকর সায়েবদের মূল রাগ ছিল আমাদের ক্লাবের আরেক প্রেসিডেন্টের ওপর, তাঁর নাম স্যর জন পিটার গ্রান্ট। এই সায়েব পরপর চার বছর ক্লাব প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ছিলেন বাংলার ছোটলাট! অথচ এখন কলকাতার পুঁচকে একটা গলির নাম গ্রান্ট স্ট্রিট! যেখানে ছিটকাপড় ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না।”

রাসেল স্ট্রিটে আজকাল গাড়ি রাখার হাজার হাঙ্গামা। কিন্তু মিস্টার সান্ডেলকে এসব অসুবিধে একেবারেই পোহাতে হয় না। তাঁর গাড়ি থাকে বেঙ্গল ক্লাবের চৌহদ্দির মধ্যে। অতএব ওই দিকেই এগিয়ে চললাম আমরা।

আগে মিস্টার সান্ডেলের একটা বেন্টলে গাড়ি দেখেছি। বুড়ো হয়ে গাড়িটা একটু হাঙ্গামা বাধায় মাঝে মাঝে। প্রত্যেকটা কোম্পানি, যাদের সঙ্গে মিস্টার সান্ডেল জড়িত চেয়ারম্যান অথবা ডিরেক্টর হিসেবে, তাঁরা বার বার ওঁকে অনুরোধ করেছেন, মার্সেডিজ অথবা বি এম ডবলু নেবার জন্যে। কিন্তু রাজি নন মিস্টার সান্ডেল। “মুখে কিছু বলি না, কিন্তু এই জার্মানগুলো যুদ্ধের সময় কী জ্বালান জ্বালিয়েছে। ইংরেজদের সমস্ত দুঃখ তখন সমভাবে শেয়ার করেছি, যাদের কিছুটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতি আছে, তারা জার্মান গাড়ি চড়তে অবশ্যই অস্বস্তিবোধ করবে।”

এই একই কারণে, জাপানি গাড়ি ব্যবহার করেন না মিস্টার সান্ডেল। “ওরা কী কাণ্ডটাই না করেছে ফার-ইস্টে। আর আমেরিকান গাড়ি? সে আর বলে কাজ নেই! এই ইদানীং একটু পাতে দেবার মতন গাড়ি তৈরি করছে আমেরিকানরা। বাজারহাটে যাবার সময় বেন্টলি বার করা যায় না, তাই একটা ওপেল অ্যাস্ট্রা ও একটা কোরিয়ান গাড়ি নিয়েছি। কোরিয়ান সিয়েলো বেচারা কোনও অপরাধ করেনি, বরং বহুদিন জাপানিদের হাতে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছে।”

আমার ওপর ভীষণ মায়া পড়ে গিয়েছে মিস্টার সান্ডেলের। বললেন, “আপনি নিজেও ডুববেন, আমাদেরও ডোবাবেন, এই ভাবে একটা আনতাবড়ি জয় বেঙ্গল লিখলে। অথচ আপনি বলছেন, ১৫ অগস্টের মধ্যে

আপনাকে লেখাটা নামিয়ে ফেলতেই হবে। পচা ভাদ্দরে আমার ঠাকুমা, যিনি আমার পান্নালাল নাম রেখেছিলেন তিনিও কিছু করতে চাইতেন না।"

"আপনি পাঁজির খবর রাখেন?" আমার বিনীত প্রশ্নের সঙ্গে কিছুটা বিস্ময় মিশে গিয়েছিল।

"কী বলছেন মশাই! স্যার পার্সিভ্যাল গ্রিফিথস্ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁকে এয়ারমেলে পাঁজি পাঠাতে হতো। আমার লাইব্রেরিতেও এক কপি রেখে দিয়েছি। ১৯০০ সাল থেকে আমার ঠাকুমা প্রতিবছর পাঁজি সংগ্রহ করে গিয়েছেন। সেসব এখনও সাজানো রয়েছে।"

মিস্টার সান্ডেল বললেন, "শুনুন, এই বেঙ্গল ক্লাবকে সাধারণ বাঙালি চিরদিন ভুল বুঝে এসেছে, যেহেতু এখানে ইন্ডিয়ানদের মেম্বার করা হতো না। সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেও বাঙালিরা মজা পেয়েছে।" কিন্তু ভুলের পুনরাবৃত্তি মিস্টার সান্ডেল কিছুতেই হতে দেবেন না। বললেন, "আপনাকে পাঠানো উচিত ছিল পাস্ট-প্রেসিডেন্ট মিস্টার ভাস্কর মিটারের কাছে এবং সম্ভব হলে পাস্ট-প্রেসিডেন্ট জহর সেনগুপ্তের কাছে। এই দু'জনেই খানদানী বণিকসভা অ্যাসোচ্যামের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। বেঙ্গলিদের পক্ষে দুর্লভ সম্মান। ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট হোল্ডার না হলে এতোদিন এঁদের দু'জনকেই স্যর ভাস্কর এবং স্যর জহর বলে ডাকতে হতো। জানেনই তো বহুবছর ধরে অ্যাসোচ্যাম চেম্বার প্রেসিডেন্টের জন্যে রাজা অথবা রানির নাইটহুড বাঁধা ছিল। শেষ সম্মান পেয়েছে বোধহয় শ'ওয়ালেসের টোনি হেওয়ার্ড। এখনকার সরকার এতোই কেপ্পন যে চেম্বার প্রেসিডেন্টকে পদ্মভূষণটাও দেয় না, তার কারণ সরকার মনে করে, দেশের সংগঠনে বিজনেসের কোনও ভূমিকা নেই। বুঝবে। পরে হাড়ে হাড়ে বুঝবে এবং তখন দেবে ভুলের মাসুল!" ভবিষ্যদ্বাণী করলেন মিস্টার সান্ডেল।

মিস্টার সান্ডেল সত্যিই খুব মুশকিলে পড়েছেন আমার মতন অর্বাচীনকে নিয়ে। তিনি হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপর ওপেল গাড়ির শোফার আবদুলকে বললেন, "গাছগুলো বাড়িতে পৌঁছে, মেমসায়েবকে খবর দেবে আমার জরুরি মিটিং। তারপর খানা খেয়ে এখানে ফিরে আসবে। এবার বেন্টলে আনবে। যেতে হবে টি কোম্পানির

বোর্ড মিটিংয়ে।”

আমাকে বেঙ্গল ক্লাবের ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে মিস্টার পিন্টো সান্ডেল উত্তর দিকে টার্ন নিলেন। এ-বাড়ির ভিতরে ঢুকলেই বিশেষ একধরনের অনুভূতি হয়। ইতিহাসের গন্ধ সারাক্ষণ ভুরভুর করছে, যদিও কাচের দরজায় প্রায় জ্যান্ত একটা গোখরো সাপের ছবি আমার মতন নবাগতকে নার্ভাস করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। নন-মেম্বারদের মরণকামড় দেবার জন্যেই যেন এই কিং কোবরা দিনরাত ক্লাবের প্রবেশদ্বারে পাহারা দিচ্ছে।

পুরুষ টয়লেটের কাছেই অতিথিদের জাবদা খাতা শোভা পাচ্ছে। অন্দরমহলে প্রবেশের আগে ওখানেই নাম লেখাতে হয়। ওই খাতায় সই করলেন বহুদিনের মেম্বার পিন্টো সান্ডেল।

এ-বাড়ির লিফটের অবয়ব ঐতিহাসিক, কিন্তু সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণের ফলে রকমসকম বেশ আধুনিক। মিস্টার সান্ডেল বললেন, “এইটাই আমাদের ফিলজফি—আবরণটা প্রাচীন, কিন্তু ভিতরে নবীন ; বাইরে কনজার্ভেটিভ সংরক্ষণশীল, ভিতরে ভীষণ লিবারেল। শুধু একটা ব্যাপারে আমাদের ভিতর-বার এক—এখানকার কালচার হানড্রেড পারসেন্ট ব্রিটিশ। ব্রিটিশরাও স্বীকার করেন, এখন খোদ বিলেতেও এমন ব্রিটিশ কালচার নেই ; তাই হঠাৎ কলকাতায় এসে বেঙ্গল ক্লাবে ঢুকলে সিনিয়র সায়েবরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। একটু বয়সী, জেনুইন ইংরেজ নিজের শিকড় হঠাৎ খুঁজে পেয়ে আত্মহারা হয়ে ওঠেন, সংযমের ব্রেক ফেল করেন এবং দুটো ড্রিংক বেশি খেয়ে ফ্যালেন এই বেঙ্গল ক্লাবে।”

মিস্টার সান্ডেল এবার বললেন, “এই যে জাবদা খাতা দেখলেন, ওটা ওল্টালেই আপনার একখানা মহাভারত লেখা হয়ে যাবে। জেনারেল ম্যাকআর্থার থেকে মাউন্টব্যাটেন, ফিল্ডমার্শাল উইলিয়ম স্লিম—যুদ্ধের সময় এবং তারপরে রানির বংশধর প্রিন্স অফ ওয়েলস পর্যন্ত কে এখানে অতিথি হননি ? আপনি তো ডানলপের বড়সায়েব অ্যালিস্টার ম্যাকইন্টায়ারকে চিনতেন, ওঁকেই একটা চিঠি লিখে দিন না। কলকাতায় আর কিছুদিন থাকলেই তো উনি ক্লাব প্রেসিডেন্ট হয়ে যেতেন। স্বয়ং রাজপুত্র প্রিন্স চার্লস

ভারত ভ্রমণের পরে ওঁর আদরযত্নে খুশি হয়ে অ্যালিস্টার ম্যাকইন্টায়ারকে সি বি ই করে দিলেন, অথচ অ্যালিস্টার যা আপ্যায়ন করেছিলেন তাতে নাইটহুড দিলেও বেশি হতো না।" রাজপরিবারকে কৃপণ হতে দেখলে রাজ অনুরাগীদের আজকাল ভীষণ দুঃখ হয়।

উপরে উঠে পুবমুখো হলেই বেঙ্গল ক্লাবের ভুবনবিদিত নাগরাজ বার। এখানেও একটা বিষধর সাপ নন-মেম্বারদের ছোবল মারার জন্যে উঁচিয়ে আছে। দরজা ঠেলে নিজের ফেভারিট টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার সান্ডেল, কিন্তু বসবার কোনও প্রচেষ্টাই করলেন না যতক্ষণ না চেনা আবদার এসে স্যালুট করলো এবং চেয়ার টেনে সান্ডেল সায়েবের ঢোকবার জায়গা করে দিলো।

এইটাই এখানকার সংস্কৃতি। সব কিছুতেই সারাক্ষণ একটা প্রসন্নভাব, কোথাও হুড়াহুড়ি নেই, হুমড়ি খেয়ে পড়ার অভব্যতা নেই—অথচ সবাই জানে একদিন এখান থেকেই আসমুদ্র হিমাচল শাসিত হতো।

হেড বারম্যান মহম্মদ ইউসুফ এবার সান্ডেল সায়েবকে দেখে দূর থেকে সেলাম করলো। কাছে আসছে ইউসুফ।

"এইরকম ইউনিফর্ম ব্রিটিশ আইল্যান্ডে আর দেখতে পাবেন না। ইউসুফ জানে এইটাইমে ক্লাবে এলে আমার কী প্রিয়। তবু ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করবে। আমি আজ অর্ডারটা একটু চেঞ্জ করবো আপনার অনারে। হুইস্কি এবং ব্লাইটিপানির বদলে নেব ববিবার্নস—কিছুই নয়, ড্রাই ভারমুথের সঙ্গে হুইস্কি বেনেডিকটাইন। আমাদের খুব কাছের এবং আদরের প্রেসিডেন্ট ছিল ববি মজুমদার, তাঁকেই অমর করে রাখবার জন্যে এই ড্রিংকের নাম। বেনেডিকটাইনরা খুব ধার্মিক ছিলেন, জানেন তো, অপূর্ব ওঁদের মিউজিক— ফ্রান্সে গেলে শুনতে পাবেন।"

মহম্মদ উইসুফ আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলো। "আপনি তো ড্রিংক করেন না স্যর, আপনাকে এবারও কি ভার্জিন মেরি দেবো?"

রহস্যময় হাসি হাসলেন মিস্টার সান্ডেল! "এর নাম বেঙ্গল ক্লাব! কবে আপনি কার গেস্ট হিসেবে এখানে এসে কী পছন্দ করেছিলেন তা এখানকার কর্মীদের মনে থাকে—ওয়ার্ল্ড থেকে এসব সৌজন্য উঠে

যাচ্ছে। একথা আপনার লেখা উচিত। আপনি নিশ্চয় সেবারে হট ড্রিংকস্ রিফিউজ করে ভার্জিন মেরি অর্ডার দিয়েছিলেন।”

নরম পানীয় হিসেবে ভার্জিন মেরি অতি উপাদেয়, যদিও মেজাজে প্রায় ব্লাডি মেরির সমগোত্রীয়। মিস্টার সান্ডেল সস্নেহে বললেন, “ইচ্ছে করলে পিংক প্যানথার ট্রাই করতে পারেন—অরেঞ্জ জুস, পাইন অ্যাপল জুস এবং সেই সঙ্গে একটু স্ট্রবেরি আইসক্রিম।”

ভার্জিন মেরিই ভাল, মিষ্টি কম। আমার মনে পড়লো, ডানলপের এক সায়েবের আমন্ত্রণে প্রথম যখন এই ক্লাবে পদার্পণ করেছিলাম, তখন রামতনু লাহিড়ীর বংশধর সুরসিক সনৎ লাহিড়ী আমার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন।

তিনি আমার কানে কানে বলেছিলেন, “এখানে কোনওরকম দয়ামায়া করবে না। নিষ্ঠুর হতে হবে আজ। মনে রাখবে, এই কয়েকটা বছর আগে ইন্ডিয়ানদের এখানে ঢুকতে গেলে নেপালি দারোয়ানের ঘাড়ধাক্কা খেতে হতো। ইন্ডিয়ানদের এখানে ছিল নো অ্যাডমিশন---স্বাধীনতার পরেও। সুতরাং নির্মমভাবে খাবে, গেরস্তর খরচের কথা ভাববার কোনও প্রয়োজন নেই।”

ববিবার্নসের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে কাজুবাদামে কামড় দিলেন মিস্টার সান্ডেল। ভগবানের দয়ায় শরীরটা মেদহীন আছে। সুগার নেই, রক্তের উচ্চচাপ নেই—এই বয়সে আর কী প্রত্যাশা থাকতে পারে? এখানকার গরমটা একটু কষ্ট দেয়, সে জন্যই তো প্রতি জুনমাসে বিলেত যাওয়া ছাড়া মিস্টার সান্ডেলের উপায় থাকে না।

পিন্টো সান্ডেল এবার বললেন, ‘‘ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল নেতাদের কোনও স্থির পলিসি নেই—ওঁদের মানসিকতা হাজার রকম। একবার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এখানে এলেন দুপুরের খানা খেতে, কথা ছিল এইখান থেকে কোথাও চলে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পণ্ডিতজীকে নিতে এলেন নির্দিষ্ট সময়, কিন্তু তখনও ওঁর খানা শেষ হয়নি। ক্লাবের সায়েবকর্তারা বেরিয়ে এলেন ডাক্তার রায়কে ভিতরে আনতে ; কিন্তু ডাক্তার রায় কিছুতেই বেঙ্গল ক্লাবে পদার্পণ করলেন না। রহস্যটা

আজও পরিষ্কার নয়, আপনি উল্লেখ করতে পারেন, কিন্তু জল ঘোলা করবেন না! নেহরু তো চিরকাল সায়েবদের এবং বুড়োবয়সে মেমসায়েবদের অনুরাগী—যদিও সায়েবরা তাঁকে কথায় কথায় জেলে পাঠিয়েছে।”

“জল ঘোলা করেছে সায়েবরাই, ইন্ডিয়ানদের জন্যে দরজা বন্ধ করে।” আমার এই মন্তব্যে মিস্টার সান্ডেল কিন্তু শান্ত হয়ে রইলেন। বললেন, “এই বিষয়ে আমি কখনও উত্তেজিত হইনি এবং হবোও না। কয়েকজন সমচিন্তার সমভাবের লোক মিলে ক্লাব করে, সেখানে যদি তারা অন্য কালচারের লোকদের সভ্য না করে তো বলবার কী আছে?” প্রশ্ন তুললেন মিস্টার সান্ডেল!

“কিন্তু ইন্ডিয়ানদের এতে অপমান। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিশ্চয় সেটা বুঝতেন!” আমি বলি।

কিন্তু মিস্টার সান্ডেল উত্তর দিলেন, “জ্যোতি বসু তো ওইভাবে চিন্তা করেন না, তিনি তো ক্লাবে আসেন। তিনি তো এখানেও কিংবদন্তি হতে চলেছেন।”

মিস্টার সান্ডেল আরও বললেন, “আপনি প্রাক্তন সভাপতি ভাস্কর মিটারকে জিজ্ঞেস করবেন। আমি কিন্তু সায়েবদের দোষ দেখি না—যদি আমরা কয়েকজন লন্ডনে একটা আড্ডা ক্লাব করি, তা হলে সেখানে সায়েবদের নিতে হবে কেন? এবং না নিলে সায়েবদের কেন অপমান হবে?”

আমার যুক্তি : “আসলে এটা জাতিবৈষম্য এবং বর্ণবৈষম্য, যা সংশোধন করতে স্বাধীনতার পরেও কয়েক বছর লেগে গিয়েছিল বেঙ্গল ক্লাবের। সময়ের শিক্ষাটা শ্বেতকায়রা সহজ ভাবে নিতে দেরি করেছিলেন।” আমি শুনেছি, ক্লাবের কর্মচারীদের পরিবারে তাই ভীষণ ভয় ছিল, বেঙ্গল ক্লাবের সায়েবরা ইজ্জত দেবে না, ক্লাব তুলে দিয়ে চলে যাবে, তিনশো লোকের অন্ন যাবে!

মিস্টার সান্ডেল বললেন, “লোয়ার লেভেলে অনুসন্ধান করে দায় সারাটা বাঙালি লেখকদের স্বভাব! আপনি এখানকার ট্রান্সফার অফ

পাওয়ারের ইতিহাসটা দেখুন না, সবই সৌন্দর্যের সঙ্গে এবং সম্মানের সঙ্গে হয়েছে। ইংরেজ সবচেয়ে ভাল যেটা বোঝে সেটা হলো পয়সা, যে মুহূর্তে সে বুঝেছে, এবার সায়েব ক্লাবের ট্যাকে টান ধরছে, সে মুহূর্তেই ইংরেজ মেম্বার তার চিন্তাধারা পাল্টেছে। মধ্যিখানে একটু মজা হয়েছে। শোনা যায় স্যর রাজেন মুখার্জির তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। স্যর হয়েছেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি করেছেন, মার্টিন বার্ন হৌস প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তখন স্বয়ং বড়লাট একদিন আচমকা তাঁকে বলে বসে আছেন, বেঙ্গল ক্লাবে খেতে আসুন। সেই শুনে হইচই ব্যাপার। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বড়লাটকে সবিনয়ে বললেন, এটা সম্ভব নয়। তবে যখন নেহাতই বলে ফেলেছেন, তখন বিলডিং-এর বাইরে কোথাও সামিয়ানা তুলে সেখানে ইন্ডিয়ান অতিথি আপ্যায়ন করুন। এরপরেই তো ক্যালকাটা ক্লাবের জন্ম হলো। অ্যাজ এ প্রতিবাদ। স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ বলতে পারেন। কিন্তু মিছরির ছুরি মারলেন নতুন ক্লাবের কর্তারা—ওখানে কমিটির অর্ধেক মেম্বার হবেন সায়েব, অর্ধেক স্বদেশি। সভাপতি একবছর সায়েব, একবছর লোকাল। ১৯০৭ সাল থেকে ক্যালকাটা ক্লাবের হিস্ট্রি দেখে নিন। একজন সায়েব প্রেসিডেন্ট বার্ষিক সাধারণ সভায় হার্টফেল করেছেন, কিন্তু তা আর এক সায়েবের কোশ্চেনের খোঁচায়, ইন্ডিয়ানদের এই মৃত্যুতে কোনও হাত ছিল না।" মিস্টার পিন্টো সান্ডেল মিষ্টি করে আমাকে যা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, সাহেবি আমলে বেঙ্গল ক্লাব কাউকে অপমান করলেও তার থেকে ভাল ফল হতো—যে জন্যে আর একটা চমৎকার ক্লাবে যাওয়ার সুযোগ পেলেন কলকাতায় আসলি এবং নকলি সায়েবরা! এইটাই বেঙ্গল ক্লাবের গ্রেটনেস!"

ইতিমধ্যে ভার্জিন মেরি ও ববিবার্নস এসে গিয়েছে। ক্লাবের সুস্বাস্থ্য পান করে মিস্টার সান্ডেল বললেন, "চিয়ারস! ক্লাব সম্পর্কে আপনার বাংলা লেখাটা পাঠযোগ্য হোক—নেটিভ কোয়ার্টারের মতামতের মূল্য নেই একথা বিচক্ষণ ইংরেজরাও কখনও বলতেন না।"

এবার শুরু হলো আমার প্রাথমিক শিক্ষা। হেড বারম্যানকে বলে মিস্টার সান্ডেল আমার জন্যে একটা ক্লাব প্যাড আনিয়ে দিলেন যার

প্রত্যেক পাতার শিরেই সর্পাঘাত!

মিস্টার সান্ডেল বললেন, "একটা কিছু স্কুপ দিতে হবে নিশ্চয় আপনাকে—যা প্যাংক্রিজ সাহেবের লেখা ক্লাবের ইতিহাসেও নেই। শুনুন, ক্লাবের ভিত কাটবার সময় বাস্তুসাপ বেরিয়েছিল। সেই সাপ ফণা তুলে পাহারা দিচ্ছে, কিন্তু নড়তে চায় না। কুলিরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। অগত্যা মনসাতলা থেকে পুরুত আনাতে সায়েবরা রাজি হলেন এবং দুধ কলা দিয়ে পুজো হবার পরে বাস্তুদেব স্বয়ং সরে গেলেন। এইটা এখানে চালু রয়েছে এবং সত্যি ঘটনা। কিন্তু পাশাপাশি আর একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে সম্প্রতি। এখানে বাড়ি হবার আগে থেকেই ক্লাবের প্রতীক এই সাপ! আরও খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে লর্ড মেটকাফ, যিনি আমাদের প্রিয় প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাঁর পার্সোনাল এমব্লেম ছিল ঠিক এইরকম নাগরাজ! এটা আপনার স্কুপ হয়ে গেলো! আপনার এডিটর বলতে পারবেন না যে আপনি খাটেননি এবং ইতিহাস খোঁড়েননি। না খুঁড়লে তেলও পাওয়া যায় না, গল্পও পাওয়া যায় না। প্যাংক্রিজ সায়েব নিজেও তা বলতেন।"

হাল্কা একটা চুমুক দিয়ে মিস্টার সান্ডেল বললেন, "কিং কোবরার সম্মানেই আমাদের এই নাগরাজ বার! অথচ শুনেছি, সাপ দুধ ছাড়া কিছুই ড্রিংক করে না, এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার! ফরেন ড্রিংকের স্বাদ পেলে সাপের স্বভাবই হয়তো পাল্টে যেতো।"

আমি লিখে যাচ্ছি। মিস্টার সান্ডেল চোখ বুজে বলে যাচ্ছেন, "এই ক্লাব জিনিসটা কী, তা ইংরেজ এবং আমাদের মতন কিছু ইন্ডিয়ান ছাড়া অন্য সবার বুঝতে অন্তত দেড়শো বছর লেগে যাবে। ক্লাব মানে আপনার ওই হোটেল শাজাহান নয়, যেখানে ফ্যালো কড়ি এবং মাখো তেল। রাম শ্যাম যদু মধু স্রেফ ট্যাঁকের জোরে আপনার পাশের টেবিলে বসে পড়বে। গোগ্রাসে মদ্যপান বা লাঞ্চ খাবার জন্যে ইংরেজ এই ক্লাব আবিষ্কার করেনি, অথবা দুনিয়ার যেখানে ইংরেজ গিয়েছে সেখানেই ক্লাবের পত্তন করেনি। জানেনেই তো, চার জন জাপানি একত্রিত হলেই তৈরি করে এক সিক্রেট সোসাইটি, চার জন প্রবাসী বাঙালি জুটলেই গড়ে তোলে একটা কালীবাড়ি, আর চার জন ইংরেজ একত্র হলেই তৈরি করে একটা ক্লাব।"

"ক্লাব জিনিসটা ছেলেখেলার ব্যাপার নয়, এটা সব সময় মনে রাখতে হবে। অবসর বিনোদনের জন্য এক কালে ইংরেজদের ছিল কফি হাউস্। ১৬৬৩ সালে স্যামুয়েল পেপিস তাঁর বিখ্যাত ডায়রিতে লিখছেন, তিনি একটা কফি হাউসে যাচ্ছেন, কারণ কবি ড্রাইডেন ওখানে সপারিষদ আড্ডা মারেন। স্যামুয়েল জনসনের কফি হাউসের আড্ডা ও সুবচনি তো বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এমন এক জায়গায় চলো যেখানে অপরিচিতদের সান্নিধ্যে তোমাকে কথায় কথায় ভিজিটিং কার্ড বিনিময় করে সময় নষ্ট করতে হবে না, যেখানের লোকগুলি সমমানসিকতার! লাইক-মাইন্ডেড মানুষ পেলে দুনিয়ার সমস্ত প্রান্তে ইংরেজ একেবারে বর্তে যায়। আবার অপরিচিত লোককে ইংরেজ কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারে না, সে সব সময় একটা ইনট্রোডাকশন চায়। এই স্বভাব থেকে ক্লাবের উৎপত্তি এবং জগদ্বিখ্যাত সব বিলিতি ক্লাবের জন্ম। যেমন হোয়াইটস্ (১৬৯৭), কোকো-ট্রি (১৭৪৬), বুডিজ (১৭৬২), আর্থারস্ (১৭৬৫)। তবে বেঙ্গল ক্লাব (১৮২৭) অনেক বিলিতি ক্লাবের ভায়রাভাই, যেমন এথেনিয়াম (১৮৩৪), দ্য ওরিয়েন্টাল (১৮২৪), আবার অনেকের দাদা সে—যেমন অক্সফোর্ড অ্যান্ড কেমব্রিজ (১৮৩০), দ্য গ্যারিক (১৮৩১) এবং দ্য কার্লটন (১৮৩২)।"

বেঙ্গল ক্লাবের আদিপর্বটা মিস্টার সান্ডেল নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করলেন। "প্রতিষ্ঠা কাল ১৮২৭। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সময়টা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য শেষ হয়েছে, বেশ কিছু দুঃসাহসী ইংরেজ সায়েব ভাগ্যসন্ধানে কলকাতায় হাজির হয়ে ঘোষ বোস মল্লিকদের অংশীদার করে মার্চেন্ট হাউস শুরু করেছেন। কলকাতার টপ বাঙালিদের হাতে তখন অঢেল পয়সা, তখনকার সায়েবদের কেবল মাথায় বুদ্ধি, তাই বাঙালির টাকা না নিয়ে ব্যবসা করার উপায় নেই। সে সব ইতিহাস তো পাঠকদের আপনারা শোনালেন না—নিতাইচরণ মল্লিক, রামদুলাল দে, কিনসেল ঘোষের রামগোপাল ঘোষ-এর কথা। রামগোপালকে আবার বলা হতো বাংলার ডেমসথিনিস, সুবক্তা ছিলেন। উত্তর কলকাতাকে বলা হতো ভারতের এথেন্স!"

"তা সায়েবরা তখনও বাঙালির টাকা মন দিয়ে হরণ করছেন। পলাশীর যুদ্ধের পরে সত্তর বছর লেগেছে একটু সামলে নিয়ে গদিসুখে অভ্যস্ত হতে। কিন্তু তা বলে যুদ্ধের, অভিযানের, আক্রমণের তেমন অভাব নেই। এসব একটু আধটু হয়, যুদ্ধটা সেরে নিয়ে সায়েব একটু ছেড়ে-আসা স্বদেশের সুখগুলো ভোগ করতে চায়।"

"১৮২৭ সালে বিজনেসও বেশ রমরমা, ব্যবসা ফেল করে সর্বস্ব হারানোর হিড়িক পড়লো আরও বছর তিনেক পরে। আর তিন বছর দেরি হলে, বেঙ্গল ক্লাবের পত্তন হয়তো হতোই না, কারণ কলকাতার বড় বড় সায়েবরা তখন বিজনেসে দেউলিয়া হয়ে আত্মহত্যা করছেন, হট করে দেশত্যাগী হচ্ছেন, কিংবা গোপনে গা-ঢাকা দিচ্ছেন। বুক ফুলিয়ে ক্লাবে গিয়ে ড্রিংক অর্ডার দেবার মতন অবস্থা তখন সায়েবদের বিশেষ কারও নেই।"

মিস্টার সান্ডেল বললেন, "সময় পেলে জাস্টিস প্যাংক্রিজের লেখা বেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাসটা পড়ে নেবেন। যত্ন করে একশো বছরের ইতিহাস রচনা করেছিলেন ১৯২৭ সালে। মস্ত ব্যারিস্টার ছিলেন তিনি, কলকাতায় এলেন ১৯১০ সালে, কিছুদিন প্র্যাক্টিস করেই প্রথম যুদ্ধে যোগ দিলেন, হাইকোর্টে ফিরে এলেন ১৯১৮ সালে। যথাসময়ে স্ট্যান্ডিং কাউনসেল হলেন, তারপর ১৯২৬ সালে হাইকোর্টের জজ। প্রচণ্ড পাণ্ডিত্য, ১৯৪২ সালে বেঘোরে রহস্যজনক দুর্ঘটনায় এদেশেই মারা গেলেন। হাইকোর্টের জজকেও যুদ্ধের সময় এমন "স্পেশাল ডিউটিতে" পাঠানো হলো যা স্যর হিউ প্যাংক্রিজ নিজেই পছন্দ করতেন না। ওই সময় আরেক জন আই সি এস জজ ছিলেন—রক্সবারা। লোকে ফাঁসুড়ে জজ বলতো। কেন জানি না!"

ক্লাবের আদি ইতিহাসটা সহজেই জেনে ফেললাম। ১৮২৬ সালের শীতকালে কলকাতার সায়েবদের মনে দুঃখ হলো এখানে ক্লাব নেই, ক্লাব প্রয়োজন। কয়েক জন উৎসাহী নাগরিক প্রতিষ্ঠানের নামও ঠিক করে ফেললেন—ক্যালকাটা ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব।

সায়েবরা দিনক্ষণ দেখে নভেম্বর মাসে লাট সায়েবের বাড়ির পশ্চিম

দিকে টাউন হলে জনসভা করলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে ভাল কাজ করা ইংরেজের স্বভাবে নেই। সভাপতি কর্নেল এইচ ফ্লিন্চ দুঃখ করলেন, কলকাতায় পাতে দেবার মতন একটা হোটেল নেই, কফি হাউস নেই, ক্লাব তো নেই-ই! যারা এখানে শুঁড়িখানা, সরাইখানা (ট্যাভার্ন) চালায় তাদের এমন সঙ্গতি নেই যে অনেক খরচে ভদ্রস্থ কিছু তৈরি করে। অথচ মানুষের প্রয়োজন একটা মেলামেশার জায়গা যেখানে কারও সঙ্গে আধঘণ্টা মন খুলে কথা বলা যায়, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা জমানো যায়, প্রয়োজনে মাথা গোঁজা যায়, প্রবাসের জীবন যাতে কিছুটা সহনীয় হয়ে ওঠে।

প্রস্তাব শুনে সবাই বেজায় খুশি হলেন। যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা মেম্বার হতে চান তাঁদের জন্যে পরবর্তী মিটিং-এর তারিখ ধার্য হলো ১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭, স্থান টাউন হল। পরের দিনই হবু ক্লাবের চার কর্তাব্যক্তি হাজির হলেন জগদ্বিখ্যাত লর্ড কমবারমিয়ারের কাছে; তাঁদের বিনীত প্রার্থনা, লর্ড যেন এই নবজাত প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হোন।

লর্ড কমবারমিয়ার এই সাধু প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে ক্লাবের মেম্বার হবার সাধু-ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

ক্লাবের নিয়মকানুন সব পাস হয়ে গিয়েছে ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। পাঁচশো পর্যন্ত মেম্বার নেওয়া যাবে, তবে একশো জন হবেন এমন সব ব্যক্তি যাঁরা হিজ ম্যাজেস্টি অথবা অনারেবল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী নন। উকিল, ডাক্তার, পাদ্রি সবাই সভ্য হতে পারবেন। একটা কমিটিও ঠিক হয়ে গেলো—যা ১ মার্চের সাধারণ সভায় পাকা করে নেওয়া হবে।

হাসলেন মিস্টার সান্ডেল। বললেন, "লক্ষ্য করছেন নিশ্চয়, কমিটি নিয়ে কোনও খচাখচি হলো না, খটাখটি হলো না। এইটাই বেঙ্গল ক্লাবের সুদীর্ঘ বছরের ট্রাডিশন। অন্য কিছু কিছু জায়গায় যা তর্কাতর্কি হয় তা শুনলে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়—আজকাল ক্লাবের ইলেকশন জেনারেল ইলেকশনকেও লজ্জা দিচ্ছে, ক্যান্ডিডেটরা বাড়ি বাড়ি ধর্না দিচ্ছেন একটা ভোটের জন্যে, এক একখানা ক্লাবে সতেরোখানা সাব-গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, ভাল লোক সাহস করে

এগিয়ে আসছে না কমিটি মেম্বার অথবা প্রেসিডেন্ট হবার জন্যে।"

"গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটাভুটিতে ক্ষতি কী?" আমার এই মন্তব্যে বেশ বিরক্ত হলেন মিস্টার সান্ডেল। "বলা উচিত নয়, ভারতবর্ষের কিছু কিছু ক্লাবে ইদানীং এমন সব প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন যাঁরা আগেকার যুগে ওই ক্লাবের মেম্বারও হতে পারতেন না! এখন দুর্দিন। যার টাকা আছে এবং দল আছে তার সবই আছে।"

"এই লর্ড কমবারমিয়ারটি কে?" আমি জানতে চাই।

"বেঙ্গল ক্লাবের অরিজিন্যাল মেম্বার এবং পেট্রন। আদি নাম স্টেপ্‌লটন কটন! পরে ফার্স্ট ভাইকাউন্ট কমবারমিয়ার। একুশ বছর বয়সে কর্নেল হয়েছিলেন এবং ১৭৯৬ সালে মাদ্রাজে রেজিমেন্টের কর্তা হন। শ্রীরঙ্গপত্তমে টিপু সুলতানের সঙ্গে তিনি লড়াই করেছেন (১৭৯১) এবং ১৮০৫ সালে বত্রিশ বছর বয়সে মেজর জেনারেল হয়েছিলেন, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের ক্লাবের এই সভ্য বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন, ওয়েলিংটনের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে। সবাই জানে, এঁর ঘোড়া নিয়ে আপনাদের স্যর আর্থার কোনান ডয়েল একটা গপ্পো লিখেছিলেন—দ্য ক্রাইম অব দ্য ব্রিগেডিয়ার!"

১৮২৫ সালে কমবারমিয়ার হলেন ইন্ডিয়ার কমান্ডার-ইন-চিফ! ভরতপুরে জাঠদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তিনি। "একই বছরে (১৮২৭) ভাইকাউন্টও হলেন আর বেঙ্গল ক্লাবের পেট্রন। দুটোই মস্ত সম্মান, কোন্‌টা বড় তা প্লিজ কোনও ক্লাব মেম্বারকে জিজ্ঞেস করে তাকে লজ্জায় ফেলবেন না।"

দেশে ফিরে গিয়ে এই কটন সায়েব ফিল্‌ডমার্শাল হয়েছিলেন, মারা গেলেন নব্বুই বছর বয়সে, ১৮৬৫-তেই। মিস্টার সান্ডেল একটু সাবধান করে দিলেন, আমরা ইন্ডিয়ানরা নাম লিখতে গিয়ে প্রায়ই অসাবধানী হই, সায়েবরা এটা পছন্দ করেন না। ওঁর পুরো নামটা ডিকটেট করে দিলেন আস্তে আস্তে—"ভাইকাউন্ট কমবারমিয়ার অব ভরতপুর ইন দ্য ইস্ট ইন্ডিজ অ্যান্ড অব কমবারমিয়ার ইন দ্য কাউন্ট প্যালেতিন অব চেস্টার!"

"ছোট্ট এবং মিষ্টি নাম! কী বলেন?" দুষ্টু হাসি হাসলেন মিস্টার পিন্টো

সান্ডেল, ভাগ্য আর একটু ভাল থাকলে যিনি অবশ্যই স্যর পান্নালাল হতে পারতেন। "কমবারমিয়ার সায়েবের ছবি এখনও টাঙানো রয়েছে আমাদের ক্লাব-রুমে, দেখে যাবেন। যে সে ছবি নয় মশাই, মরার পরে আঁকানো নয়, সভ্যদের অনুরোধ জীবিতকালে এই কলকাতায় বসে সিটিং দিয়েছিলেন আর্টিস্টকে, সেই ছবি!"

আরও একটা 'ববিবার্নস' এবং 'ভার্জিন মেরি' এসে গিয়েছে হোস্টের অদৃশ্য ইঙ্গিতে। মিস্টার সান্ডেল সই করে করে দিয়েছেন হেড বারম্যানের বইতে।

প্রবল উৎসাহে মিস্টার সান্ডেল বললেন, "ভাবছেন আমাদের প্রথম প্রেসিডেন্টের কথা বলছি না কেন? লুকোবার কিছু নেই এই বেঙ্গল ক্লাবে। কর্নেল জে ফিন্‌চ ছিলেন লর্ড কমবারমিয়ারের মিলিটারি সেক্রেটারি। তিনিও ফোর্থ আর্ল অব আইনসফোর্ডের ব্যাটা। তখন লর্ডের ব্যাটায় কলকাতা ভরপুর মশাই—উটকো লোকদের ভিড়ে কলকাতার এই হাড়ির হাল তখনও হয়নি!"

"জুলাই মাসে গর্ডনস বিল্ডিং-এর একতলা এবং দোতলা মাসিক ৮০ টাকায় ভাড়া করে ক্লাব তো শুরু হলো। গর্ডনস বিল্ডিংস কোথায় ছিল খোঁজ করে সময় নষ্ট করবেন না। এখন যেখানে ৬ নম্বর এসপ্লানেড ইস্ট—মস্ত সরকারি অফিস—এক কালের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। ওখানেই ছিল আমাদের আদি ক্লাব ভবন। তারপরে অবশ্য বেঙ্গল ক্লাব উঠে যায় ৪ নম্বর ডালহৌসি স্কোয়ারে—যেখানে এক সময়ে অ্যালপোর্ট, অ্যাশবার্নার অ্যান্ড কোম্পানির অফিস ছিল।"

"অ্যালপোর্টের নাম শোনেননি? তা হলে বলি, যেখানে পুরনো ডবলু নিউম্যান কোম্পানির অফিস ছিল ১৮৮০ সাল থেকে। এই বাড়িও নেই, ভাঙা হয়ে গিয়েছে। এই আমাদের মুশকিল, ইতিহাসকে ডাণ্ডা মেরে গুঁড়িয়ে ফেলবার জন্যে এই শহরের বম্বেটেরা সারাক্ষণ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

জানা গেলো এখনকার বি-বি-ডি বাগে ১৫ বছর কাটিয়ে, ১৮৪৫ সালে বেঙ্গল ক্লাব উঠে এলো কালীপ্রসন্ন সিংহের চৌরঙ্গী সম্পত্তিতে। লিজের

ব্যবস্থা হয়েছিল আদিতে তিরিশ বছরের। এই সময়েই রাসেল স্ট্রিট ও পার্ক স্ট্রিটেও বাড়তি জমি নেওয়া হয়েছিল।

এইভাবেই কেটেছিল এই উনিশ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত এবং ১৯০৭ সালে জমিটা পুরো কিনে নিয়ে, মিস্টার ভিনসেন্ট এস্‌ক-এর স্থাপত্য পরিকল্পনায় গড়ে উঠলো কলকাতার গর্ব, নয়নাভিরাম বেঙ্গল ক্লাব বিল্ডিং যা সামান্য কিছু পয়সার অভাবে নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে ফেলা হলো ১৯৭০ সালে।

মিস্টার সান্ডেল বললেন, "স্বাধীন ভারতে ফারপোর উঠে যাওয়া, বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট হল এবং বেঙ্গল ক্লাব বিল্ডিং গুঁড়িয়ে ফেলা তিনটে অতীব কলঙ্কজনক ঘটনা। কী করা যাবে বলুন? চৌরঙ্গীর ওপর যে মেট্রো রেল ভবন হয়েছে এবং চ্যাটার্জি সেন্টার—এ সবই বেঙ্গল ক্লাবের আদি জমির ওপর। এমন কী আই-সি-আই হাউস পর্যন্ত।

"অবশ্য আই-সি-আই হাউসের জমি বিক্রি হয়েছিল আরও আগে এই শর্তে যে এই বাড়ির উচ্চতা বেঙ্গল ক্লাব বিল্ডিং-এর বেশি হবে না। দু-এক জনের ধারণা, আই টি সি ভার্জিনিয়া হাউস পর্যন্ত এক সময় বেঙ্গল ক্লাবের চৌহদ্দির মধ্যে ছিল। তবে আমার ঠিক জানা নেই। এই ভার্জিনিয়া হাউস বেঙ্গল ক্লাবকে তার প্রথম মহিলা সদস্য উপহার দিয়েছে।"

নাগরাজ বার-এ আমার জন্য তৃতীয় ভার্জিন মেরিও এসে গিয়েছে নিঃশব্দে। মিস্টার পিন্টো সান্ডেল আমাকে ইতিহাসে ডুবিয়ে রাখতে চাইছেন। "শুনলেন তো ভাইকাউন্ট কমবারমিয়ারের কথা। প্রথম প্রেসিডেন্ট মিস্টার ফিনচ্ রিটায়ার করে এক গাঁট নেমে গিয়ে পরের বার ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন। এইরকম ত্যাগ একমাত্র সায়েবরাই করতে পারেন তাঁদের প্রিয় ক্লাবের জন্য। কারণ এবার প্রেসিডেন্ট হিসাবে পাওয়া গেলো স্বয়ং স্যর চার্লস মেটকাফকে। সন অব দ্য সয়েল বলতে পারেন এঁকে! কলকাতাতেই জন্ম। তারপর বিলেতে লেখাপড়া শিখে ফিরে এ দেশেই চাকরি-বাকরি। ইনি যখন আমাদের ক্লাব প্রেসিডেন্ট হলেন তখন মেটকাফ সায়েব সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য, যার অন্য সভ্যরা হলেন স্বয়ং

বড়লাট, কম্যান্ডার-ইন-চিফ এবং দু'জন সিভিল সার্ভিসের প্রতিনিধি। পরে তিনি অস্থায়ী বড়লাট পর্যন্ত হয়েছিলেন। পাকা এগারো বছর ক্লাব প্রেসিডেন্ট—মেটকাফের এই রেকর্ড আর কেউ ভাঙতে পারবে না। ইতিহাসের বইটই একটু ঘাঁটুন, দেখবেন এই মেটকাফকেই মেকলে বলেছেন, ভারতবর্ষের সেরা সিভিল সার্ভেন্ট। মেকলের কাছ থেকে এই সার্টিফিকেট পাওয়া কম কথা নয়, বুঝতেই পারছেন। অথচ মনের দুঃখে, ঠিকমতন পোস্টিং না পাওয়ায় এবং যথাসময়ে পদোন্নতি না হওয়ায় ভদ্রলোক কোম্পানির চাকরি থেকে রিটায়ার করে বিলেতে চলে গেলেন। পরে অবশ্য কানাডার গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন। খুব ব্যস্ত লোক, এতো ব্যস্ত যে বিয়েই করলেন না! এঁর নামাঙ্কিত স্ট্র্যান্ড রোডের কাছে মেটকাফ হলটা কলকাতার সিটিজেনরা কী অবস্থায় রেখেছে মশাই? ভাবতে লজ্জা লাগে—একটা গুদাম ঘরেরও অধম—অথচ কলকাতার লোকরা চাঁদা তুলে এই হল করে দিয়েছিল আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্টের সম্মানে।"

বেঙ্গল ক্লাবের গুরুত্ব আমি এতোক্ষণে হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি। কিন্তু মিস্টার সান্ডেল ছাড়লেন না। শুনিয়ে দিলেন, ভাইকাউন্ট কমবারমিয়ারের পর ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন স্বয়ং লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। "সতীদাহ নিবারণ বলুন, ভারতের জন্যে এতো উপকার আর কোনও বড়লাট করেননি, অথচ আজকের বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের অবস্থা দেখুন। তার ওপর ওখানেই ইনকাম ট্যাক্সের হেড অফিস! টু পাইস যাঁদের আছে তাঁরা কী বলবেন বলুন তো! খোদ ইংরেজ আমলেও প্যাংক্রিজ সায়েব দুঃখ করে গিয়েছেন, মেটকাফ হলেও ইনকাম ট্যাক্স অপিস বসেছে। এই আয়কর জিনিসটি এ দেশে আমদানি করেছিলেন ফিনান্স মেম্বার চার্লস উইলসন সায়েব সিপাই মিউটিনির পরে।"

এবার গলার স্বর নামিয়ে নিলেন মিস্টার সান্ডেল। "লোকে বলছে কলকাতার আর্থিক দুর্গতি হয়েছে। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাঁটা পড়ছে, তেমন টাকা-পয়সাও কারও পকেটে নেই। কিন্তু বেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠার পরই কলকাতার বিজনেসের যা হাল হয়েছিল! ব্যবসার মড়ক বলতে পারেন। কতো কোম্পানি যে সেসময় দেউলিয়া হয়েছিল তার ঠিকঠিকানা

নেই। ধরুন বিখ্যাত আলেকজান্ডার কোম্পানি, আমাদের কমবারমিয়ার সায়েব ওখানে ভরতপুরের প্রাইজমানি ৬০,০০০ পাউন্ড আমানত রেখেছিলেন, ওভারনাইট জলে চলে গেলো। ম্যাকইনটস কোং ছিল এই ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ, ছাব্বিশ লাখ টাকা দেনার দায়ে দরজা বন্ধ করলো, ক্লাবের নষ্ট হলো চল্লিশ হাজার টাকা। সমস্ত কলকাতায় সায়েবসভ্যদের সর্বনাশ হয়ে গেলো। কারণ তখন লোকে এইসব কোম্পানিতেই টাকা খাটাতে বাধ্য হতো। বড় বড় সায়েবদের তখন আকণ্ঠ দেনা, সবাই খরচ কমাতে ব্যস্ত। সারাজীবনের সঞ্চয় হারিয়ে মেম্বাররা তখন ক্লাবে পার্টি দেয় না, খরচাপাতি করে না। এই ইতিহাসটি জানা ছিল বলেই এই সেঞ্চুরির ষাটের দশকের কলকাতার যখন হাড়ির হাল, তখন আমরা ঘাবড়ে যাইনি, বুঝলেন লেখকমশাই। সুখ দুঃখ, সমৃদ্ধি দারিদ্র্য এসব গাড়ির চাকার মতন ঘুরে ঘুরে আসে।”

“কিন্তু ওই যে বলে না, কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ! মেকলে সায়েব ১৮৩৬ সালে লিখছেন, বিজনেসের সর্বনাশ হওয়ায় কলকাতার জীবনযাত্রার কাপ্তেনিভাবটা বেশ কমে গিয়েছে, ফলে আমি দুটো পয়সা জমাতে পারছি। এই সঞ্চয়ের ফলে আমার ফ্যামিলি আমার অবর্তমানেও সুখে থাকতে পারবেন।”

এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন সান্ডেল সায়েব। “শিক্ষিত লোকরা এলে আমরা মেকলে-মেকলে করি, বলি ওঁর বাড়িতেই আমাদের ক্লাব, ট্যাবলেটও বসানো হয়েছে, কিন্তু মেকলে সায়েব বেঙ্গল ক্লাবের মেম্বার হয়েছিলেন তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। কী লজ্জার ব্যাপার ভাবুন তো? আমি মশাই অ্যানটি-মেকলে। ভদ্রলোক বাঙালিদের নিন্দে করেছেন, কলকাতার নিন্দে করেছেন, বলেছেন পোকামাকড় এবং কবরখানার আন্ডারটেকার ছাড়া এখানে আর কেউ সুখে থাকতে পারে না!”

আরও একটু ড্রিংক গলায় ঢেলে মিস্টার সান্ডেল বললেন, “লর্ড মেকলের ভাগ্য ভাল। ঘুরে-ফিরে সারা দুনিয়া এখন সরকারি খরচ কমানো এবং উদার অর্থনীতির কথা বলছে। এই মেকলে কোন কালে বলে

গিয়েছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, কলকারখানা পরিচালনা এ সব সরকারের ধাতে নেই ; সরকারের মূল কাজটা হলো, মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষে করা। ইকনমিস্টরা এই খবর পেলে মেকলেকে নিয়ে আবার নাচানাচি শুরু করবে—হাজার হোক সারা দুনিয়াতেই মার্কস সায়েবের দুর্দিন চলেছে।"

সান্ডেল জানালেন, "আরও একটা পয়েন্ট রয়েছে, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মশায়ের এই ভাড়াটে, এই সম্পত্তিতে বসেই বলেছেন, এ দেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরিজি আসুক। আমাদের ক্লাবের আর একজন মেম্বার উইলসন সায়েব সংস্কৃতকে এদেশের শিক্ষার মাধ্যম করতে চেয়েছিলেন। উইলসন সায়েব পরে টাঁকশালের অ্যাসেমাস্টারের চাকরি ছেড়ে অক্সফোর্ডে চলে গেলেন সংস্কৃত পড়াতে, আর মেকলে সায়েবের প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করলাম। কিন্তু স্বাধীনতার পরে আবার কিছু লোকের মতিভ্রম হলো—তাঁরা সায়েবদের সঙ্গে ইংরিজিকেও হঠাতে চাইলেন। বহু ধাক্কা খেয়ে এখন আবার বিপুল উৎসাহে, ঘটিবাটি বেচে সাধারণ লোকে ছেলেমেয়েদের ইংরিজি শেখাতে চাইছে। বাঙালিদের কখন যে কী মেজাজ হয়, বোঝা দায়। তবে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে এমন ক্লাব পাবেন না যা এমনভাবে একটা দেশের হিস্ট্রিকে সারাক্ষণ প্রভাবিত করছে। তাই তো বলি, ওরে বেঙ্গল ক্লাবটা ঠিক ক্লাব নয়, একটা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যার একমাত্র তুলনা রাস্তার ওধারে এশিয়াটিক সোসাইটি—এটাও শেষপর্যন্ত একটা ইনস্টিটিউশন অব ন্যাশনাল ইমপর্টান্স হলো, অথচ বেঙ্গল ক্লাবের কথা এখনও কেউ ভাবছে না।"

আমি কিছু কিছু পয়েন্ট টুকে নিচ্ছি। সাপ মার্কা কাগজ শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে বারম্যান আরও একটা ক্লাব প্যাড সাপ্লাই করেছে। আর মিস্টার পিন্টো সান্ডেল মনের আনন্দে আমাকে নানা খবরাখবর দিয়ে চলেছেন। তাঁর ধারণা, ক্লাবের বিশিষ্ট সভাপতি, পৃষ্ঠপোষক এবং আদিসভ্যদের নিয়ে মস্ত ইতিহাসের বই লেখা উচিত এবং তা অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত এই কলকাতার প্রত্যেক ইস্কুলে।

জাঁদরেল সব ক্লাব সভাপতি ছিলেন তা বেশ বুঝছি। যেমন জেনারেল

উট্রামকে নিয়েই তো মস্ত বই লেখা চলে। ওঁর জীবন থেকে শেখবারও অনেক।

মিস্টার সান্ডেলের দুঃখ, "অথচ ভয় পেয়ে আমরা ওঁর স্ট্যাচুটাই পার্ক স্ট্রিট থেকে সরিয়ে দিলাম। এইভাবে ইতিহাসকে মুছে ফেলে কোনও লাভ হয় না, এই কথাটা বুঝিয়ে বলবেন আপনার পাঠকদের। এখন সে-জায়গায় নেহরুর যে মূর্তিটা বসেছে তার দিকে তাকিয়ে দেখেছেন? পণ্ডিতজি ছিলেন আর্টের ভক্ত, তিনি এই ভাস্কর্য দেখলে খুব কষ্ট পেতেন। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাজেরও মস্ত ভক্ত ছিলেন পণ্ডিতজি।"

আদিযুগের সভাপতি চর্চা ছেড়ে, এবার আদি সভ্যদের কিছু খবর সংগ্রহ করা গেলো। এঁরা কেউ কেউ অভিজাত পরিবারের সন্তান, আবার কেউ কেউ অতি সাধারণ অবস্থায় স্রেফ ভাগ্যসন্ধানে এ দেশে এসেছিলেন। আবার কেউ কেউ বিখ্যাত ব্যক্তিদের জারজ সন্তান। "ইংরিজি শব্দটি কিন্তু মিষ্টি—'ন্যাচারাল' সন—প্রাকৃতিক সন্তান। জারজ বা উপপত্নী কথাটা আমার মোটেই ভাল লাগে না", বললেন মিস্টার সান্ডেল।

মিস্টার সান্ডেলের কাছেই শুনলাম সেকালের ভারতবর্ষে সবচেয়ে খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার সাইমন নিকলসনের গল্প। তিনি থাকতেন কিড স্ট্রিট-চৌরঙ্গীর মোড়ে, এখন যেখানে জিওলজিক্যাল সার্ভের বাড়ি।

"মনে রাখবেন, এই ডাক্তারের জন্যই তৈরি হয়েছিল মেয়ো রোড, যাতে চটপট তিনি তাঁর রোগী বড়লাট লর্ড ডালহৌসির বাড়িতে (এখনকার রাজভবনে) পৌঁছতে পারেন। নামকরা ডাক্তারদের কদর চিরকালই ছিল, বুঝলেন মশাই," বললেন মিস্টার সান্ডেল।

এবার ফিক করে হাসলেন মিস্টার সান্ডেল। "বুঝছি স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে একটু স্বাধীনতা আন্দোলনের কথাও শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। শুনুন, সিপাহি বিদ্রোহ তো হলো ১৮৫৭ সালে—সেবার বেঙ্গল ক্লাবেও গুজব ছড়িয়ে বেজায় ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যারাকপুর থেকে সিপাইরা তেড়ে আসছে শুনে আমাদের আতঙ্কিত মেম্বাররা অনেকে ছুটেছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামে নিরাপদ আশ্রয় নিতে। কিন্তু তারও আগে একটা ব্যাপার

হয়েছিল। খোঁজ খবর করতে পারেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ঢোকানো যায় কি না। আমাদের অরিজিনাল মেম্বার টমাস রিচার্ডসন ২৪ পরগনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপার ছিলেন। আলিপুর জেলের বন্দীরা আচমকা বিদ্রোহ করে তাঁকে মেরে ফেললো ১৮৩৪ সালের ৫ মে।"

"আপনার প্রিয় একজন বারওয়েল সায়েব (চার্লস রিচার্ড) ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সুপার এবং পরে সদর দেওয়ানি আদালতের জজ। কলকাতাতেই দেহরক্ষা করেছিলেন। তারও আগে এক বারওয়েল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে, কিন্তু তখন বেঙ্গল ক্লাব ছিল না।"

রোমান্সের কথাও উঠলো। মিস্টার সান্ডেল আমাকে সাবধান করে দিলেন। "স্ট্রিক্টলি পুরুষ মানুষের ক্লাব মশাই, এখানে মহিলাদের প্রবেশই নিষেধ ছিল। বহু কষ্টে ক্লাবের সেনটেনারির সময় একটা পার্টিতে মেয়েদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল, সে ভীষণ ব্যাপার। তখন তীব্র আপত্তি উঠেছিল। কর্মকর্তারা বাধ্য হয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, হয়তো ২০২৭ সালে ক্লাবের দুশো বছর পূর্তি ডিনারের আগে মেয়েরা এখানে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করবার অনুমতি পাবেন না। কিন্তু বুঝতেই পারছেন? সে সব নিয়মকানুন বিসর্জন দেওয়া হয়েছে, এখন মহিলারা সোজাসুজি মেম্বারও হচ্ছেন। প্রথম সভ্যা অদিতি শ্যামকে তো চেনেন আপনারা! ওঁর বাবা পি কে সেন ছিলেন কলকাতা পুলিশের জাঁদরেল কমিশনার।"

কিন্তু সেকালের রোমান্স?

"এই আপনাদের নিয়ে মুশকিল। ইতিহাস লিখতে এসেও সারাক্ষণ রসালো গপ্পো খুঁজবেন। শুনুন মশাই, মেন ওনলি ক্লাব, ক্লাবের বাইরে কে কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় অথবা মানসিকতা কোনোটাই ছিল না সায়েবদের। তবে ওঁদের 'ন্যাচারাল' সনরাও কলকাতায় মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াতো, তারাও মেম্বার হতো আমাদের ক্লাবের। ভারত-ব্রিটেন দৈহিক সম্পর্ক বেঙ্গল ক্লাবে গড়ে না উঠলেও ক্লাবের বাইরে সে-সম্পর্ক প্রায়ই বিকশিত হতো চুপি চুপি। ক্যাপ্টেন জোসেফ টেলরের (১৭৯০-১৮৩৫) নাম মনে রাখবেন। এঁর পিতৃদেব বিয়ে করেছিলেন এক দিশি

রাজার মেয়েকে, সেই বিবাহের সন্তান আদ্যিকালের ইন্দো-ব্রিটিশ জয়েন্ট ভেঞ্চার। জোসেফও বিয়ে করেন একজন এদেশি মহিলাকে। অবশ্য আরও দু'জন ইংলিশ স্ত্রী ছিলেন টেলর সায়েবের।"

"বলছেন এক কোকিলে বসন্ত হয় না? অল রাইট। শুনুন আমাদের আদি মেম্বার জেনারেল স্যর উইলিয়াম রিচার্ডসনের গপ্পো। ইনি কোনওদিন নিজের দেশে ফেরেননি, শেষপর্যন্ত দেহ রাখেন নৈনিতালে ১৮৬১ সালে। মিলিটারিতে মেজর হায়দার হর্সে বলে বলে এক দিশি ভদ্রলোকের বোনকে তিনি বিয়ে করেন। তারপর বিয়ে করেন এক জাঠ মহিলাকে, তাঁর নাম ছিল হেনরিয়েটা হার্দ! এই হেনরিয়েটা নামটা ইন্ডিয়াতে তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল। মাইকেল মধুসূদনের লাইফ তো আপনার অজানা নয়।"

"শুনুন আর একটা ব্যাপার। আমাদের আদি মেম্বারদের কেউ কেউ বিলেতে যেতেনই না। ক্যাপ্টেন জন পার্সনস—পরে আরও অনেক উন্নতি করেছিলেন, ৬২ বছর টানা ইন্ডিয়ায় ছিলেন, দেশে যাবার কথা চিন্তাই করেননি। আদি মেম্বারদের একজন। ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৬২ বছর পরেও বেঁচে ছিলেন। যদিও কলকাতার মানুষ তখন দীর্ঘজীবী হতেন না।"

আমার মুখের দিকে তাকালেন মিস্টার পিন্টো সান্ডেল। বললেন, "এখনও স্বাধীনতা সংগ্রামের মেটিরিয়াল খুঁজছেন? তা হলে শুনুন, আমাদের আদি মেম্বারের ভাই কর্নেল জন ইউয়ার্ট। স্ত্রী এবং মেয়ে সমেত বিদ্রোহী সিপাইরা তাঁকে খুন করেছিল ১৮৫৭ সালে। তবে কলকাতায় নয়, কানপুরে। চরম বিপদের সময় এখানকার বাঙালিরা পুরো সাপোর্ট দিয়েছিল সায়েবদের।"

একটু থেমে মিস্টার বললেন, "শুধু রাজপুরুষ, সৈন্য-সামন্ত, জজ ব্যারিস্টার নয়, বিজনেসম্যান সভ্যরাও ছিলেন ক্লাবের আদিতে। তবে এখন তো তাঁদেরই দাপট। বিজনেসম্যান ছাড়া এসব হাতির খরচ জোগাবে কারা? বিজনেসম্যান এবং তাঁর সিনিয়র কর্মচারীরা চিরকালই বিলে সই করে দেন, ক্লাবের সেই বিল আপিসে খরচ হিসেবে দেখানো হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, উচ্চস্তরে খানাপিনা না হলে বিজনেসে কোনও নাটকীয়তা থাকতো না। তবে বিজনেসম্যান কাছাকাছি থাকলে একটু-আধটু

অসুবিধেও হতে বাধ্য। ধরুন আদি মেম্বার টমাস ব্রেকেন, এঁর আলেকজান্ডার কোম্পানি ৩০ লাখ পাউন্ড দেনার বোঝা নিয়ে আচমকা কলকাতায় দেউলিয়া হলো। লোকের সর্বনাশ হলো, কিন্তু টমাস ব্রেকেন সামলে গেলেন, তিনি ঢুকে পড়লেন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলে। পামার অ্যান্ড কোম্পানির জন পামার, তাঁর কোম্পানি লালবাতি জ্বাললো ১৮৩০ সালে। এঁকে সায়েবরা বলতেন 'দ্য প্রিন্স অফ মার্চেন্টস'। দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ক'বছর পরে যখন 'মার্চেন্ট প্রিন্স' নামকরণ করা হলো, তখন কথাটা কোথা থেকে এলো বুঝতে পারছেন? আর একজন মিলিটারি অফিসার—ব্রাউন রবার্টস সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে লোভে পড়ে যে মার্চেন্ট আপিসে ঢুকলেন তার নাম ম্যাকইন্টস ফুলটন অ্যান্ড ম্যাকলিনটফ, সংক্ষেপে ম্যাকইন্টস অ্যান্ড কোং। এই কোম্পানিও লালবাতি জ্বালালো। সমস্ত কলকাতাই তখন ডুবতে বসেছে দেউলিয়াদের দাপটে।"

অনেক হয়েছে ইতিহাস। শুধু ইতিহাস নিয়ে যে বেঁচে থাকা যায় না, তা মিস্টার পিন্টো সান্ডেল বেশ ভালভাবে বোঝেন।

এ বার তিনি বললেন, "মোদ্দা কথাটা হলো এই ক্লাব এখনও হেঁজিপেঁজিদের প্রতিষ্ঠান নয়, বেঙ্গল ক্লাবকে সবাই বড়াসাবদের ক্লাব বলে জানে। ক্লাবের শুরুর দিনেই টুলো কোম্পানির নিলামে পাঁচ হাজার টাকার সিলভার কাটলারি কেনা হয়েছিল এটা মনে রাখবেন। এখানে যে কতো সিলভার আছে তা বলা সম্ভব নয়।"

"টুলো কোম্পানি নিয়ে লিখুন না একখানা রগরগে উপন্যাস। এই নিলামদারের আপিসেই দশটাকা মাইনের রামদুলাল দে ডুবে যাওয়া জাহাজ কিনে ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং পরে আমেরিকানদের সঙ্গে সরাসরি ব্যবসা করে জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন। সায়েবরা এঁর নামে জাহাজ করেছিলেন—দ্য রামদুলাল।

বড়া সায়েব প্রসঙ্গে মিস্টার সান্ডেল বললেন, "এটাই স্বাভাবিক যে বড়া সায়েব হলেই একটু বয়োজ্যেষ্ঠ হবেন। লাঞ্চের পর এঁরা ক্লাবের 'সায়লেন্ট' রুমে যেতেন বই পড়তে এবং চিঠি লিখতে। ওখানে বাক্যালাপ সম্পূর্ণ নিষেধ। গুরুভোজনের পর একটু চোখ বোজানো এবং একটু নাসিকাগর্জন

অস্বাভাবিক কিছু নয়। এবিষয়ে একশো বছর কেউ কোনও মন্তব্য করেনি, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ছোকরা আমেরিকান অফিসাররা এসে ক্লাবের ছন্দপতন ঘটালেন। এঁরা যা-তা মন্তব্য লিখে গিয়েছেন খাতায়। যেমন : চমৎকার, অতি চমৎকার! কিন্তু ইউ এস এ-তে আমরা মড়াদের কবরই দিই!"

বেজায় বিরক্ত হয়ে উঠলেন মিস্টার সান্ডেল। "একেই বলে নিমকহারামি। অতিথেয়তার নির্লজ্জ অপব্যবহার—এই জন্যেই মার্কিন জাতটা যতোটা বড় হতে পারতো ততোটা হলো না। কোনও কিছুতেই ওদের শ্রদ্ধা ভক্তি নেই। সব কিছুতেই ছ্যাবলামো। ইন্ডিয়াও তো স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু কখনও ইংরেজদের সঙ্গে ছ্যাবলামো করতে চাইবে না এবং এই জন্যেই ইন্ডিয়া অনেক বড় হবে, আপনি দেখে নেবেন।"

পই-পই করে রিকোয়েস্ট করলেন মিস্টার সান্ডেল, ক্লাবের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে কথা বলতে। ভাস্কর মিটার, জহর সেনগুপ্ত, অলোক মুখার্জি এবং পি বি ঘোষ।

"ঘোষের পোজিশন একটু স্পেশ্যাল। ওঁর কোম্পানির ডি পি এস কাঙ্গা বেঙ্গলের প্রথম ভারতীয় প্রেসিডেন্ট। বড় ভাল লোক ছিলেন। ওঁর সুন্দরী তনয়া তো একসময়ে কলকাতার বহু তরুণের মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। পি-বি-র পরিবারে লক্ষ্মী সরস্বতী দু'জনেই কড়া নেড়েছেন—বৈজ্ঞানিক স্যর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের বড় ছেলে আমাদের পি বি।"

ক্লাব সম্পর্কে হাতেখড়ি হবার পর আমার কৌতূহল বেশ বেড়ে গিয়েছে। শুধু অতীত নয়, ক্লাবের বর্তমানকেও তো একটু জানা দরকার।

একজন জাঁদরেল কোম্পানি ডিরেক্টর আমাকে বললেন, "ইন্ডিয়ার বেস্ট কোম্পানি বোর্ড মিটিং-এর জায়গা এই বেঙ্গল ক্লাব।" তিনিই আমাকে রুম ১৫০-এ দয়াপরবশ হয়ে নিয়ে গেলেন। ক্লাবের ১৫০ বছর উপলক্ষে এই রুম তৈরি, তাই এই নাম। ফিল্ম ডিরেকটর নয়, কোম্পানি ডিরেকটরদের বড় প্রিয় জায়গা, কাজকে কাজ, মিটিংকে মিটিং, আবার নির্জীব শরীরকে একটু স্পিরিচুয়াল গঙ্গোদকে চাঙ্গা করে নেওয়া। এখানেই বড় বড় কোম্পানির বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাঁদের সারাক্ষণের

ডিরেক্টররা এবং উপদেষ্টা ডিরেক্টররা। এইসব সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত নিতে হলে মাথা ঘামাতে হয়, তাই প্রাক-মিটিং কারণপান অবশ্যই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই ঘরের কর্মীদের উর্দি আলাদা, কাঁটা চামচ প্লেট সব আলাদা। প্রত্যেকটি কাটলারির পিছনে শতাব্দীর ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, কারণ পুরনো সিলভার গলিয়ে নতুন সিলভার সেট তৈরি করা হয়েছে কোনও একসময়ে। জনা ১৬ অতিথি এখানে 'কোজি' লাঞ্চ বা 'কোজি' ডিনার সারতে পারেন।

ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে দয়ালু প্রদর্শক আমাকে বললেন, "এখন তো আমি একুশটা কোম্পানির ডিরেক্টর, বেঙ্গল ক্লাবের গুরুত্বটা ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু যখন আদি কোম্পানির তরুণ অফিসার হিসাবে ফিনান্স ডিরেক্টর প্রথম বললেন বেঙ্গল ক্লাবের বোর্ড লাঞ্চে উপস্থিত থাকবে, তখন সে কি উত্তেজনা। পর পর দু'রাত ঘুম আসতে চায় না।"

অনুরোধ করলাম, এই ক্লাবের ধর্ম একটু ব্যাখ্যা করুন। তিনি বললেন, "মূলত সিনিয়র বিজনেসম্যানদের লাঞ্চের ক্লাব, তাই সন্ধের আড্ডাটা এখানে কখনই তেমন জমজমাট হয়নি। তবে বেঙ্গল ক্লাবে সন্ধেবেলায় ককটেল এবং পার্টি লেগেই আছে।"

একটু ভেবে তিনি বললেন, "সব দিক থেকে পয়েন্ট দিলে এ দেশের সেরা ক্লাব, আপনি 'জয় বেঙ্গল' বললে কিছু বেশি বলবেন না। বেঙ্গলের কোনও প্রতিযোগী নেই বললেই চলে। থাকবে কী করে? অন্য দু'-এক জায়গায় অতিবৃদ্ধ পেনশনার শাসকদের ঐতিহাসিক দাপট, মুদ্রাস্ফীতি যাদের আর্থিক সঙ্গতি শেষ করে দিয়েছে। এইসব মানুষের স্মৃতি আছে, হুঙ্কার আছে, কিন্তু খরচের সামর্থ্য নেই। আই সি এস অফিসার যদি কোমরে দড়ি বেঁধে প্যান্ট পরে সামাজিক জীবনে আসেন তা হলে কেমন লাগে বলুন তো? তখন দু'একটা ড্রিংক খাওয়াতেই হয়, পুরনো দিনের খাতিরে, কিন্তু পরিস্থিতিটা ভাল লাগে না। অন্য দিকে ধান্দাবাজদের ভিড়, পেটি কনট্রাকটর, সাপ্লায়ার এইসব দলে দলে উটকো ক্লাবের মেম্বার হয়েছে। তারা এখানে মুখ দেখাতে আসে। তাদেরও তেমন আর্থিক সামর্থ্য থাকে না, তবু তারা ক্লাবে বসে থাকে, কিন্তু পর্যাপ্ত খরচ করে না। এদের

মধ্যে স্যান্ডউইচ হয়ে থাকে আমাদের মতন কিছু লোক। বলতে কষ্ট লাগে, কিন্তু সত্যটা তো লুকিয়ে রাখা যায় না। এখানে এই বেঙ্গল ক্লাবে ওসব হাঙ্গামা অথবা ভেজাল মিশেল নেই। সমভাবাপন্ন লোকের সঙ্গেই আমাদের দেখা হয়ে যায়। বক্সওয়ালা, কমপিটিশনওয়ালার মধ্যে আদ্যিকালের সেই রেষারেষি এখন আর নেই। বক্সওয়ালা স্বীকার করে নিয়েছে, তার আর্থিক সঙ্গতি আছে কিন্তু রাজশক্তি নেই, আর সরকারি অফিসের কমপিটিশনে জেতা অফিসারেরা হাড়ে হাড়ে বুঝে গিয়েছেন, রাজশক্তিই সব নয়, বিশ্বসংসারে সুখে থাকতে গেলে কিছু নগদ অর্থেরও প্রয়োজন। ফলে একটা নিঃশব্দ সমঝোতা হয়েছে বলতে পারেন।"

আমার উপদেষ্টা ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন, এখনই বোর্ড মিটিংয়ের কয়েকজন আসতে শুরু করবেন ফ্রম অল ওভার ইন্ডিয়া! তিনি রসিকতা করলেন, "আর এক ধরনের অত্যাচার এখানে নেই। অনেক সতীসাধ্বী মহিলা তাঁদের বুড়োহাবড়া স্বামীদের সান্নিধ্য সারাক্ষণ সহ্য করতে পারেন না, তাই জোর করে এইসব স্বামীদের ক্লাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, স্রেফ খবরের কাগজে পড়ে সময় কাটাবার জন্যে। এঁদের ব্লাড সুগার হাই, হজমশক্তি একেবারেই নেই। ক্লাবে বসে এঁরা প্রায় কিছুই খান না। এই বয়সে একটু ধর্মে মতিও হয়, ফলে অনেকের সুরাপানও বন্ধ। এইসব লিভিং অথচ ডেড মেম্বারকে সহ্য করতে হয় না এই বেঙ্গল ক্লাবে।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন প্রকৃত ক্লাব কালচার আমাদের মধ্যে নেই?"

আবার প্রদর্শক একমত হলেন না। "তা বলি কী করে! সায়েবদের সংস্পর্শে এসে কলকাতার রক্তে এই ক্লাব-সংস্কৃতি ঢুকে গিয়েছে। একসময় তো শুধু এটা প্রাসাদপুরীর শহর ছিল না, সিটি অব ক্লাবসও ছিল। ক'টা আর সায়েব ছিল—তাদের জন্য সংখ্যাহীন ক্লাব। দেখুন না—ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাব, ডালহৌসি ইনস্টিটিউট, ইউনাইটেড সার্ভিসেস ক্লাব, স্যাটারডে ক্লাব, বেঙ্গল ক্লাব, থ্রি হানড্রেড ক্লাব, ফোর্ট উইলিয়াম ক্লাব, লেডিজ গলফ ক্লাব, সুইস ক্লাব, উট্রাম ক্লাব, রোয়িং ক্লাব, ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব, অর্ডনান্স ক্লাব, যোধপুর ক্লাব, রয়াল

ক্যালকাটা গলফ ক্লাব, টলি ক্লাব, ওদিকে ব্যারাকপুর ক্লাব। চিড়িয়ামোড়ে জুনিয়র সায়েবদের জন্যে ছিল ইউবিক ক্লাব।—আপনি হিসেবের খেই রাখতে পারবেন না। তাই এই শহরে রেস্তোরাঁ ব্যবসা একটু মার খেয়েছে। যতো বড় শহর সে তুলনায় ভদ্র রেস্তোরাঁ খুব কম।"

প্রদর্শক আমাকে বিদায় দেবার আগে বললেন, "বেঙ্গল ক্লাব জিনিসটাকে সায়েবরা হাল্‌কাভাবে নেননি। সবাই সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন। নিয়মকানুন সেই শুরু থেকেই কড়া। এমনকি ক্লাবের ম্যাগাজিন বা খবরের কাগজ বাইরে নিয়ে যাওয়া যে মহা অপরাধ তা রুলস-এ লেখা আছে। সেই সঙ্গে নগদনারায়ণ! কেউ পাওনা দিতে দেরি করলে ইংরেজের রক্ত মাথায় উঠে যায়, তাই বিলের টাকা দিতে দেরি হলেই নাম পোস্ট-এর ব্যবস্থা এবং নির্ধারিত সময়ের পরেই সভ্যপদ থেকে নাম কেটে দেওয়ার নিষ্ঠুর নিয়ম।"

"শুনুন মশাই, সেকেলে সায়েবদের আর একটা গর্ব ছিল, ক্লাবের খাবার কোনওক্রমে বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না! এটা বোধ হয় করা হয়েছিল ক্লাবের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্যে। সুখাদ্যের যা কিছু রহস্য তা নিয়ে এইখানে বসে মাথা ঘামাও, কিন্তু বাইরে গিয়ে ক্লাবের অন্ন আস্বাদন ও বিশ্লেষণ অবশ্যই নয়। এখন এইসব নিয়ম শিথিল হচ্ছে, এইভাবে ক্লাব ও হোটেলের দূরত্ব ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ক্লাবে হোটেলঘর হচ্ছে, হোটেলের মধ্যে ক্লাব হচ্ছে। যেমন ধরুন তাজ বেঙ্গলের ক্লাব চেম্বার্স! সভ্য হবার প্রবেশ ফি এক লাখ টাকা, বাৎসরিক চাঁদা বাইশ হাজার টাকা। তবু সভ্যের অভাব হচ্ছে না।"

আর একজন অভিজ্ঞ সভ্য দয়া করলেন। তিনি ভেবেচিন্তে বললেন, "সব পয়েন্ট ধরলে ইন্ডিয়ার সেরা ক্লাব বলতে এই বেঙ্গল। প্রায় লন্ডনের ওরিয়েন্টালের সঙ্গে তুলনা চলে। ওরিয়েন্টালে আজকাল এইসব উর্দি পরা খানসামা, খিদমতগার, আবদার নেই, এখন ফিলিপাইনের কর্মী ঢুকে পড়েছে। ইংরেজ এখন সুখী জাত, খাটুনির কোনও কাজ করতে চায় না। কম মাইনেতে তার মনও ভরে না।"

খানসামা, আর্দালি, আবদারের কথা উঠলো। তিনি বললেন, "আমি আর কী বলবো? আমার মনে হয়, বিলাসী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এবং তার

মেম যখন কুঁড়ে হয়ে গেলো, আলস্য ভরপুর সেই সমাজে এই সবের সৃষ্টি—কিন্তু খানসামা কালচার চিরস্থায়ী হওয়া শক্ত। সময় তো তার নিজের খেয়ালেই চলেছে! তবু ভেরি ইন্টারেস্টিং—ইতিহাসের অংশ হিসেবে এসব একটু-আধটু সংরক্ষণ করা উচিত কি না তা সমাজকেই ঠিক করতে হবে। এই বেঙ্গল ক্লাবে আগে এইরকম তিন-চারশো কর্মী ছিলেন, এখন কমতে কমতে হয়তো একশোয় দাঁড়িয়েছে। এইসব কর্মী এক দিনের প্রশিক্ষণে তৈরি হয় না, এঁদের অনেকের পারিবারিক ধারাবাহিকতা আছে। চার প্রজন্ম এখানে কাজ করাটা কোনও ব্যাপারই নয়। এঁরা কেউ এসেছেন ইউ পি থেকে, কেউ ঢাকা থেকে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কলকাতার পুরনো পরিবার থেকে। আপনি স্টুয়ার্ড মিস্টার দত্তর সঙ্গে দেখা করেছেন?"

শাজাহান হোটেলে যেমন স্যাটা বোস, বেঙ্গল ক্লাবে তেমন পি কে দত্ত, অনুরাগী মহলে যিনি বুলটেদা বলেই সুপরিচিত। এক কথায় বেঙ্গলের মুকুটহীন মহারাজা, ১৯৪৫ থেকে অর্ধ শতাব্দীর ওপর প্রচণ্ড প্রতাপে রক্ষে করছেন বেঙ্গল ক্লাবের মানসম্মান ও মহিমা। আফটার অল খানা এবং পিনা বাদ দিলে কী আর অবশিষ্ট থাকে কোনও ক্লাবের?

বুলটেদা অবশ্য লজ্জা পেয়ে যান, মৃদু প্রতিবাদ করেন। তাঁর বক্তব্য, "অনেক কিছুই থেকে যায়—কার্ড, চেস, বিলিয়ার্ড এবং অবশ্যই লাইব্রেরি। কী বিশাল লাইব্রেরি এখানে ছিল তা তো জানেন না।"

পুরনো বাড়িটা বেচে দেওয়ার সময় সেই লাইব্রেরি ধ্বংস হয়ে গেলো। সৌভাগ্যক্রমে, সুযোগ দেওয়া হলো সেন্ট জেভিয়ারস কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে। এঁরা কিছু বই নিয়ে গেলেন, বাকি বই নিলাম করে দেওয়া হলো।

খানাপিনার আগে শুনুন কার্ড রুমের গল্প। আইভরি ফিনিশ স্পেশাল বেঙ্গল ক্লাব কার্ড আসতো খোদ বিলেত থেকে। জল দিয়ে ধোওয়া যেতো সেই কার্ড। কিন্তু মাত্র তিনবার খেলা হতো, রবার স্ট্যাম্প পড়ে যেতো 'থ্রি টাইম ইউজড'।

সেই কার্ড সেকেন্ড হ্যান্ড বিক্রি হতো কর্মচারীদের মধ্যে মাত্র চার

আনায়, ওখানে বেটিং চলতো, তবে ওই ঘরে কার্ড বেয়ারা ছাড়া অন্য সবার প্রবেশ নিষেধ! কার্ড বেয়ারাকে একজন স্পেশালিস্ট বলতে পারেন, তাসের হাড়হদ্দ তার জানা। তারা নতুন তাস টেবিলে নিয়ে যাবে, তুলে রাখবে, স্কোরকার্ড দেবে, পেন্সিল জোগাবে! কার্ড টেবিলের ডিজাইনও অন্য রকম।

নানা ধরনের বেয়ারাও ছিল। সায়েব এলে যে টেবিলে বসবেন বেয়ারা তা ঝাড়পোঁছ করবে। সায়েব অনেক সময় হন্যে হয়ে এসে স্নান সেরে নেবেন। সেই সময় কে তাঁকে সাবান এগিয়ে দেবে? তোয়ালে দেবে? তখন সাবান বলতে বিলিতি 'কোলটার' সাবান এবং মেড-ইন-ইংলন্ড স্বচ্ছ পিয়ার্স সোপ। আরও থাকতো ল্যাভেন্ডার সাবান এবং ল্যাভেন্ডার স্প্রে, যাতে সহজেই ফ্রেশ হওয়া যায়। টিপস কোনওক্রমেই অ্যালাউ ছিল না, যা দেবার সায়েবরা বক্সে দিয়ে দিতেন, তা ভাগ হতো বছরে একবার, স্টুয়ার্ড থেকে সবাই বকশিসের ভাগ পেতেন।

বেঙ্গল ক্লাবে সবই নিজস্ব ছিল—এসব জিনিস বাইরে পাওয়া যেতো না। এমনকি লেমনেড। একসময় এই লেমনেডও বিলেত থেকে আসতো। নিজস্ব রোস্টেড টার্কিশ সিগারেট আসতো তুরস্ক থেকে। কফির পরে হয় চুরুট অথবা টার্কিস সিগারেট। পরে প্লেন সিগারেটও কিছু থাকতো। চুরুটে আগুন দেওয়া সে এক এলাহি ব্যাপার!

দেশলাই বা লাইটার জ্বালায় তো ফোতো বাবুরা—বেঙ্গল ক্লাবে থাকতো আগদান। টিকের আগুনের স্পেশাল ব্যবস্থা। সায়েবদের মুখাগ্নিতে সাহায্য করার জন্য স্পেশাল কর্মীর নাম সিগার বেয়ারা।—যে শুধু নজরে রাখছে কোন সায়েব কখন চুরুট ধরাতে চাইছেন। এই অগ্নিসেবার স্পেশাল স্টাইল ছিল। খুব বিখ্যাত কেউ এলে রুপোর খুদে আগদান তাঁকে উপহার দেওয়া হতো—বিলেতের লর্ড ফ্যামিলিতে অনুসন্ধান করলে উনিশ শতকের সেইসব আগদান হয়তো আজও কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে, যা আদিতে সংগৃহীত হয়েছিল কলকাতার বেঙ্গল ক্লাব থেকে।

বুলটেদার আদিবাড়ি চিৎপুর অঞ্চলে। ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে সম্পত্তি

বেচে দত্তরা চলে যান দত্তপুকুরে, যেখানকার ছানা আজও কলকাতার মিষ্টান্ন মেজাজ পরিমাপ করছে। এর পরে দত্ত পরিবারের এক অংশ আবার বেলিয়াঘাটায় ফিরে এসেছেন।

বেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে দত্তদের সম্পর্ক প্রায় একশো বছরের। পিতামহ বসন্তকুমার কাজ করতেন স্টোরে। তখন স্টোর ব্যাপারটা ছিল দুর্ধর্ষ—খোদ বিলেত থেকে আসতো কতো আইটেম, সে সবের পাকা ব্যবস্থা করা সহজ নয়। যথাসময়ে ছেলে সত্যচরণকে তিনি বসালেন ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে।

বেঙ্গল ক্লাবের ক্যাশ বলে কথা! পান থেকে চুন খসলে হইহই রইরই কাণ্ড। বুলটেদার কাকা যোগেশচন্দ্রও কাজ করতেন এই ক্লাবের স্টোরে। অর্থাৎ দত্তদের রক্তের মধ্যেই বেঙ্গল ক্লাব রয়ে গিয়েছে বলতে পারেন।

বুলটেদা পড়তেন নারকেলডাঙ্গা জর্জ হাইস্কুলে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন সবে। তখনও যুদ্ধ চলেছে, যদিও মিত্রপক্ষের জয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ক্লাবের সেক্রেটারি তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ কিউবিট সায়েব। প্রেসিডেন্ট ম্যাকফারলেন সায়েব—খোদ র‍্যালি ব্রাদার্সের বড় সায়েব। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান মিলিটারি অফিসারদের অনুগ্রহে ক্লাবের তখন রমরমা অবস্থা। তাঁরা হইহই করে আসেন, হইহই করে খাওয়া-দাওয়া করেন। এঁদের জন্যে ক্লাবের নিয়মাবলী শিথিল করা হয়েছে।

এঁরা শার্ট পরে ক্লাবে ঢুকতেন। তার ওপর যুদ্ধের ফলে সব জিনিসের অভাব, বিশেষ করে বিলিতি ড্রিংকসের। সেই সময় খেটে খেটে কর্মীরাও আর পেরে উঠছেন না। কিছু কর্মীকে অন্য হোটেল ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সৈন্যদের জন্যে তখন ক্লাবের মধ্যেও কয়েকটি ডরমিটরি প্রস্তুত হয়েছে, যাকে দিশি বাংলায় টানা বিছানা বলা যেতে পারে, অর্থাৎ একই ঘরে একাধিক শয্যা। কর্মীরা তখনও এয়াররেড ভাতা পাচ্ছেন।

সেই সময় কিউবিট সায়েব বিশ্বস্ত লোক খুঁজছেন—যাকে তাকে তো বেঙ্গল ক্লাবে ঢুকতে দেওয়া যায় না। খবর পেয়ে মা বললেন, "বুলটে ভীষণ আড্ডাবাজ হয়ে উঠেছে, সারাক্ষণ ইয়ারবন্ধু নিয়ে বসে আছে, ওকে কাজে

ঢুকিয়ে দাও।" বাবার হাত ধরে বুলটেদা চৌরঙ্গীর বেঙ্গল ক্লাবে এলেন— ইতিহাস অন্য স্রোতে প্রবাহিত হতে শুরু করলো।

মায়ের পেট থেকে পড়েই বেঙ্গল ক্লাবের স্টুয়ার্ড হওয়া যায় না! এর জন্যে ধৈর্য চাই, সাধনা চাই এবং কিছুটা সৌভাগ্য চাই। প্রথমে অ্যাপ্রেনটিস ক্লার্ক, তারপর ক্লার্ক, সিনিয়র ক্লার্ক এবং একপর্যায়ে ভাঁড়ার ঘরের ইনচার্জ। ভাঁড়ারে কী আছে না জানলে স্টুয়ার্ড হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই বেঙ্গল ক্লাবে।

সেই সময় কিংবদন্তিসম স্টুয়ার্ড মিস্টার ইউ রেশিয়ার নজরে পড়ে গেলেন বুলটেদা। মাঝে মাঝে তাঁর ফাইফরমাস খাটতে হতো। ফাঁক পেলেই তাঁর নির্দেশ শুনতেন দত্তমশাই, নোটবুকে কিছু কিছু কথা লিখে রাখতেন।

রেশিয়া সায়েব তো ডিকসনারি নন, খাদ্যজগতের একটি চলমান বিশ্বকোষ! সুযোগ পেলেই কিচেনে ছুটতেন বুলটে, লক্ষ্য করতেন কীভাবে কোন রান্না হয়। কুকদের কীভাবে না চটিয়ে কাজ আদায় করতে হয়। ভাল আর্টিস্ট এবং ভাল কুকের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই! দু'জনেই মেজাজদার। সমঝদার পেলে দু'জনেই ভীষণ খুশি। দু'জনেই তারিফ পেলে আরও ভাল করবার জন্যে জ্বলে ওঠেন। একটা জিনিস বুলটেদা লক্ষ্য করেছেন, একই ডিশ একই কুকের হাতে এক একদিন একরকম হয়, শিল্পীর মেজাজ অনুযায়ী, মর্জি অনুযায়ী।

রসিক সায়েব মেম্বাররা সেকালে কুকের বেজায় তারিফ করতেন। কিচেনে এসে নিজেদের মতামত জানিয়ে যেতেন কুককে। এখনও কেউ কেউ সেই সম্মান করেন। তবে ফ্রান্সের মতন শেফের অটোগ্রাফ নেন না।

ক্লাবের স্তম্ভই হলো স্টুয়ার্ড। ওখানে কিছু গড়বড় হলেই ইমারতের খিলেন ফেটে যাবে। বেঙ্গল ক্লাবের মেম্বারদের জিভ বলে কথা—কোনও খামতি, কোনও ত্রুটি সেখানে ধরা না পড়ে যাবে না। সাহস থাকলে কেউ লিখুক না বেঙ্গল ক্লাবের স্টুয়ার্ডদের ইতিহাস।

এটা মনে রাখতে হবে, হোটেলে রেস্তোরাঁয় অচেনা গ্রাহকের কারবার, নদীর স্রোতের মতন খরিদ্দার-ধারা সেখানে বয়ে যাচ্ছে। আর বেঙ্গল ক্লাবে

কেউ হয়তো পঁয়ত্রিশ বছরের মেম্বার—তিনি স্টেক চাইলে কতটা তৈরি হবে মাংস তা জেনে রাখতে হবে। যে স্টুয়ার্ড এসব জানতে এবং মনে রাখতে আগ্রহী নয় তার এ-লাইনে আসার মানে হয় না।

ঘরছাড়া মানুষ খেটেখুটে ক্লান্ত হয়ে তোমার কাছে এসেছে, আর তুমি জানবে না, তিনি ঝাল কতটা পছন্দ করেন, কিংবা যদি তাঁর শরীরটা ম্যাজম্যাজ করে তাঁকে কী খাবার তুমি রেকমেন্ড করবে? কী অর্ডার হবে শেষপর্যন্ত তা মেম্বারের মর্জি, কিন্তু প্রথম প্রেসক্রিপশন স্টুয়ার্ড ছাড়া কে দেবে?

আবার গেস্টদের আনন্দে মেম্বারদের মুখ উজ্জ্বল হতে দেখলে সবচেয়ে বেশি আনন্দ স্টুয়ার্ড ছাড়া কার হবে? "মশাই এটা সাদামাঠা চাকরি নয়, আনন্দধামে সেবা, মানুষ একটু দুঃখ কষ্ট ভুলে হাল্‌কা হতে চাইছে, তাকে দু'দণ্ড শান্তিসাগরে সাঁতার কাটতে দেওয়া, তবে না স্টুয়ার্ড। বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? মেম্বার ও তাঁর অতিথিই তোমার তো চলন্ত ঈশ্বর, আজীবন এঁদের সেবাতেই পরম পরিতৃপ্তি পেয়েছেন পি কে দত্ত ওরফে বুলটেদা।"

শুনুন একটু জাঁদরেল স্টুয়ার্ডদের কথা! পৌনে দুশো বছর পরেও বেঙ্গল ক্লাবের প্রথম স্টুয়ার্ড টমাস পেন-এর খুবই সুনাম। এঁর আগে কলকাতায় যাঁদের বেজায় সুনাম ছিল তাঁদের নাম গুন্টার এবং হুপার। পেন সায়েব প্রাইভেটে বরফের ব্যবসা করতেন। কলকাতায় আট আনা সের ১৮৩১ সালে। সেই সঙ্গে স্পেশাল ঠাণ্ডা কুলফি দেড় টাকা। মনে রাখতে হবে, বরফ তখন সোনার মতন দামি। স্থানীয় বরফের বাজার নষ্ট করলো আমেরিকা থেকে জাহাজে বয়ে আনা ঠাণ্ডাবরফ।

পেন সায়েবের গল্প এখনও ঘুরছে বেঙ্গল ক্লাবে। কিন্তু সত্যিই যিনি কিংবদন্তি হয়ে আছেন তিনি বুলটেদার গুরু ইউ রেশিয়া সায়েব।

এফ এস কিউবিট এম-সি, বেঙ্গল ক্লাবের সেক্রেটারি হন ১৯৩৪ সালে। পরের বছরই তিনি স্টুয়ার্ড পদের জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। স্বভাবতই তিনি চাইলেন ব্রিটিশ। কিন্তু তেমন ভাল আবেদনকারী পাওয়া গেলো না। এর পরেই রয়েছে একজন ইতালিয়ানের আবেদন, তিনি

কলকাতার বিখ্যাত পেলেতিজ রেস্তোরাঁর সঙ্গে যুক্ত। সেকালের রহিস বাঙালিরাও জানতেন পেলেতিজ-এর মাহাত্ম্য। রেশিয়া সায়েব সেই যে বেঙ্গলে ঢুকলেন শুরু হয় বেঙ্গল ক্লাবের খানাপিনার স্বর্ণযুগ। রেশিয়া সায়েব কিচেনে হাতে ধরে ছেলে ছোকরাদের রান্না শেখাতেন, সবার ওপর নজর রাখতেন শিকারি বাঘের মতন।

মহাযুদ্ধের সময় রেশিয়া সায়েবকে জেলে কাটাতে হতো। কিন্তু শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে রেশিয়া সায়েব যথাসময়ে ইতালিয়ান পাশপোর্ট জমা দিয়ে ব্রিটিশ নাগরিক হওয়ার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করলেন। বেঙ্গল ক্লাবের রেশিয়াভক্ত ইংরেজরা সমস্যাটা সহজ করে দিলেন। ব্যাপারটা বুঝুন, ঘোর দুর্দিনে ইউরোপে মরণবাঁচন সংগ্রাম হচ্ছে জার্মান ও ইতালীয়দের সঙ্গে, আবার সেই সব সৈন্যাধ্যক্ষরা কলকাতার বেঙ্গল ক্লাবে বসে পশ্চিমী খানা উপভোগ করছেন ইতালীয় স্টুয়ার্ড ইউ রেশিয়ার হাতে! রসনা ও রমণী কোনও দূরত্ব, কোনও বিভেদ মানে না—স্ত্রীরত্নং তো দুষ্কুলাদপী!

বিশ্বযুদ্ধের সময় সত্যিই গিয়েছে রেশিয়া সায়েবের অগ্নিপরীক্ষা। সবাই সুখাদ্য-সুপানীয় আস্বাদন করতে ব্যগ্র, কিন্তু ক্লাবের ভাণ্ডার প্রায় শূন্য—সব কিছুরই অভাব। চালেরও র‍্যাশনিং। পানীয়, বিশেষ করে হুইস্কি ও জিনের শোচনীয় দুর্ভিক্ষ। সারা কলকাতায় তৃষিত সায়েবদের হাহাকার। ক্লাবের কর্তারা ঘন ঘন মিটিং করছেন রেশিয়া সায়েবের সঙ্গে। যুদ্ধের দোহাই দিয়ে পেগের আকারও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে—হাফ পেগ হয়েছে তিন ভাগের এক ভাগ! স্কচের অভাবে টান ধরলো জিন, মদিরা ও শেরিতেও।

১৯৪৩ সালে ক্ল্যান কলকুহন নামে এক জাহাজ আসবার খবর রটলো—বেঙ্গল ক্লাবে সে কি আনন্দ! যথাসময়ে এই জাহাজ এসে পৌঁছনোয় সে বছরের বড়দিন উৎসব মাঠে মারা গেলো না। স্কচ না থাকলে বিদেশের মাটিতে ইংরেজ বাঁচবে না।

এমন পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে যিনি বেঙ্গল ক্লাবের ইজ্জত রক্ষা করলেন তিনি জাদুকর ছাড়া কী? ইউ রেশিয়া সায়েব এইখানেই বিবাহ করেছিলেন। থাকতেন কাছেই স্টিফেন কোর্টে, ক্লাবের ফ্ল্যাটে।

বাড়িতে রান্নার পাট ছিল না। কর্তা গিন্নি দু'জনেরই খাবার যেতো এখানকার কিচেন থেকে, হোম লিভ পেতেন। মেমসায়েব নিজেও হেয়ার ড্রেসিংয়ের কাজ করতেন, তবে হেঁজিপেঁজিদের নয়, বড়া মেমসায়েবদের। তবে হাঁ, কাজে নামলে, রেশিয়া চারটে লোকের কাজ করে ফেলতেন। কিচেনে হাঁকডাক করে কুকদের যা অবস্থা করতেন।

সেই রেশিয়া সায়েব বিলেতে চলে গেলেন ১৯৬৪ সালে। বিলেত গেলেও তাঁর মন পড়ে ছিল এই ক্লাবে, চিঠিতে প্রায়ই খবরাখবর নিতেন এবং প্রত্যেকটি নতুন মেনুর বিবরণ তাঁকে পাঠাতে হতো। বেঙ্গলের কিচেনে ইউ রেশিয়ার আত্মা এখনও বোধহয় ঘুরে বেড়ায়, কুকরা ফাঁকি দিয়ে কোনও কাজ সারবার আগে, মশলা অপচয় করবার আগে, মেম্বারের নির্দেশ অনুযায়ী নরম কিংবা কড়া করে ভাজবার আগে, রেশিয়া সায়েবকে মানসচক্ষে দেখতে পায়! এমনকি তারাও যাদের বয়স কম এবং যারা রেশিয়া সায়েবকে কোনওদিন চোখে দেখেনি তারাও রেশিয়াকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। রেশিয়া সায়েব তাঁর কর্মজীবনে অনেক বড় বড় চাকরির লোভ সংবরণ করেছেন, বিরাট হোটেলে বিরাট কাজের জন্যে টানাটানি হয়েছে, কিন্তু রেশিয়া সায়েবের ধারণা ছিল, বেঙ্গল ক্লাবের কুক এবং স্টুয়ার্ড পৃথিবীর কোথাও গিয়ে সুখী হতে পারবে না। স্বর্গ যদি কোথাও থাকে সে হেথায়, সে হেথায়।

এই রেশিয়া সায়েবের মানসপুত্র আমাদের দত্তসায়েব। কাজ শিখবার জন্যে বুলটে দত্ত মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। রেশিয়া সায়েবের আদর এবং ঠোক্কর দুই খেতে খেতে খানাপিনা জগতের গোপন রহস্যগুলি তিনি তিলে তিলে আয়ত্ত করেছেন। অফিসের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেও বুলটে দত্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনওরকম বাড়তি পারিশ্রমিক ছাড়াই ছিনেজোঁকের মতন লেগে থাকতেন রেশিয়ার পিছনে, ডায়রিতে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করতেন। সেই সঙ্গে শিখেছেন, মেম্বার ও তাঁর অতিথিকে আহ্বানের ও আপ্যায়নের স্টাইল।

বড়লাট থেকে বড়বাবু পর্যন্ত সবার সঙ্গে সবিনয়ে কথা বলবার দুরূহ বিদ্যাটি বহু সাধনায় আয়ত্ত করেছেন বুলটেদা এবং যথাসময়ে তাঁর

স্নেহভাজন দেবেন মিত্র, যাঁর বর্তমান খেতাব অ্যাক্টিং স্টুয়ার্ড, কারণ ৫২ বছর ব্যাটিং করে সত্তর বছরের বুলটেদা এখন কনসালটেন্ট স্টুয়ার্ড খেতাব অর্জন করেছেন। বুলটেদা হচ্ছেন ফিল্ডমার্শাল! কে না জানে মিলিটারিতেও ফিল্ডমার্শালদের অবসর নেই।

বুলটেদার সহকারী দেবেন মিত্র বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক, চান্স পেলেই কবিতার বই কিনে ফেলেন। দেখলে মনে হয় বয়স বছর বত্রিশ। তা শুনে হাসেন বুলটেদা। "কী বলছেন! ওর এখানে চাকরিই হলো চার দশক, জয়েন করেছে আপনার চৌরঙ্গী প্রকাশিত হবার আগে ১৯৬০ সালে।"

দেবেন মিত্রর সঙ্গে দত্তদের আত্মীয়তা আছে, তাই ঘরানাটা সহজেই হাতছাড়া করা যায়। এঁর বাবা গোকুল মিত্র এখানে কাজ করতেন, অকালে মারা যান ১৯৪৭ সালে।

শুনুন ক্লাবের কমিটির বিচক্ষণতা। গোকুলবাবুর মৃত্যুর পরের দিনই কমিটির মিটিং হলো এবং স্থির হলো একসঙ্গে টাকা দিলে বিধবা হয়তো টাকা নষ্ট করে ফেলতে পারেন। তারপর দেবেনের মায়ের মাসোহারার ব্যবস্থা—বহু বছর ধরে এম ও-তে টাকা পাঠিয়েছে ক্লাব প্রতি মাসে। তারপর দেবেনের দাদা এবং পরে দেবেনবাবু এখানে কাজে ঢুকলেন। দাদা দুর্গাচরণবাবু কাজ করতেন সোডা ওয়াটার ডিপার্টমেন্টে, এই বিভাগ পরে বিক্রি হয়ে যায় ক্যালকাটা ক্লাবের কাছে। সেখানেই চলে গেলেন দুর্গাচরণবাবু।

আর দেবেন মিত্রও ধাপে ধাপে উন্নতি করেছেন। খানাপিনার প্রাথমিক রহস্যগুলো বুঝতেই বিশ বছর লেগে গিয়েছে। "তড়বড় করে এখানে কিছু হয় না, শর্টেও সবকিছু সারা যায় না, তাই ভাল রান্না মানেই অসীম ধৈর্য এবং যা করছেন সেবিষয়ে গর্ববোধ।" এই গর্ববোধ এঁরা পেয়েছেন রেশিয়া সায়েবের কাছ থেকে, যাঁর মুখে একমাত্র কথা, "মনে রেখো, এটা বেঙ্গল ক্লাব।"

শুধু কোকাকোলা কোম্পানির ফর্মুলা নয়, বেঙ্গল ক্লাবের রান্নারও গোপন ফর্মুলা আছে। সেকথা বুলটেদা সোজাসুজি স্বীকার করতে চান না,

কিন্তু সহজেই বোঝা যায়।

ধরুন রেশিয়া সায়েবের কথা—নানারকম হার্ব জোগাড় করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন, বিদেশযাত্রী মেম্বারদের কাছে হার্ব নিয়ে আসবার জন্যে নানা অনুরোধ করতেন। কতরকম হার্ব—তুলসীপাতা পর্যন্ত লাগে সুখাদ্য রচনায়। সেই সঙ্গে মশলা। এইসব মশলার ফর্মুলা বেশ গোপন। বিশ বছরের সাধনার পরে কুক হয়তো কিছুটা জানতে পরে। ঝপ করে বেঙ্গল ক্লাব ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে এবং একই মটন রোস্ট বানাতে শুরু করবে তা হলে বেঙ্গল ক্লাবের রইল কী? এর নাম ঘরানা, এখানকার নতুন ঘরানার নাম রেশিয়া, যাঁর শাগরেদরা এখন দুনিয়ার বড় বড় হোটেল এবং ক্লাবের কিচেনে নিযুক্ত রয়েছে, অথচ বেঙ্গল ক্লাবকে একটুও কাহিল করতে পারছে না।

"এইটাই তো হওয়া উচিত। কী বলেন?"

"অবশ্যই। কম্পিউটার এবং আই এস ও নাইন থাউজেন্ড যেদিন রান্না ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অনুপ্রবেশ করবে সেদিন পৃথিবীর দুর্দিন। রান্নার কোনও শর্টকাট এখনও দুনিয়া বার করতে পারেনি। ফাস্ট ফুডকে রসিকরা আজও ফুড মনে করেন না।"

"এতোসব রেসিপি মনে রাখেন কী করে?" আমি জানতে চাই।

হাসলেন বুলটেদা। "রোগের নাম, ওষুধের নাম, ডাক্তাররা কী করে মনে রাখে, শংকরবাবু? হয়ে যায়। মনে রাখবার একটা উপায় আছে। ধরুন ইংরিজি রান্না। বেকড, বয়েলড, ফ্রায়েড, স্মোকড, রোস্টেড, গ্রিলড—একটা কিছু পথ ধরে আপনাকে যেতে হবে। তারপর ধরুন, কোন খাবারের সঙ্গে কী গারনিশিং চলবে।"

গানের সঙ্গে যেমন হারমোনিয়াম, সেতারের সঙ্গে যেমন তবলা, ভুল গারনিশিং হলেই মুশকিল।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই দেবেন মিত্রর ছোট্ট ঘরে ঢুকলেন ঢাকার আদি বাসিন্দা লুকাস গোমেস। এখানকার নামকরা কুক, তবে নন-ভেজিটারিয়ান রান্নায়। রেশিয়া সায়েবের হাতে গড়া শিষ্য, ৩৫ বছর কাজ করে অবসর নিয়ে, আবার এক্সটেনশনে আছেন। এইসব আর্টিস্ট চাইলেই

পাওয়া যায় না। এঁরা লুপ্তপ্রায় প্রাণী হতে চলেছেন, শুনলাম। বেঙ্গল ক্লাবের রাঁধুনি ভাঙিয়ে নেবার জন্যে দেশেবিদেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা।

ষাট বছরের লুকাস গোমেসকে দেখে বয়স বোঝা যায় না। ছেলের নাম ধীরাজ পিটার গোমেস—ইতিমধ্যেই দেশ ছেড়ে দুবাই চলে গিয়েছে, সহকারী কুক হিসেবে, থাকা-খাওয়া বাদেই মাসিক হাজার পনেরো টাকা উপার্জন করছে। কেন এদেশে থাকবে? ইংলিশ এবং ইন্ডিয়ান দু'রকম রান্নাই সে জানে—অর্থাৎ পৈতৃক ঘরানা থেকে ধীরাজ বঞ্চিত হয়নি।

ঢাকার খ্রিস্টানরা, চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা এবং অবশ্যই সিলেটিরা হাতাখুন্তি হাতে বিশ্বজয় করছে। সিলেটি বড়ই স্বাধীনতাপ্রেমী, সে বেশিদিন কারও দাসত্ব করে না, নিজেই দোকান খুলে বসতে চায়। কিন্তু মিস্টার গোমেসের আত্মীয়বন্ধুরা ছড়িয়ে রয়েছেন পৃথিবীর সর্বত্র। মাইনে ভাল সৌদিতে—হাজার পঞ্চাশেক ভারতীয় টাকা। আরও ভাল অস্ট্রেলিয়ায়। আর যারা ওয়েস্টার্ন ও ইন্ডিয়ান দুটো রান্নাতেই সিদ্ধহস্ত তাদের তো কথাই নেই।

রেশিয়া সায়েবের মস্ত গুণ ছিল সব কাজ শিখিয়ে দিতেন, কিছুই গোপন রাখতেন না।

তবে ধাপে ধাপে উঠতে হয়, পেট থেকে পড়েই বেঙ্গল ক্লাবের কুক হওয়া যায় না। প্রথম পাঁচ বছর স্রেফ গন্ধ শোঁকো, আর কিচেনে বসে সবজি কাটো, পেঁয়াজের খোসা ছাড়াও। সবজিকাটা সহজ নয়, যে পদ রান্না হবে সেই রকম কাটা—আলুই কাটা যায় এক ডজন স্টাইলে। তারপর অ্যাসিস্ট্যান্ট হেল্পার হও, মাংসের দু'তিনশো রকম নাম শেখো। মাটন, বীফ, পিগ এসব চিনতে শেখো—এক একটা শরীরের এক একটা অংশের মাংসের নাম এক এক রকম। এক একটা ডিশে একটা অংশ লাগে যেমন রোস্ট স্যাড্‌ল অফ মাটন। দাবনা থেকে পাঁজরা থেকে খাবার হবে না, চাই পিঠের কাছের অংশ, যার নাম স্যাড্‌ল।

বুলটেদা বললেন, "অনেক রান্না শেষপর্যন্ত না এদেশ থেকে একেবারে উঠে যায়! ধরুন ইয়র্কশায়ার পুডিং। রোস্ট সিরলয়েন অফ বিফ। আমরা

ভাবতেও পারি না সার্ভ করবো ইয়র্কশায়ার পুডিং ছাড়া। সিরলয়েন হলো গোরুর নিতম্বের অংশ, আপনি নিশ্চয় জানেন। ইয়র্কশায়ারে লাগে ডিম, ময়দা, চর্বি এবং গোলমরিচ। বিফ সোয়েট দিয়ে মাখতে হয়, তবে খাস্তা হয়। আজকাল চাপে পড়ে আমরাও ভেজিটেবল অয়েল দিয়ে ভাজছি। এই রোস্ট বিফ অথবা মটন সিরলয়েনের সঙ্গে ইয়র্কশায়ার পুডিং-এর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কেন্দ্র যে বেঙ্গল ক্লাব সে সম্বন্ধে সন্দেহ রাখার কারণ নেই।"

গোমেস বললেন, "রোস্ট মটন বেশি সময় নেয় বিফ থেকে। যতো কিলো মাংস তাতে কুড়ি মিনিট দিয়ে গুণ করে কাজে নামতে হয়, মাঝে মাঝে চেক করতে হয়। বড় আলু রোস্ট করতে কুড়ি মিনিট, তবে তাড়াতাড়ি থাকলে চারটুকরো করে নিতে হয়, বারো মিনিটে কাজ শেষ।"

"তবে যার যা সময় তা দিতে হয়, স্যর," মস্ত দার্শনিকভাবে বললেন গোমেস। "এই যে ডিম, দশ মিনিটের আগে বয়েল হয় না, হাফ বয়েল করতে চার মিনিট।" এসব ভগবান বেঁধে দিয়েছেন, গোমেসের কথা শুনে মনে হলো।

এখানকার হেড কুক ছিলেন আদিপর্বে গ্যাব্রিয়েল গোমেস। লুকাসের সঙ্গে শালা-ভগ্নীপতি সম্পর্ক। লুকাস নিজেও একসময় গ্র্যান্ড হোটেলে কাজ করতেন, প্রেস্টিজ বাড়াবার জন্যে বেঙ্গল ক্লাবে চলে এলেন ভগ্নীপতির সাদর আমন্ত্রণে।

আগে বেঙ্গল ক্লাবে ইন্ডিয়ান ফুডের কদর ছিল না। কোনও কোনও দিন নামকা ওয়াস্তে সায়েবদের 'কারি লাঞ্চ'—রাইস, কারি, পাপাডম এবং সুইট ম্যাঙ্গো চাটনি। প্রায় অখাদ্য সুরসিকদের কাছে।

বুলটেদা বললেন, "সায়েববাড়ির বাবুর্চিরা নিজের বিদ্যে জাহির করবার জন্যে বানাতো 'চিকেন কানট্রি ক্যাপটেন'। সায়েব বেচারা ওই খেয়েই সন্তুষ্ট। মাঝে মাঝে মাটন ভিন্ডালু।"

"ভিন্ডালু আবার কোন ধরনের আলু?" আমি জানতে চাই।

বুলটেদা বুঝিয়ে দিলেন, "সমস্ত মশলা ভিনিগারে ভিজালে হয়

ভিন্ডালু—তারপর ওই মশলায় কষে যে মাংসের কারি তার নাম মটন বা চিকেন ভিন্ডালু!" সিরিয়াস ইন্ডিয়ান ফুড শুরু হলো এই ক্লাবে, পুরনো বাড়ি ভেঙে রাসেল স্ট্রিটে এসে। তারপর এসেছে নিরামিষ রান্না, এখন মারওয়াড়ি মেম্বার বেড়েছে—ফলে নিরামিষ সেকশনটা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। আরও ঢুকছেন (বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা) আদি বাংলা রান্না। বাংলা ডিপার্টমেন্টের প্রধানের নাম ও কবিগুরুর নাম এক।

"রবীন্দ্রনাথ কোথায়?" হাঁক পাড়লেন বুলটেদা, তাঁকে খুঁজতে তৎপর হয়ে উঠলেন মিস্টার দেবেন মিত্র।

ইতিমধ্যে বিলিতি খানা সম্বন্ধে আলোচনা চললো। বুলটেদার সংগ্রহে একটা বিশাল ফরাসি বই আছে, সেখানে বহু মেনু লেখা আছে সংক্ষেপে। মার্জিনে শত শত নোট ও সংশোধনী জুড়েছেন বুলটেদা। মনে খুব সন্দেহ হলে একবার ঝপ করে বই দেখে নেন।

"বিশেষ করে সস—খুবই সিরিয়াস সাবজেক্ট। যেমন 'হর্স র‍্যাডিস সস'—এর সঙ্গে ঘোড়ার মাংসের কোনও সম্পর্ক নেই, মুলোটারই ওই নাম—বিফের সঙ্গে জমে ভাল।"

বহু বছর আগে নেহরুজি এই ক্লাবে এসে কী খেয়েছিলেন তাও ভোলেননি বুলটেদা—গ্রিল্‌ড স্প্রিং চিকেন। একটু পরে বিস্কিট মন্টি কার্লো এবং পুডিং চকোলেট।

বুলটেদা লজ্জা পেলেন, কিন্তু এক প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের কাছে খবর পেয়েছি এখানে একটি জনপ্রিয় পদের ইদানীং নাম হয়ে গিয়েছে 'জ্যোতিবাবু চিকেন'। কিছুই নয়—সুপ্রিম দ্যা ভোলে সামপিনোর একটু নামান্তর। সামপিনো মানে স্যামপেন নয়, ফরাসি শব্দ, অর্থ মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা। জ্যোতিবাবুর ফেভারিট ডিশ। ওঁর আর এক প্রিয় বেঙ্গল ক্লাব ডিশ—স্মোকড্ হিলসা। এবং বেক্‌ড আলাস্কা। এই মিষ্টান্নটির স্বভাব অদ্ভুত—ভিতরে ঠাণ্ডা, বাইরে গরম! কেকের মধ্যে আইসক্রিম লুকনো, বাইরে ডিমের আবরণ।

জ্যোতি বসুর আর এক প্রিয় আইটেম বেঙ্গলের ভারত বিখ্যাত

হ্যান্ডমেড আইসক্রিম। আইসক্রিমের এই ধারা স্বয়ং পেন সায়েব ক্লাবের শুরুতে শুরু করেছিলেন এসপ্ল্যানেড ইস্টে পৌনে দুশো বছর আগে।

আমার প্রশ্ন অনেক, কিন্তু কিছু কিছু বোকার মতন প্রশ্ন।

সস্নেহে বুলটেদা বললেন, "বছর দু'য়েক পড়াশোনা করুন না, একটু ফ্রেঞ্চ একটু ইতালিয়ান, একটু জার্মান, একটু উর্দু, একটু ফারসি, শিখে নিন। সম্ভব হলে একটু চাইনিজ, তখন আর কোনও অসুবিধে থাকবে না। এই ধরুন ভেটকি, যাকে এখানে বলা হয় বেকটি, অন্তত শ'দেড়েক পদ হয়—বেকটি ফ্রায়েড, মিউনিয়ে, প্যারিসেয়েন, মর্নে, ফ্লোরেন্টাইন, বঁমফিমে, ভেরোনিকে, সিসিলিয়া, ভিন ব্লাঁ, হলান্ডাইজ, কাপ্রি, ওয়ালেনেস্কা, আর্জেনটেনি এটসেটরা, এটসেটরা। এসব ডিশ আমাদের এখানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসে।"

আমার তো মাথা ঘুরে যাবার অবস্থা। বুলটেদা বললেন, "ভয় পাবেন না। এই ধরুন চিকেন। বেঙ্গল ক্লাব সম্বন্ধে ঠিকমতন লিখতে হলে আপনাকে জানতে হবে চিকেন আলাকিং-এর সঙ্গে চিকেন রিসোর্টের কী পার্থক্য। তাছাড়া ধরুন—চিকেন মারেঙ্গো, চিকেন প্রিন্সেস, চিকেন ক্যাচিয়াটোরা এবং চিকেন স্ট্রগনফ্। এসব খুব সহজ ব্যাপার, দেবেন মিত্র আপনাকে হাত ধরে বুঝিয়ে দেবে। লবস্টার এবং রেডমিট একটু কঠিন সাবজেক্ট—বছরখানেক সময় নেবে।"

এবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বুলটেদা। "লাস্ট আইটেমটা শিখে আর লাভ কী—এখানে লাল মাংস—মাটন, পর্ক, বীফ খাওয়া বেশ কমে যাচ্ছে! লোকে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করে গেলো। এক সময় ভয় হয় সারা দুনিয়াটা না বাঙালি বিধবার নিরামিষি ভক্ত হয়ে যায়। তখন আমাদের কিচেনের দুর্দিন আসবে।"

এবার দেবেন মিত্র সায়েব আমাকে ঐতিহাসিক কিছু খবরাখবর দিলেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংকোয়েটের মেনু। সেদিন নতুন নতুন পদ ক্লাব ইতিহাসের এক এক জন দিকপালকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। যেমন :

কনসোমে কম্বারমিয়ার (প্রথম পৃষ্ঠপোষক)

বেকটি আ লা উট্রাম (স্মরণীয় প্রেসিডেন্ট)

মাটন বি ইরানী (ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট, স্টেটসম্যানের সম্পাদক ও কর্ণধার)

চিকেন চোকসে কারি (ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট)

টিক্কা কাঙ্গা কাবাব (সি ই এস সি-র বড় সায়েব ও ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট)

বিস্কিট মনটে স্যাটো (ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট)

কফি কোলভিল (এই কোলভিল ১৮৪৫ সালে কলকাতায় আসেন অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে। ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৫ ছ' বছর ক্লাব প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ওই বছর তিনি চিফ জাস্টিস হন সুপ্রিম কোর্টের। তারপর চলে যান বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে—সেখানে চারজন জজের একজন। সাতচল্লিশ বছর বয়সে বাংলার ছোটলাট জন পিটার গ্রান্টের মেয়েকে বিয়ে করেন।)

নিরামিষ পদ—

ক্রিম দ্য লা প্রিন্সেপ স্যুপ (হেনরি থোবি প্রিন্সেপ ছিলেন খ্যাতনামা জজ— ২৭ বছর টানা জজিয়তি করেছেন ১৯০৪ সাল পর্যন্ত। প্রিন্সেপ মারা যান ১৯১৪ সালে।)

লেগুমে মেটকাফ (দীর্ঘতম সময়ের জন্য প্রেসিডেন্ট)

অরেঞ্জ পিলাও পারেখ (প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট)

উডরফ ভেজিটেবল কারি (বিখ্যাত উডরফ সায়েব)

ইত্যাদি

একজন বাঙালি প্রেসিডেন্ট স্মরণীয়দের মধ্যে স্থান পেয়েছেন রায়তা বিভাগে—"দহি বরেন রে—থা!'

এই বরেন রে মজার মানুষ ছিলেন, সবাইকে ভীষণ আপন করে নিতে পারতেন। আমিও তাঁর স্নেহপ্রশ্রয় পেয়েছিলাম। অর ডিগনাম কোম্পানির প্রথম বাঙালি কর্ণধার।

মিস্টার গোমেস ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন, তাঁর ডিউটি শেষ। ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "বাড়িতে কখনও রান্না করেন?"

আকাশ থেকে পড়লেন গোমেজ। "বাড়িতে স্ত্রী রয়েছেন কেন? আমি

রান্না করতে বসলে তাঁর মনের অবস্থাটা কীরকম হবে? আর সারাদিন খেটেখুটে যাই, আমাকে দিয়ে রান্না করানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। একটা মাছের ঝোলভাত করে রাখে, বুড়োবুড়ি তাই খেয়ে নিই, রান্নার কথাটি মুখে আনি না।”

“রবি ঠাকুর এসে গিয়েছেন”, বললেন মিস্টার মিত্র। বাংলা খানা ডিপার্টমেন্টের হেড রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডা আমাকে লাজুকভাবে নমস্কার করলেন।

প্রতি বুধবার বেঙ্গল ক্লাবে এখন বেঙ্গলি বুফে, খুব নাম হয়েছে। খোদ বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা স্থাপনের দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ তরুণ ব্যানার্জি। ডক্টর ফিশারের চেম্বারে বসতেন তিনি, কিন্তু ভিতরটি একেবারে ডাল-ভাতে ভরা। এই রবীন্দ্রনাথকে বেঙ্গল ক্লাবে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্বও তাঁর।

রবি ঠাকুরের দেশ ওড়িশা—ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় মা মারা গেলেন, মামা জটাধারী দাস ভাগ্নেকে কলকাতায় আনিয়ে নিলেন পড়াশোনার জন্যে। কিন্তু পড়াশোনা হলো না, জটাধারীর সঙ্গে কাজে জড়িয়ে পড়লেন। মামা তখন কালীঘাটের যদু ভট্টাচার্য লেনে বিখ্যাত হালুইকর—যতো নামকরা বিয়েবাড়িতে তাঁর ডাক পড়ে।

এই সূত্রেই নানা বাংলা পদের আর্টিস্ট হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সব রান্নার সঙ্গে ডাক্তার ব্যানার্জির পরিচয় হয়েছে নানা সূত্রে। ওঁর বাড়িতে দুর্গাপূজা হতো, সেখানে দীর্ঘদিন ধরে জটাধারী রাঁধছেন, সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ। অবশেষে তরুণবাবু প্রেসিডেন্ট হয়ে বেঙ্গল ক্লাবে বাংলা খানা শুরু করতে গিয়ে নিমন্ত্রণ জানালেন রবীন্দ্রনাথকে। এখন ভীষণ নাম—শুকতো, মোচার চপ, ধোঁকার ডালনা, ছেঁচড়া, লাউচিংড়ি, ছানার ডালনা, পটোলের দোরমা, দইপটোল কী না রান্না হয় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। তা ছাড়া আছে দইকপি, দইমাছ, পাতুরি, কালিয়া, কোর্মা। আরও কয়েকটি জনপ্রিয় বেঙ্গল ক্লাব আইটেম—রাধাবল্লভী, মাছের কচুরি এবং ফিশরোল। এর সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় চিংড়ির মালাইকারি।

মিস্টার গোমেসের লাইনের কথা তুললাম। ইংলিশ রান্নার তুলনায় উনি

কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন? বিনয়ী রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গি উদার ও আন্তর্জাতিক। বললেন, "উনি একটা লাইন, আমি আর একটা লাইন। ওঁর লাইনে উনি উঁচুতে থাকবেন, আর আমার লাইনে আমি উঁচুতে থাকবার চেষ্টা করবো।"

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করলেন, বেঙ্গল ক্লাব কিচেনেও যথেষ্ট শেখবার ছিল। বুলটেবাবুর উৎসাহে তিনি এখানেই রাঁধতে শিখেছেন—ফুলকপির কচুরি, ছানার কচুরি, দইফিশ রোল।

রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত দিলেন, কিছু কিছু গোপনীয়তা আছে। "সবাই শিখলে কেন লোকে বেঙ্গল ক্লাবে আসবে? কিছু গোপন গুঁড়ো মশলাও আছে"—কিন্তু তার সম্বন্ধে আলোচনা অবশ্যই সম্ভব নয়।

বুলটেদা বললেন, "মাঝে মাঝে বিয়েবাড়ি যেতে হয়—বুঝতে পারি বাঙালি বিয়েবাড়ির মেনু ক্রমশ একটা হচপচ হয়ে যাচ্ছে—না সায়েবি, না বাদশাহি, না চীনে, পিকুলিয়ার একটা মিশ্রণ। দেখুন, এমন একটা সময় আসছে যখন রিয়েল বাংলা ডিশের খোঁজে মানুষকে এই বেঙ্গল ক্লাবেই আসতে হবে। এইটাই হবে আমাদের ওপর সায়েবদের মস্তবড় সাংস্কৃতিক প্রতিশোধ!"

বাঙালি ও ওড়িয়া রান্নার বিশেষত্ব সম্পর্কেও চিন্তা করেন রবীন্দ্রনাথ। ওড়িয়ারা রান্নায় মিষ্টি দেয় না, ঝাল কম—মিডিয়াম। তেলমশলাও কম এখানে, কিন্তু বাংলা পদ ক্রমশই ওড়িশায় জনপ্রিয় হচ্ছে।

"খাবারের ব্যাপারে সারা বিশ্বে একটা অ্যাডভেঞ্চারের ভাব দেখা যাচ্ছে", স্বীকার করলেন বুলটেদা। "যে যার লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল পেরিয়ে অন্যের সংরক্ষিত অঞ্চলে ঢুকে পড়ছে। তাই সায়েব খাচ্ছেন কারি, বাবু খাচ্ছেন রোস্ট, মেম খাচ্ছেন মালপোয়া এবং বিবি খাচ্ছেন সিজলার।" একসময় এই সিজলারের নাম করতো না কেউ বেঙ্গল ক্লাবে—এখন চলছে।

বুলটেদা আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজের কাজগুলো গুছিয়ে নিচ্ছেন। তৈরি করছেন দু'দিন পরের ক্লাব মেনু। এই মেনু দেখে হেড কুক রিকুইজিশন অর্ডার স্লিপ তৈরি করবে, সেই অনুযায়ী সেদিন সকালে

সাপ্লায়াররা শাকসবজি, ডিম, মাছ, মাংস সাপ্লাই দেবে। রেশিয়া সায়েবের বাড়ি ছিল ইটালি ও ফ্রান্সের বর্ডারে—তাঁর ফরাসি শেফের স্বভাব ছিল, হুট করে নিজেই বাজারে চলে যেতেন, দেখতেন কী পাওয়া যাচ্ছে।

আমাকে নিয়ে এবার দ্রুত দর্শনে বেরিয়ে পড়লেন বুলটেদা। এখানে ছিল সায়েবদের ডার্টি ডাইনিং রুম।

"ডাইনিং রুম সায়েবরা কোন দুঃখে নোংরা করে রাখবেন?"

বুলটেদা হাসলেন। "যাঁরা ঠিকমতন কোটটাই ইত্যাদি না পরে এসে পড়তেন তাঁদের মেন ডাইনিং হলে ঢুকতে দেওয়া হতো না—তাঁরা বাধ্য হয়ে বসতেন এইখানে। যুদ্ধের সময় অ্যালায়েড সুপ্রিম কমান্ডারকে অর্ডার ইস্যু করতে হয়েছিল ফুল স্লিভ শার্ট পরে সামরিক অফিসারদের লাঞ্চে অ্যালউ করতে। ড্রেসের ব্যাপারে, সময়ের ব্যাপারে, স্মোকিং টাইমের ব্যাপারে, মেয়েদের ব্যাপারে এখানে ছিল আয়রন শৃঙ্খলা।"

"আরও ছিল—আইবুড়োদের রাউন্ড টেবিল। অনেকেই বেঙ্গল ক্লাবেই থাকতেন। কেউ তাঁদের টেবিলে বসতে এলেই জিজ্ঞেস করা হতো, আইবুড়ো না বিবাহিত? তারপর হো-হো করে হাসি শোনা যেতো। ব্যাচেলর ছাড়াও ছিলেন গ্রাস উইডোয়ার, তৃণমূল মৃতদার—যাঁর মেমসায়েব হোমে চলে গিয়েছেন। এঁরাও ব্যাচেলর হিসেবে গণ্য হতে ভালবাসতেন।"

হাঁটতে হাঁটতে বুলটে দত্ত বললেন, "এই হলো রেনল্ডস রুম। সম্প্রতি ঢেলে সাজানো হয়েছে। বিকেলে চা-পান এবং নানা বিষয়ে চর্চার শ্রেষ্ঠ স্থান। এখানে অসংখ্য সব ছবি রয়েছে, কলকাতায় আর কোথাও রেনল্ডস-এর আঁকা ছবি আছে শুনিনি। আর্টিস্টের নামেই ঘরটা।"

এখানেই সন্ধ্যায় আজকাল পিয়ানো বাজে নিয়মিত। পরিবেশটা একেবারে পালটে যায়। তখন নাম হয় পিয়ানো বার। "এখানকার ড্রিঙ্কস-এর সুনাম আছে। যেমন 'ডাবল-ট্রাব্‌ল'—হোয়াইট রামের সঙ্গে ডার্ক রাম মেশানো হয়, সেই সঙ্গে লেমন জুইস, পাইন অ্যাপ্‌ল জুইস ও অরেঞ্জ জুইস।" যাঁরা জিন পছন্দ করেন, তাঁদের জন্যে দুষ্টুমি করে নাম দেওয়া 'বিট ওইন দ্য পিটস'—কঁয়ত্রু, ব্রান্ডি, হোয়াইট রাম এবং লাইম

জুস—খুবই প্লিজিং পানীয়। যাঁরা লিমবুপানি তাঁদের জন্যে বেঙ্গল ক্লাবে বিশেষ ব্যবস্থা। ককটেলের বদলা হলো এই মকটেল। এখানে এখন জনপ্রিয়—পিংক প্যানথার এবং বোস্টন কুলার।”

এই ক্লাবে অসংখ্য হল আছে, ঘর আছে। প্রত্যেকটা ঘর, প্রত্যেকটা টেবিলের ইতিহাস আছে। সেই সব ইতিহাসই পৌনে দু'শো বছরের ভারতীয় ইতিহাস, যার-কিছুটা ইংরেজের আর কিছুটা সাহেবিভাবাপন্ন ইন্ডিয়ানদের।

দেবেন মিত্রর মা ৬টি নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে ১৯৪৭ সালে বিধবা হয়েছিলেন। ক্লাবের কর্তৃপক্ষ তাঁর সম্বন্ধে ভেবেছিলেন, বিধবার মঙ্গলের জন্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরিজি সই করতে পারেন না বলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে রাজি হননি। তখন প্রতি মাসে সেক্রেটারির অফিস থেকে মানি অর্ডার গিয়েছে। মায়ের ভয় ছিল, স্বাধীন ভারতে ক্লাব উঠে যাবে। গর্বিত ইংরেজ নিজের ভদ্রাসনটুকু স্মৃতির গর্ভে ঠেলে দিয়ে পাট চুকিয়ে দেবে। সে সম্ভাবনার যে উদয় হয়নি এমন নয়। এখানকার জমিতে ওবেরয় কোম্পানি হোটেল তৈরির কথা ভেবেছেন। পুরো সম্পত্তি বেচে দিয়ে ছোট্ট নামকা ওয়াস্তে একটা প্রতিষ্ঠানের কথাও ভাবা হয়েছে। অবশ্যই তার নাম বেঙ্গল ক্লাব থাকবে না—গোপন প্রস্তাব হয়েছে, তার নাম হোক 'ডিচারস ক্লাব'। কলকাতার সায়েবদের একসময় আদর করে ডিচার বলা হতো, যেহেতু তাঁরা মারাঠা খাল বা ডিচের কাছাকাছি থাকতেন। এই ডিচ বুজিয়েই কলকাতার সার্কুলার রোড—এখনও মারাঠাও নেই, ডিচারও বেশি নেই।

বুলটে দত্ত হাঁটছেন আমাকে নিয়ে। স্বয়ং ক্লাব প্রেসিডেন্ট রিকোয়েস্ট করেছেন। বুলটেদা বললেন, “প্রথম যখন ইন্ডিয়ান মেম্বার নেওয়া হলো তখন এখানে কি উত্তেজনা। তার আগে তো স্রেফ সায়েব এবং গোলাম।”

বুলটেদা বললেন, “একটা কথা মনে রাখতে হবে, সায়েবরা যেমন ইন্ডিয়ানদের ঢুকতে দেননি ক্লাবে, তেমনি নিজেদের মেমদেরও ঢুকতে

দেননি। ওটা এক ধরনের বিলিতি খেয়াল। এর মধ্যে জাতিবিদ্বেষ খুঁজে না বেড়ানোই বোধহয় ভাল—বিশেষ করে স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পরে। এখানে এলে, এখানকার ইতিহাস জোগাড় করলে সায়েবদের আপনি নবরূপে আবিষ্কার করতে পারবেন। ইম্পিরিয়াল ঔদ্ধত্যের সঙ্গে, বহুদূরে ঘর ছেড়ে চলে আসা কিছু মানুষের হিউম্যান টাচ ককটেল করে একটা ভাল গল্প লিখতে পারবেন।"

জমি বিক্রি হোক, বাড়ি ভাঙা পড়ুক, শেষপর্যন্ত যে এই প্রতিষ্ঠান বেঁচে থেকেছে এবং ধীরে ধীরে আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে সেটাও মন্দ কী? নেই মামার চেয়ে কানা মামা তো ভাল। আর ক্লাবেরই বা দোষ কি? এই শতাব্দীতে তিনবার বাংলা বিভেদের ধাক্কা সামলেছেন বঙ্গজননী! প্রথম লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ, যার প্রতিবাদে কবি গাইলেন বাংলার মাটি, বাংলার জল, তারপর সাতচল্লিশ সালের হিন্দু-মুসলমানের বাংলা বিভাগ যার পুরোহিত ছিলেন র‍্যাডক্লিফ সাহেব, আর তৃতীয় ঘটনা হলো বেঙ্গল ক্লাবের সম্পত্তি পার্টিশন। বাংলায় যা হয়, একদিন না একদিন বেঙ্গল ক্লাবেও তা হয়!

এখানে আবদার, খিদমতগার, খানসামা, বাবুর্চি, সিগার বেয়ারার সংখ্যা দেখে কেউ কেউ ব্যঙ্গ করেন, কিন্তু এই সার্ভিস পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাঁ দিক থেকে সার্ভিস না করে কেউ ডান দিক থেকে করলে এখানে হই হই পড়ে যাবে। আবার যে সাহেব ন্যাটা বলে বাঁ হাতে কাঁটা ধরছেন তার দিকেও তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে, সেখানে ডান দিক থেকে সার্ভিস এবং বাঁ দিক থেকে প্লেট তুলতে হবে। এসব নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নেই, ভুলের কোনও ক্ষমা নেই। তবে না দুশো বছর ধরে ক্লাব চলছে।

তবে এখানে মেম্বাররা স্বেচ্ছায় নিয়মের শৃঙ্খলায় বাঁধা। নিয়ম থেকে কারও ছুটি নেই। ইংরেজ আমলে এক বিলিতি ব্যাঙ্কের সায়েব মত্ত অবস্থায় এসে হল পোর্টারের সঙ্গে ঝগড়া করে দুম করে ক্লাবের ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। অসময়ে ঘণ্টা। হই হই পড়ে গেলো। হল পোর্টারের রিপোর্ট এলো, কমিটির মিটিং বসলো। বিশৃঙ্খলার কোনও ক্ষমা নেই ইংরেজের কাছে।

সায়েবের নাম কাটা গেলো সভ্য তালিকা থেকে। এইসব হয়েছে বলেই বাস্তুভিটের নাগরাজ সন্তুষ্ট থেকেছেন, কখনও কারও ক্ষতি করেননি, বড় কিছু অঘটন ঘটেনি এই বেঙ্গল ক্লাবে।

বুলটেদা একটু অবাক হয়ে গেলেন যখন শুনলেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের অমর কথাকার মাস্টারমশায় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তও বেঙ্গল ক্লাবের অনুরাগী ছিলেন এবং একবার তিনি এই ক্লাবে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। কোনও বিদেশি অভ্যাগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে এখানকার শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং নিঃশব্দ পারদর্শিতা দেখে মহেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। এবং পরবর্তী কালে খোদ বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে 'সন্ন্যাসীদের বেঙ্গল ক্লাব' আখ্যা দিয়েছিলেন। "এর থেকে বড় সার্টিফিকেট ও সম্মান আর কী হতে পারে?" বললেন স্টুয়ার্ড দেবেন মিত্র। "এর অর্থ দাঁড়ালো, এই বেঙ্গল ক্লাব হলো সায়েবদের বেলুড় মঠ!" মন্তব্য করলেন এক সুরসিক রামকৃষ্ণবিশারদ।

বুলটে দত্ত কাজপাগলা মানুষ। কখন ক্লাবে আসেন আর কখন ফিরে যান তা বলা শক্ত। বড় পার্টি থাকলে তো কথাই নেই। সন্ধের বেঙ্গল ক্লাব তখন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সারা রাসেল স্ট্রিটে গাড়ি রাখার জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন কালো কোট ও বো-টাই পরে দত্তপুকুরের বুলটে দত্ত এবং দেবেন মিত্র বুলেটের মতনই ঘুরে বেড়ান অতিথিদের ক্লেশ লাঘব করতে, দেখতে আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি হচ্ছে কি না।

একদিন আমার রাত হয়েছিল। পার্ক হোটেল থেকে মাঝরাত বেরিয়ে রাসেল স্ট্রিটে এসে দেখি কালো কোট ছেড়ে রেখে স্রেফ বাঙালিবাবুর মতন পথে বেরিয়েছেন বুলটে দত্ত। "বাড়ি ফিরছেন?" উত্তরে "হ্যাঁ" বললেন, বেঙ্গল ক্লাবের বর্ষীয়ান স্টুয়ার্ড। "এত রাত্রে?" আবার হাসলেন বুলটে দত্ত, "এই তো অতিথিরা গেলেন।" আবার প্রশ্ন : "বাড়িতে রাগ করে না? স্ত্রী কিছু বলেন না?" আমি জিজ্ঞেস করি। লাজুক হাসিতে বেঙ্গল ক্লাবের স্টুয়ার্ডের মুখ ভরে উঠলো। "ওই ভয়েই তো বিয়ে করিনি, শংকরবাবু। আমার ঘরসংসার বলতে তো বেঙ্গল ক্লাব।"

বুলটেদা রাতের অন্ধকারে পার্ক স্ট্রিটের জনস্রোতে মিশে গেলেন। আর

আমি পরম বিস্ময়ে রাসেল স্ট্রিটের ইতিহাসের মাদকতায় পরিপূর্ণ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললুম, "জয় বেঙ্গল!"

ব্যান্ডোদা এবার কলকাতায় এলে তাঁকে বেঙ্গল ক্লাবে রাখতে হবে। বেঙ্গল ক্লাবের পুরো গল্পটা তাঁকে না বলা পর্যন্ত আমি কিছুতেই শান্তি পাবো না।